অবিনাশ

আমি লম্বা ভাঙ্গা আরাম কেদারায় এবং পরীক্ষিৎ খাটে শুয়ে ছিল। পাশের ঘরে অনিমেষের স্ত্রী। এক এক সময় শীতের শুকনো হাওয়ায় জামাকাপড়ের নীচে আমার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। দূরের বাঁধ থেকে মাটিকাটা কামিনদের অল্প ভেসে-আসা গোলমাল, এ ছাড়া কোনো শব্দ ছিল না। শুধু শীতের দুপুরে যখন দপ্‌ধপে ফর্সা নির্জন রোদ, তড়খন যেহেতু কাকের ডাক ছাড়া মানায় না, বড় বড় মিশমিশে কালো দাঁড়কাকগুলো যা মফস্বলেই সাধারণত দেখা যায়—তাদের ডাকাডাকি মাঝে মাঝে আমাকে একাগ্র করেছিল। এবং টিনের চালে তাদের কুৎসিত পায়ের শব্দে আমি কখনো কখনো অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলাম।

মনে পড়ে সেই দুপুরবেলায় বসে থাকা। খাটে ঘুমন্ত পরীক্ষিৎ, পাশের ঘরে অনিমেষের স্ত্রী গায়ত্রী, এবং আমার চুপচাপ বসে থাকা। সেই দৃশ্যটার কথা ভাবলেই কেমন যেন ঝন্‌ঝন্-করা শব্দ শুনতে পাই, জামার মধ্যে হঠাৎ কোনো পোকা ঢুকে যাওয়ার মত অস্বস্তিবোধ করি। আমি জীবনে কোনো পাপ করিনি। আমার শাস্তি পাবার ভয় নেই। মাথার ওপর সব সময় দণ্ডাজ্ঞার ছায়া রয়েছে এমন মনে হয় না। তবু সেদিনের সেই দুপুরের কথা মনে পড়লে যেন ভয় করে। জীবনে কারুর ক্ষতি করিনি সজ্ঞানে, চোখ মেলে পৃথিবীকে যে রকম দেখা যায়, আমার কাছে পৃথিবী ঠিক সেই রকমই, আর কিছু না, না স্বপ্ন, না আয়না। আমি কোনোরকম বাসনাকে বন্দী করতে চাইনি কখনো, মৃত্যুর চেয়েও জঘন্য মানুষের অতৃপ্ত বাসনা, ভেবেছি। জব্বলপুরে আমি কি করেছিলাম, সে কি পাপ? গত বছর শেষ শীতে, সেই জব্বলপুরের দুপুরে?

পরীক্ষিৎ ঘুমিয়ে পড়েছিল অনেকক্ষণ আগেই। অদ্ভুত ঘুম ওর, যেন জন্মের সময়েই প্রতিজ্ঞা করে এসেছে, জীবনের এক তৃতীয়াংশ ও ঘুমিয়ে কাটিয়ে যাবে। ও যখন জেগে থাকে, তখন ভয়ানকভাবে জেগে থাকে, যখন ঘুমোয়, প্রবলভাবে ঘুমোয়। দুপুরে খেয়ে ওঠার পর হঠাৎ আমাদের মনে পড়েছিল যে সিগারেট নেই। 'ডুবে গেছি মাইরি, সম্পূর্ণভাবে ডুবে গেছি।'

পরীক্ষিৎ চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'ভাত খাবার পর এই টক্ মুখ নিয়ে কি করবো?' গায়ত্রী বলেছিল, 'মশলা, খান্ না, আমার কাছে ভাজা মশলা আছে।' 'মশলা আর সিগারেট এক হলো?' পরীক্ষিৎ ধমকে উঠেছিল—তারপর সেই বিখ্যাত জার্মান উপন্যাসের নায়কের মতো বলেছিল, 'সিগারেট নেই তো ভাত খেলাম কেন? ভাত খাবার প্রধান কারণই তো এই—তারপর সিগারেট টানতে বেশি ভালো লাগবে।' ঘুরঘুর ইঁদুরের মতো ও তখন বাড়ির সমস্ত কোণ খুঁজে দেখলো—যাবতীয় প্যান্টের পকেট থেকে তরকারির ঝুড়ি পর্যন্ত। সিগারেটের দোকান প্রায় মাইলখানেক দূরে, চাকর চলে গেছে তার বাড়িতে, দরকার হলে পরীক্ষিৎ নিজেই ভরা পেটে এক মাইল ছুটতো কিন্তু হঠাৎ বাথরুমে পৌনে এক প্যাকেট পেয়ে গেল এবং পরম উল্লাসে আমাকে একটি এবং নিজে ধরিয়ে শুয়ে পড়লো।

কিন্তু যে সিগারেটের জন্য ওর এত ব্যস্ততা— সেটা শেষ হবার আগেই এমনভাবে ও ঘুমোলো যে, যাতে ওর আঙুল কিংবা বিছানা পুড়ে না যায়, তাই আমি ওর ঘুমন্ত হাত থেকে সিগারেটটা ছাড়িয়ে নিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিলাম। 'ঘুমন্ত হাত' কথাটা ঠিকই ব্যবহার করেছি। ও যখন ঘুমোয় তখন ওর সমস্ত শরীর ঘুমোয়। ওর শরীরের প্রত্যেকটি অংশে আলাদা ঘুম আছে। যখন যেমন শোয়-ঠিক, সেইরকমই শুয়ে থাকে আগাগোড়া, একটুও নড়েনা। কখনো ঘুমের মধ্যে ওকে জোর করে ডাকলে ও চোখ মেলে তাকায়—শরীরে সামান্যতম স্পন্দনও দেখা যায় না, আস্তে আস্তে ওর মুখ, ঘাড়, গলা, হাতের ঘুম ভাঙে। বিখ্যাত ঘুম পরীক্ষিতের। গায়ত্রী তখনও জেগেছিল পাশের ঘরে, মাঝে মাঝে ওর শরীরের, কাপড়-জামার এবং হার—চুড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। একবার তবু ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'গায়ত্রী, ঘুমিয়েছ?'

'না, শেলাই করছি। আপনি কি করছেন?'

'কিছুনা, কি করবো তাই ভাবছি।'

'চা খাবেন?'

'না, একটু পরে, এখন এক গ্লাস জল খাবো।'

শব্দ করে খাট থেকে নেমে অল্পক্ষণ ও কিজন্য যেন দেরি করলো। তারপর জল নিয়ে এলো ঝকঝকে কাঁসার গেলাসে। গেলাসটা বোধ হয় ওদের নতুন বিয়েতে পাওয়া, নয়তো এত ঝকঝকে গেলাস কারুর বাড়িতে দেখিনি। সেই গেলাস এবং তার মধ্যকার জলের শীতলতা যেন আমি বুক দিয়ে অনুভব করলাম। তখনই সেই জল থেকে আমার ভয় করলো। বললাম, 'টেবিলের ওপর রাখো।'

নিচু হয়ে যখন ইজিচেয়ারের হাতলে গেলাসটা রাখলো, আমি ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ব্লাউজের নিচটা শাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে, শোবার সময় সব মেয়েই এরকম বের করে দেয়, নিচের বোতাম খোলা, ওর পেটের কাছে একটা ফর্সা ত্রিকোণ আমার চোখে পড়লো। এবং যে হাত দিয়ে ও গেলাসটা রাখলো, সেই হাতের নিচে ভিজে দাগ। শীতকালেও অনেক মেয়ের বগল ঘামে ভিজে থাকে— এবং সাধারণত তারা কিরকমের মেয়ে, আমি জানি। 'আপনি ঘুমোবেন না?' গায়ত্রী জিজ্ঞেস করে।

'না, দুপুরে আমার ঘুম আসেনা।'

'আমারও। ইয়ে কি রকম ঘুমোচ্ছে।' খানিকটা হাসলো, তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, 'রুমালে একটা ফুল তুলছি, যাই।' যাবার সময় আমি ওর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকবো জেনেও ও বেশ সপ্রতিভভাবে চলে গেল।

না, আমার কিছুই ভালো লাগছিল না, আমি দুপুর বেলা ঘুমোতে চাইনা, কখনো ঘুমোইনি। অথচ এখন কি করবো। বই পড়তে গেলে বমি আসে। গায়ত্রীকে আবার ডাকবো কিংবা ওর ঘরে গিয়ে গল্প করবো? কেন জানিনা, আমার সমস্ত শরীরে যেন শিকল নাড়াচাড়ার মতো ঝন্ ঝন্ করে শব্দ হচ্ছিল। আমি উঠে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ালাম। এদিকে আর বাড়ি নেই, অনেক দূর পর্যন্ত মাঠ ঢালু হয়ে নেমে গেছে, মাঝে মাঝে সবুজ নীল ক্ষেত, বেশ দূরে একটা নৈবেদ্য'র মতো পাহাড়। এসব কিছুই বেশিক্ষণ তাকিয়ে দেখবার নয়, মাঠের ডানদিকের কোণে একটা অতিকায় শিশুগাছ, ওখানে শ্মশান। অনিমেষের অফিস এখান থেকে দেখা যায়না, ও অবশ্য আজ গেছে তেঘড়িয়ায়, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এসেছে, সেখানে হাজিরা দিতে। মফস্বলের সরকারি চাকরি এইজন্যই জঘন্য। ছুটিতে থাকলেও নিষ্কৃতি নেই, ম্যাটিজেস্ট্রেট কিংবা মন্ত্রী এলেই ছুটতে হবে। সকালে বেশ তাশ জমে উঠেছিল। এমন সময় আর্দালি এসে ম্যাজিস্ট্রেটের শুভাগমনের কথা জানাতেই অনিমেষের মুখ শুকিয়ে গেল। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজিরা দেবার জন্য ওকে ছুটির দিনেও দাড়ি কামাতে ও জুতো পালিশ করতে হলো!

আমি চুপ করে বসেছিলাম। পৃথিবীতে কোথাও কোনো শব্দ নেই। মাটিকাটা কামিনরা এখন বোধহয় বিশ্রাম নিচ্ছে। খবরের কাগজটা আমার হাত থেকে খসে যেতেই আমি তাতে একটা লাথি মারলাম। আমার চোখ খর খর করছে, আমার কিছুই করার নেই।

কাল সন্ধ্যোবেলা আমারা যখন বাইরে টেবিল পেতে বসে চা খাচ্ছিলাম—সে —সময় দুজন ভদ্রলোক অনিমেষকে ডাকতে এসেছিল। ওদের দেখে যেন হঠাৎ বিব্রত হয়ে পড়লো অনিমেষ, তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে গিয়ে বলেছিল, 'আপনারাই যান, আমার অসুবিধে আছে, আমরা আরযাবোনা।'

একটুক্ষণ কথাবার্তায় বোঝা গেল, আজ ওদের নেমন্তন্ন ছিল, কোনো কলিগের ছেলের অন্নপ্রাশন, আমরা এসেছি বলে অনিমেষ বিব্রত বোধ করছে। অথচ খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু বুঝতে পারলুম। আমার মধ্যে একটা কৃত্রিমতা আছে, লোকের সঙ্গে ফর্মালি পরিচিত না হলে বা কোনো কিছু জিজ্ঞাসিত না হলে

কোনো কথা বলতে পারি না। পরীক্ষিৎ ওসব মানে না, চেঁচিয়ে উঠলো, 'যা না, ঘুরে আয়, আমরা ততক্ষণ খানিকটা বেড়িয়ে আসি একটু ওষুধ খেতে হবে–মাথা ধরে যাচ্ছে।'

'যাঃ তোরা এক একা থাকবি।'

'একাই একশো,' পরীক্ষিৎ বলে, 'ওষুধ কোথায় পাওয়া যায় রে?' একটু চোখ নিচু করে ইঙ্গিত করলো।

'স্টেশনের কাছে', এগিয়ে এসে বললো অনিমেষ, 'এদিকে পাওয়া যায়, দিশি।' কথাবার্তার মধ্যে গায়ত্রী উঠে ঘরে চলে গিয়েছিল। অনিমেষও ভেতরে গেল। একটু বাদে গায়ত্রীর তীক্ষ্ণ, অশোভন গলা শুনতে পেলাম, 'না, আমি যাবো না, তুমি একা যাও।' লোক দুটি আমাদের সামনে বসেছিল। আলাপ করার চেষ্টায় মফস্বলের লোকদের একমাত্র প্রশ্ন, 'দাদারা কোথা থেকে,' ব্যগ্রভাবে নিক্ষেপ করেছিল।

'ফরাক্কাবাদ!' বলে পরীক্ষিৎ এমনভাবে মুখ ঘুরিয়ে বসলো যে, আর ওরা উৎসাহ পায়নি। গায়ত্রীর গলা শুনে ওরা হা–হা করে খানিকটা হেসে উঠলো, 'বৌদি ক্ষেপেছে মাইরি, চল্ দেখি।' ওরা দুজনে উঠে ঘরে গেল এবং খানিকক্ষণ চাষাড়ে রসিকতা, হি হি হো, মাইরি যা মশা পড়েছে এবার, ফাসক্লাস পর্দার রঙটা তো, কবে আপনার বাড়িতে অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন খাবো বৌদি, হ্যা–হ্যা–হ্যা, চলুন দাদা রাত হয়ে যাচ্ছে–ইত্যাদির খানিকটা পর গায়ত্রী এবং অনিমেষ সেজে বেরিয়ে আসে, 'খুব তাড়াতাড়ি ফিরবো', অনিমেষ বললো, গায়ত্রীর মুখ নিচু করা, 'দাদাদের ফেলে রেখে লেগম হ্যা হ্যা' –লোক দুটির একজন বা সমস্বরে বলে চলে গেল। আমি এতক্ষণ কোন কথা না বলে চুপ করে ওদের দেখছিলুম। বেশ সরল লোক দুটি, ওদের আমার ভালো লাগাই উচিত, ঐরকম সরল, শুয়োরের মতো নির্ভীক জীবনই তো আমি এতকাল চেয়ে আসছি।

ওরা চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষিৎ বেরিয়ে গিয়ে ঘুরে এলো আধঘন্টার মধ্যে। চুপচাপ দুজনে আধবোতল শেষ করার পর ও প্রথম কথা বললো, 'কেমন লাগছে রে এদের দুজনকে?'

'ভালই। বেশ তো সুখেই আছে অনিমেষ বৌকে নিয়ে?'

'হুঁ, সুখে আছে,' পরীক্ষিৎ বিড়বিড় করলো। 'কি করে বুঝলি তুই সুখে আছে?'

'কেন, দেখাই তো যাচ্ছে, ছোট্ট সুখের সংসার।'

'সত্যি, অনিমেষটাকে আর চেনাই যায় না। যেন বাঘের গায়ে কেউ সাদা চুনকাম করেছে। বুঝলি, বাঘের গায়ে হালুম করার বদলে এখন মিউ মিউ করে।'

আমি পরীক্ষিতের এই খেলো উপমাটাকে পাত্তা না দিয়ে বললুম, 'দেখা যাচ্ছে বিয়ে করার পর অনিমেষই বেশ সুখে আছে।'

হঠাৎ পরীক্ষিৎ চটে গেল। 'কেন সুখে থাকবে? কি অধিকার আছে ওর সুখে থাকার?' আমি বললুম 'বাঃ, পৃথিবীশুদ্ধু লোককে তুই অসুখী থাকতে বলবি নাকি?''আমার ঘেন্না করে', পরীক্ষিৎ বললো, 'রাত্তির বেলা যখন দড়াম করে দরজা বন্ধ করে কিরকম তেল–তেল মুখ হয় দেখেছিস? এত যে বক্তৃত্ব ছিল, বিয়ের আগে যে নদীর পাড়ে বসে এত কথা হলো, সব হাওয়া? কাল বললুম, চারজনে এক সঙ্গে এক ঘরে শোবো—হেসে উড়িয়ে দিল। কি হাসি দুজনের! আমি কি ভাঁড় নাকি যে হাসির কথা বলে মজা দেবো–মজা তো রোজ যথেষ্ট দিচ্ছে। রাত্তিরবেলা বৌগুলোর স্বভাব দেখেছিস—যেন ঘুরঘুরে নেউল, বাথরুমে গা ধোয়, মুখে আরাম করে স্নো, বিছানা পেতে (অশ্লীল), কথাবার্তা বলছে অথচ —' (ছাপার অযোগ্য)

'ওকথা থাক পরীক্ষিৎ, অন্যকথা বল্।'

'না, এসব দেখলে আমার বমি আসে। অনিমেষটা আউট হয়ে গেল। আচ্ছা, এখানে ইলেকট্রিক নেই কেন? টিমটিমে টেমী দুচক্ষে দেখতে পারিনা। আই ওয়ান্ট গ্লোরিয়াস সানসাইন অলসো এট নাইট। আয়,

ঐ খড়ের গাদাটায় হ্যারিকেনটা ভেঙ্গে উল্টে দিই। খানিকক্ষণ বেশ আলো হবে।' বলার সঙ্গে সঙ্গে ও হ্যারিকেনটা তুলে নিল। 'তোর কি আধবোতলে নেশা হলো, ছিঃ! আমি বললুম। পরীক্ষৎওর ছোট ছোট করমচার মতো চোখদুটো সোজা তুলে যেন ছুঁড়ে দিল আমার দিকে, 'তুই কি বলছিস অবিনাশ, আমার দোষ হলো? তোর খারাপ লাগছে না? এত কথা হলো, এত প্রতিজ্ঞা, আর একজন বিয়ে করে বলবে,, আমাকে চেড়ে দাও ভাই।'

'তুই-ও একদিন ছেড়ে দিবি।'

'বিয়ে করে?' পরীক্ষিৎ ব্যগ্রভাবে নিক্ষেপ করে।

'অথবা ক্লান্ত হয়ে। সকলেই তাই দেয়। বয়েস উনত্রিশ হলো খেয়াল আছে?'

পরীক্ষিৎ নেশার ঝোঁকে আরও মুখ খারাপ করতে থাকে। আমার একটু একটু হাসি পায়, আমি চুপ করে থাকি। পরীক্ষিতের কি বয়েস বাড়ে না? এক সময় কি সব ছেলেমানুষী প্রতিজ্ঞা করেছিলুম আমরা কেউ বিয়ে করবো না, সারাদিনে মেয়েদের জন্য আধ ঘন্টার বেশী ব্যয় করবো না, শিল্পের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হবে—এইসব। এসব কেউ বেশিদিন মনে রাখে? এসব নিয়ে কেউ পরে সীরিয়াসলি অভিযোগ জানায়? পরীক্ষিৎটা পাগল, অনিমেষ বিয়ে করে সুখে আছে তাতে দোষের কী? বেশ তো ভালোই আছে। আমি কথা ঘোরাবার জন্য বললুম 'ও পাশে কি ঝাউবন আছে নাকি রে? অমন শোঁ শোঁ শব্দ কিসের?'

'পৃথিবীর। ঝাউ কি শুপুরী কি জামরুল, ওসব আমি চিনি না। সবই পৃথিবী। আর পৃথিবী ঠিকঠাক আছে। গায়ত্রী মেয়েটা কেমন?'

'ভালই তো, বেশ ছিমছাম। হাসির সময় ঠোঁট অল্প ফাঁক করে, সুতরাং অভিমানী!'

'কি করে জানলি? মেয়েদের অভিমান কি হাসিতে বোঝা যায়? ও জন্যে তো ওদের শরীর জানতে হয়।'

এই কথায় আমি একটু কেঁটে উঠেছিলাম। আমার আঁতে ঘা লাগে–পরীক্ষিৎ আমার কথাটাই ফিরিয়ে দিয়েছে আমাকে এই প্রসঙ্গে। গায়ত্রীর সঙ্গে পরীক্ষিৎ বেশ সহজভাবেই কথাবার্তা বলে। আমি পারি না।

কোনরকম শারীরিক বন্ধুত্ব না হলে অথবা করার চেষ্টা করে প্রত্যাখ্যাত না হলে আমার সঙ্গে কোন মেয়ের অন্তরঙ্গতা হয় না। বেশির ভাগ মেয়ের কাছেই আমি এজন্য একটু অভদ্র বা লাজুক বলে পরিচিত। পরীক্ষিৎ আমার ব্যাপারটা জানে বলেই খোঁচা দিয়েছে। আমি ওকে চিনি। ওর হাড়ে–হাড়ে গণ্ডগোল। ও আমাকে কি বলতে চায় তা আমি অনেকক্ষণ বুঝতে পেরেছি।

—তারও আগের দিন রাত্রে খাওয়ার পর আমরা তিনজন বসে গল্প করছিলুম, গায়ত্রী আমাদের সঙ্গে বসেনি, খুটখাট করে সংসারের কাজ সারলো, দু'ঘরের বিছানা পাতলো পরিপাটি করে, তারপর সব কাজ শেষ করেও ও আমাদের সঙ্গে গল্প করতে এলো না। নিজের শোবার ঘরে চুপ করে বসে রুমালে ফুল তুলতে লাগলো–ওর সেই একা বসে থাকা এক প্রবল প্রতিবাদের মতো, যেন প্রতি–মিনিট ও আশা করছে আমরা কতক্ষণ আড্ডা শেষ করবো এবং অনিমেষ শুতে যাবে–আমার তাই মনে হয়েছিল, সুতরাং আমি বলেছিলুম, 'চল্ এবার উঠে পড়ি, আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'ঘুম পাচ্ছে? সেকি, তোর?' –পরীক্ষিৎ চেঁচিয়ে উঠলো, 'মাঝে মাঝে সত্যি অবাক করে দিস তুই —ঘুম পাচ্ছে অবিনাশ মিত্তিরের? রাত এগারোটায়, যে আসলে একটা রাতের ঘুঘু! তোর কি ফর্ম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে? বৌ কোথায় গেল–' পরীক্ষিৎ বিরক্তি মিশিয়ে উঁচু গলায় বললো, যে গলায় পরীক্ষিৎ গান গায়— রাগ প্রকাশের সময়ও ওর গলা সেইরকম দীর্ঘ সুরেলা থাকে—'অনিমেষ, বৌকে বল, একঘরে বিছানা করতে, চারজনে একঘরে শুয়ে সারা রাত গল্প করবো।'

একথা বলার সময় পরীক্ষিতের গলায় কোন দ্বিধা ছিল না। বন্ধুত্বের চূড়ান্ত সঙ্গে ওরা বিশ্বাস, বন্ধুদের সঙ্গে মারাত্মক সব পরীক্ষায় জীবন কাটাতে হবে এবং কখনো কোন ক্লান্ত মুহূর্তে যার যার ব্যক্তিগত শিল্প সৃষ্টি। পরীক্ষিৎ একথা জোর করে বলে। শিল্প–শিল্প করে ও গেল, শিল্প ওর মাথার ভূত। অনিমেষ ওর প্রস্তাবে বিষম উৎসাহিত হয়ে গায়ত্রীকে ডেকেছিল। গায়ত্রী এলো বারান্দায়। চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে —

পরীক্ষিৎ শেষ গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করে বলেছিল, 'আমি অনিমেষকে বড় ভালবাসি। ওরকম কবি হয়না। ওকে ডুবিয়ে দিতে চাই। ওরকম সুখী সেজে থাকলে ওর দ্বারা আর কিছু হবে না জীবনে, আমাকে একটু তোর গ্লাস থেকে ঢেলে দে।'

আমি ওকে একটু দিয়ে আমার শেষ করে দিয়েছিলাম।

'অনিমেষের সুখের তুই বারোটা বাজিয়ে দে, অবিনাশ। তুই কি করছিস, যাঃ তুই একটা নীরেট— ও একটা মেয়েমানুষ পেয়ে সব ভুলে যাবে?' আমি বললুম, 'সব ভুলে গেছে কোথায়? অনিমেষ তো আগের মতোই আমাদের সঙ্গে মিশে আড্ডা দিচ্ছে।'

কোনো কারণ নেই, তবু পরীক্ষিৎ আমার একথা শুনে একটু মুচকি হাসি হাসলো। রহস্যময় হাসি বললো, 'তুই কি ভাবছিস, আমি বিয়ে করার বিরুদ্ধে কিছু বলছি? করুক না বিয়ে যার ইচ্ছে। কিন্তু অনিমেষ ওর বৌয়ের সঙ্গে যখন কথা বলে তখন দেখলে মনে হয় যেন ও আলাদা একটা জগতে আছে। এই জগৎটা ভেঙ্গে দিতে হবে। একটা মেয়েমানুষ মানেই কি আলাদা জগৎ? কি ভয়ানক মেয়েগুলো, অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন খেতে আপত্তি করলো কেন— যেহেতু এক বছরেই গোটা দুয়েক ডিম পাড়েনি। তুই ওর বিষ দাঁত ভেঙ্গে দে না।' আমি বললুম, 'আমি কেন ভাঙ্গতে যাবো? তাছাড়া, আমার কি–ই বা ক্ষমতা আছে?' পরীক্ষিৎ আমার কথা শুনলো না, নিজের মনেই বলে চললো, 'কি হচ্ছে কাল থেকে, খালি খাওয়া আর গল্প, কি সব গল্প, ওমুক লোকটা, ওর মেজো শালি সেদিন হাটে পুলিশ এসে —এসব কি? মনে আছে গতবার আমরা সকলে মিলে কি নিয়ে যেন মারামারি করেছিলাম? এই দ্যাখ, আমার তুত্‌নিতে একটা কাটা দাগ আছে — তুই ঘুসি মেরেছিলি। সে সব দিন—'

আমি বললুম, 'পরীক্ষিৎ, তুই তোর বিশ্বাস বা ইচ্ছে আমার ঘাড়ে চাপাতে চাস কেন? এটা তোর একটা রোগ। আমার আর অতটা ভালো লাগে না। কোনো মানুষকেই আঘাত করার ইচ্ছে নেই আমার। সকলে সকলের ইচ্ছে মতো বাঁচুক। আমিও সরল, স্বাভাবিক জীবন চাই, অনেকদিন বাঁচতে চাই। অনিমেষের সংসার দেখে আমার সেইদিক দিয়ে লোভ হচ্ছে।'

'সে কি রে? এ যে দেখছি বাংলা সাহিত্যে যাকে বলে "জীবন—প্রেমিক"। যাঃ, আর হাসির কথা বলিসনি। তোর একটা অকারণে হিউমার করার স্বভাব আছে। অনিমেষের মধ্যে একটা গণ্ডগোল ঢুকিয়ে দে। ও ভয় পেয়ে যাক, সন্দেহ করুক নিজেকে। না হলে ও আর কোনোদিন লিখতে পারবে না। ও না লিখলে আমারও আর ইচ্ছে করেনা। বাংলা সাহিত্যে আমার আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।'

'কেন, বিমলেন্দু?'

'ঐ মোটা হুঁৎকোটা? ও তো পাবলিকের হাততালি চায়। তাই পাবে। ওর কথা ছাড়'।

'তা হলে বিশ্বদেব?'

'মনীষী বিশ্বদেব বল্, এরপর তুই বুঝি শেখরের নাম বলবি? তুই আমাকে এত ছোট ভাবিস্।'

'তুই কিন্তু বিমলেন্দুর সামনে মুখ নিচু করে থাকিস্। ওকে বলিস্ গ্রেট। আড়ালে নিন্দে করা তোর স্বভাব। চল্, বাইরে ঘুরে আসি। মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলে ভালো লাগবে। তুই ঘোলাটে জল খেতে বড় ভালোবাসিস, পরিষ্কার জল দেখলে তোর বমি আসে, নারে?'

BANGLAPDF.NET

একটু হেসে পরীক্ষিৎ চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেল—ওর পা একটু টলে যায়। আমি ওর হাতটা ধরে বাইরে এলাম। 'আঃ, ভারি সুন্দর চাঁদের আলো দিয়েছে,' পরীক্ষিৎ বলল, 'এই আলো খেলে নেশা হবে?'

'আগেকার কালের লোকদের হতো, যাদের মাথার মধ্যে ভালোবাসা ছিল। নেশার ঘোরে উন্মাদ হয়ে যেত শেষ পর্যন্ত। ঐজন্য পাগলের ইংরেজি লুনাটিক। তোর ওসব কিছু হবে না। তুই বড্ড সেয়ানা'—

আমি চুপ করে বসে আছি। সেই দুপুর বেলা। আমার কিছু করার নেই। পরীক্ষিতের বেশ নাক ডাকে দেখছি। অমন কায়দাবাজ নাক দিয়ে একি ভালগার আওয়াজ। একথা মনে করিয়ে দিলে ওর মুখের চেহারা কি রকম হয় বিকেল বেলা দেখতে হবে। চুপ করে বসে আমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছি। ওঘরে গায়ত্রী বসে আছে, ওর সঙ্গে অনায়াসে গিয়ে গল্প করা যায়। যায়, যদি স্বাভাবিকভাবে গিয়ে বসতে পারি। তা পারবো না, কৃত্রিমতা একেবারে ঢুকে গেছে। কোনো যুবতী মেয়ের সঙ্গে যে একা ঘরে দুপুরবেলা বসে শুধু গল্প করা যায়—এ বিশ্বাসটাই যে নেই। প্রিমিটিভ, একেবারে প্রিমিটিভ। দু'একটা হালকা গল্প-গুজব রসিকতায় কি গায়ত্রীর সঙ্গে এখন সময় কাটানো যায় না? কেন আমি শুধু শুধু একা বিরক্ত হয়ে বসে আছি? কাল আমি পরীক্ষিৎকে বলেছিলাম, 'গায়ত্রীকে নিয়ে তুই এমনভাবে ভাবছিস কেন? বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে এসেছি, স্বামী-স্ত্রীর ছোট্ট চমৎকার সংসার এখানে, আয়, ঠাট্টা-ইয়ার্কি ফষ্টি-নষ্টি করি, লুকিয়ে প্রেম করার চেষ্টাও চলতে পারে, ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ লড়াই হোক হোক- কেউ ব্যর্থ হয়ে দুঃখ পাক, কেউ সফল হয়ে নিরাশ হয়ে পড়ুক, কেউ জ্বলে-পুড়ে মরুক মনে মনে— সেইটাই তো স্বাভাবিক। জীবন এই রকম। তার বদলে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তে তুই আমাকে বলছিস ওর সঙ্গে সম্পর্ক করতে-যাতে অনিমেষ দুঃখ পায়, ওর সুখ ভেঙ্গে যায়-আর তুই থাকবি আড়ালে। আমার ব্যক্তিগত লোভ থাক বা না থাক অনিমেষকে কষ্ট দেবার জন্য আমি একটি মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বো—একি!' পরীক্ষিৎ যথারীতি নিজের ভাষায় আমায় কিছু গালাগালি দিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, 'না, অনিমেষ-গায়ত্রীর সুখের সংসার ভাঙ্গতে আমার একটুও লোভ নেই। ওরা সুখে থাক্।'

আমি উঠে গিয়ে গায়ত্রীর ঘরের দরজার খুলে দাঁড়ালাম।

গায়ত্রী বললো, 'আসুন।'

খাটে পা মুড়ে বসে দু'হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে ও শেলাই করছিল, আমাকে দেখে একটুও ভঙ্গী বদলালো না। লাল শাড়ির নিচে সাদা শায়ার লেশ বেরিয়ে পড়েছে, তার নিচে পদ্মপাতার মতন গায়ত্রীর পায়ের রঙ, সেদিক থেকে আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। গায়ত্রীর রং একটু কালো, গোল ধরনের মুখ— তেমন সুন্দর নয়, ছায়া কিংবা মায়ার পাশে দাঁড়ালে গায়ত্রীকে মোটেই রূপসী বলা যাবে না। কিন্তু জলের মাছের মতন গায়ত্রীর চকচকে স্বাস্থ্য, সেই স্বাস্থ্যের অহংকার ওর চোখে মুখে। দু এক ফোটা ঘাম জমে গড়িয়ে এসেছে থুতনি বেয়ে—ব্লাউজের একটা বোতাম খোলা, আমি সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। ডিজাইন-করা ব্লাউজের হাতা টাইট হয়ে চেপে বসেছে ওরা বাম বাহুতে—আমার মনে হলো একটা কুমীর যেন ওর হাত কামড়ে ধরেছে-আমি সেদিক থেকেও চোখ ফিরিয়ে নিলাম। জানলা দিয়ে রোদ্দুর এসে ওর তৃণভূমির মতো ঘাড়ের ওপর দিয়ে গিয়ে পড়েছে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় —সেখান থেকে ঠিকরে এসে লাগছে ওর চোখে—অথচ ও সরে বসেনি। ও কি জানতো, আমি এক সময় এসে ওর উদ্ভাসিত মুখ দেখবো?

'আসুন, দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসনেন না?'

কারাগারের দরজায় যখন জল্লাদ এসে দাঁড়ায়, তখন তাকে কি রকম দেখায়? আমার নিজেকে মনে হলো সেই জল্লাদের মতন। আমার হাতে মারাত্মক অস্ত্র। আমি নিজেকে বুঝতে পারিনি, আমার শরীর অন্যরকম লাগছিল। যেন কোথায় ঢং ঢং করে পাগলা ঘন্টি বাজছিল। আমি তো এ ভেবে এ ঘরে

আসিনি, সরল পদক্ষেপে এসেছিলাম দরজা পর্যন্ত। এখন আমার বলতে ইচ্ছে হলো–গায়ত্রী শেষবারের মতো ইশ্বরের নাম করে নাও।

'দেখুন তো ডিজাইনটা কেমন হচ্ছে?' ওর কণ্ঠস্বর ময়ূরের মতো কর্কশ।

আমি কাছে এসে চেয়ারে কিংবা খাটে বসবো ভাবছিলাম—গায়ত্রী একটু সরে হাত দিয়ে জায়গা দেখিয়েবললো,'বসুননা।'

আমি বললুম, 'গায়ত্রী কেমন আছো?'

ও এক ঝলক হেসে বললো, 'হঠাৎ এ কথা?'

সত্যিই হঠাৎ ওকথা জিজ্ঞেস করার মানে হয় না। পরশুদিন এসেছি, আজ কি আর ওকথা জিজ্ঞেস করা যায়। কিন্তু মেয়েদের কোনো সময় চোখের দিকে তাকালেই আমার মুখ দিয়ে এই প্রশ্ন বেরিয়ে আসে। এর কি উত্তর চাই তা আমি জানি না। হয়তো ওদের ভিতরের কোনো গুপ্ত খবর ওদের মুখ থেকে আমি বিষমভাবে শুনতে চাই। এরপরেই আমার বলতে ইচ্ছে হয়, 'কতদিন তোমাকে দেখিনি'– কিন্তু একথাও বলা চলে না, কারণ গায়ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপই ছিল না, অনিমেষের বিয়ের সময়ও আমি আসিনি, পা ভেঙ্গে বিছানায় শুয়েছিলাম। তবু, 'কতদিন তোমাকে দেখিনি'

একথা বলার ইচ্ছে আমার মধ্যে ছটফট করে।

গায়ত্রীর সঙ্গে মিনিট দশেক কি কি বিষয়ে যেন কথা বললাম। তারপর ও উঠে বললো, 'দাঁড়ান, চায়ের জল চাপিয়ে আসি।' খাট থেকে নামতেই আমি ওর হাত ধরলাম। খাটের পাশে পা ঝুলিয়ে আমি বসেছিলাম—ওকে হাত ধরে পাশে নিয়ে এলাম। ও বললো, 'দেখেছেন, আমি কতটা লম্বা, প্রায় আপনার সমান।'

আমি ওর বুকে মুখটা গুঁজে দিলাম। গায়ত্রী বললো, 'একি একি !' কিন্তু সরে গেল না। আমি দুই হাতে ওর কোমর শক্ত করে জড়িয়ে ওর দুই বুকের মাঝখানের সমতলভূমিতে গরম নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলাম, একটু একটু করে বুঝতে পারলাম, ওর বুকে তাপ আসছে, ওর শরীর আকন্দ ফুলের আঠার মতো আমার চোখে মুখে লেগে যাচ্ছে, ও সরে দাঁড়াচ্ছে না। আমি মনে মনে কাতর অনুরোধ করলাম, গায়ত্রী সরে যাও,—মনে মনে বলেছিলাম, – গায়ত্রী আমাকে একটা থাপ্পড় মারো, ডেকে জাগাও পরীক্ষিৎকে, আমাকে বলো নরকের কুকুর, গায়ত্রী, প্রতিবেশী দিয়ে আমাকে মার খাওয়াও, আমি তোমার প্রতি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো, তোমাকে খুব ভালোবাসবো, সরে যাও গায়ত্রী।

খাটের উপর জায়গা হচ্ছিল না বলে আমি লাথি মেরে পাশবালিশটা ফেলে দিলাম মাটিতে। গায়ত্রী সারা শরীর দিয়ে হাসছে। একবার বললো, 'ও, আপনার মনে এই ছিল।' থুতনির এক বিঘৎ নিচে কামড়ে গভীর লাল করে দিতে ও নিঃশব্দে আর্তনাদ করলো। আমি অশ্লীলভাবে হেসে বললুম, 'তোমার শরীরে তো জোর কম নয়।' ও বললো, 'আপনিও বুঝি কবিতা লেখেন?'

'না, তোমার মুখের ভেতরটা দেখি!'

'তবে বুঝি গল্প?'

'দু' একটা। তোমারলাগছে?'

'না আ, কি রকম গল্প, পড়লে বোঝা যায়? নাকি ওদের মত?'

'মাথা খারাপ!'

'কি মাথা খারাপ? বোঝা যায় না!'

'তুমি ওসব পড়তে যাবে কেন? ওসব পড়ার কি দরকার। মুখটা ফেরাও।'

'সবাই বলে অনিমের একজন বড় কবি। আমি পড়ে কিছুই বুঝতে পারিনা। আমাকে কপি করতে দেয় মাঝে মাঝে। আমি একবর্ণ বুঝি না। অবশ্য বলি, খুব চমৎকার হয়েছে, বিশেষ করে শেষের

লাইনটা। ও যা খুশি হয়!' গায়ত্রী গোপন আনন্দে হাসলো। তারপর বললো, 'বুঝতে পারিনা কেন? লেখার দোষ না আমার মাথার দোষ।'

'সব তোমার দোষ। তুমি কেন এত সুন্দরী হয়েছো?'

'আমি আবার সুন্দরী! আমার তো নাক ছোট, চোখের রঙ কটা।'

'সৌন্দর্য বুঝি নাকে-চোখে থাকে? সৌন্দর্য তো এই জায়গায়।' আমি হাত দিয়ে ওর সৌন্দর্যস্থানগুলি দেখিয়ে দিলুম ও চুমু খেলাম। ও বললো, 'আপনি একটি আস্ত রাক্ষস। আঃ, সত্যি লাগছে, দাগ হয়ে যাবে যে!'

আমি বললাম, 'গায়ত্রী আমার আর বাঁচার পথ রইলো না।'

'কেন?'

'এই যে আমি তোমার মধ্যে ডুবে গেলাম। আমি এর আগে কোনো মেয়েকে ছুঁইনি, কিন্তু পরশুদিন থেকেই তোমাকে দেখে—'

গায়ত্রী পোশাক ঠিক করে উঠে বসলো। তাকাল আমার দিকে একদৃষ্টে আমার মুখে সম্পূর্ণ সরলতাছিল—মঞ্চে যে সরলতা দেখা যায়, যা ভয়ংকর বিশ্বাসজনক।

'ও, আমারই বুঝি দোষ হলো।' গায়ত্রীর গলায় একটু ঝাঁঝ।

'সব তোমার দোষ, কেন দুপুরে এ ঘরে একা বসেছিলে?' একথা বলার সময় গোপনে পিছনে হাত দিয়ে ওর ঘাড়ে শুড়শুড়ি দিয়ে দিলাম। ও এঁকে-বেঁকে হেসে উঠে আমার বুকে কিল মারতে লাগলো। ওর তীব্র ঘনিষ্ঠতা দেখে হঠাৎ আমার সন্দেহ হল, আমার নাম কি অবিনাশ না অনিমেষ? এক বছর আগে আমিই কি ওকে বিয়ে করেছিলাম?

আমরা দু'জনে কিছুক্ষণ পাশাপাশি শুয়ে রইলাম আমি ওর একটা হাত তুলে ঘামের গন্ধ নিতে লাগলুম। এই গন্ধে বেশ নেশা আসে আমার। পরে ঘুম পায়। এই ঘামের গন্ধই মেয়েদের শরীরের গন্ধ। 'অনিমেষ তোমাকে খুব ভালবাসে, না?'

'হ্যাঁ, সত্যিই খুব ভালোবাসে। ওর জন্য আমার মায়া হয়। জানেন, আমি খুব সুখী হয়েছি। আমি তো সব পেয়েছি। এমন সুন্দর স্বামী, সংসারের কোনো জঞ্জাট নেই, ইচ্ছে মতোদিন কাটাতে পারি। অথচ মাঝে মাঝে তবু আমার বুকের মধ্যে হু-হু করে কেন বলুন তো?'

আমি মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বললাম, 'ওসব গণ্ডগোলের প্রশ্ন আমাকে করো না।'

এই সময় হঠাৎ আমার তাপসের কথা মনে পড়ে। তাপস আমাদের সঙ্গে আসেনি, পরে আসবে বলেছে, যে কোনো সময় এসে পড়তে পারে। তাপসের স্বভাবই হলো পরে আসা। পরীক্ষিৎ নয়, তাপসই আমার সবচেয়ে সর্বনাশ করেছে। আমার কানের কাছে মন্ত্র দিয়েছে স্ত্রীলোক মাত্রই সুলভ, ওরা ভালোবাসা চায় না, ওরা গোপনতা চায়। ওদের জন্য ভালোবাসা খরচ করার দরকার নেই। ওরা চায় গোপনে অত্যাচারিত হতে আমার মনে পড়লো, গায়ত্রীকে একবারও আমি বলিনি, ভালোবাসি, এমনকি অভিনয় করেও না, গায়ত্রীও শুনতে চাইলো না। আমি প্রথম ওর ব্লাউজ খুলে স্তনের কুঁড়িতে আলতো করে ঠোঁট ছুইয়ে বলেছিলাম, কী সুন্দর তোমার বুক! তাতেই ও খুশী চোখে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু আমি তো বলিনি, কী সুন্দর তুমি! আমি ওর সম্পূর্ণ বসন সরিয়ে বলেছিলুম, কী সুন্দর তোমার উরু, বলিনি, কী সুন্দর তুমি সে কথাও শুনতে ও চায় নি। অর্থাৎ ভালোবাসা কথাটা শুনতে চায়নি। মাত্র তিন দিনের চেনা এর মধ্যে আবার ভালোবাসা! ধুৎ!

কি দুঃসাহস গায়ত্রীর, ওঘরে পরীক্ষৎ শুয়ে— মাঝখানের দরজাটা ভেজানো—এমনকি বন্ধ না পর্যন্ত। প্রথম যখন ওর কোমর জড়িয়ে ধরলাম, তখনও ও রেগে উঠলে, অনায়াসে আমি ঠাট্টা বলে চালিয়ে দিতে পারতুম। বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে এসব ঠাট্টা কি আর চলে না! কিন্তু কি আর চলে না! কিন্তু ওর

সমস্ত সত্তা যেন একটা বিশাল তালাভাঙ্গা দরজার মতো ছিল, একটু ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। আসলে এর মধ্যে আমার কোনো লোভ, কোনো পরীক্ষা করার ইচ্ছে, অনিমেষকে যন্ত্রণা দেবার চেষ্টা, কিছুই ছিল না–শুধু দুপুরবেলার ঘুমহীনতা, শুধু এইটুকুই, এইজন্যই এসেছিলাম এঘরে। কিছুদিন ধরে সবসময়ে আমি ছটফট করছি কোনোরকম ভোগে আসক্তি নেই, মেয়েদের দেখলে তেমন একটা ইচ্ছে সত্যই জাগতো না, গায়ত্রীও তেমন কিছু রূপসী নয়—হঠাৎ আনমনে চলে এসেছি এঘরে, কথা বলতে বলতে প্রায় অজান্তেই ধরেছি ওর হাত, স্বাভাবিকভাবেই একটা হাত চলে গেছে ওর কোমরে—এবং তারপর বুকে মুখ না গোঁজার কোনোই মানে হয় না। আর বুকে মুখ গোঁজার পর কে না চায় পাশে টেনে শোয়াতে!—অথচ যেন কি বিরাট কাণ্ড ঘটে গেল— লোকে শুনলে তাই ভাববে, এরই জন্য খুনোখুনি হয়, আত্মহত্যা–না শুধু এইটুকুই না বোধহয়–যারা খুনোখুনি বা আত্মহত্যা করে তারা মাত্র এর জন্যই করেনা–আর একটা কিছু জড়িত থাকে–ভালোবাসা, সে সম্পর্কে আমার তো কোনোই দাবী নেই, বোধ নেই, বোধ নেই বলা ঠিক হলো না, আগে ছিল—আজ আর মনে পড়ে না। অনিমেষ, তোমার ভালোবাসায় আমি কোনো ভাগ বসাইনি, তোমার স্ত্রীর ওপর কোনো লোভ করিনি, সম্পূর্ণ নির্লোভ আমার এই আজকের দুপুরের একটা ডুব, কোথাও কোনো মলিনতা নেই, এক নদীতে কেউ দুবার ডুব দেয় না। কী ক্ষতি হয় এতে?

হঠাৎ বিষম ভয় পেয়ে আমি বিছানায় উঠে বসলুম; ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে মারাত্মক অজগরের মতো একটা নীল রঙের ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে ক্রমশঃ স্ফীত হতে হতে এগিয়ে আসছে। ধোঁয়ার রেখাটা এসে আমাকে ছুঁয়ে কেটে গেল। এর মানে পরীক্ষিৎ জেগে আছে, আর শেষ পর্যন্ত আমি পরীক্ষিতের প্যাঁচে পড়লুম। ও এখন আমাকে আর অনিমেষকে নিয়ে ভয়ংকর খেলা খেলবে, আমাকে সুস্থ হতে দেবে না, আমাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে দেবে না। ওর এই নেশা আমি জানি। তাড়াতাড়ি আমি গায়ত্রীর মুখ এদিকে ফিরিয়ে দিলাম যাতে নীল ধোঁয়া ও দেখতে না পায়।

'এখন চা খাবেন?' ফিস ফিস করে গায়ত্রী জিজ্ঞেস করলো। 'চলুন না, আমি রান্না ঘরে গিয়ে তৈরী করবো, আপনি পাশে বসবেন।'

'অনিমেষ বুঝি রোজ বসে?'

'না, ও তখন কবিতা লেখে। এই বলে গায়ত্রী নিয়ম আলোর মত কুৎসিত রঙে হাসলো। তারপর বললো, 'কলকাতায় আপনাদের বাড়ি যাবো।'

'আমি তো মেসে থাকি, 'সেখানে মেয়েরা থাকতে পারে না।'

'তবে কোথায় থাকবো? যাবো না কলকাতায়? আর দেখা হবে না।'

'বিমলেন্দুদের বাড়িতে থাকবে। ওদের বাড়ীতে অনেক জায়গা আছে। বিমলেন্দু ছেলেও খুব ভালো।'

'আমি তো চিনি। বিয়ের সময় এসেছিল। বড্ড গম্ভীর।'

ওর চোখে–মুখে আমি লোভ দেখতে পাচ্ছি। আহা, অনিমেষের জন্য সত্যিই আমার দুঃখ হলো। এইসব মেয়েরা স্ত্রী কাঁকড়া বিছের মতো, তাদের স্বামীদের সম্পূর্ণ গ্রাস করে। 'আমার বুকের মধ্যে তবু হু–হু করে কেন বলুন তো?' গায়ত্রী একটু আগে আমাকে যে জিজ্ঞেস করেছিল তার উত্তর আমি জানি। পরীক্ষিৎ কিংবা শেখর হলে অনেক বড় বড় কথা বলতো, নিঃসঙ্গতা, উদাসীনতা এই সব। আসলে মেয়েটা একটু বেশি চায়। অল্পে খুশী হতে চায় না। অনিমেষের মতো সূক্ষ্ম ধরনের ছেলেকে বিয়ে করে ওর আশা মিটছে না, চায় একটা ধারাবাহিক নির্লজ্জ অনুষ্ঠান। অনিমেষের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বেশি দিনের নয়, ও যে ঠিক কী রকম ছেলে আমি জানিনা। বিমলেন্দু আর তাপসের বন্ধু হিসেবেই পরিচয় হয়েছিল। তবে ওকে বড় ভালো লাগে আমার, যেন সব সময় তারের ওপর দিয়ে হাঁটছে, এমন নিখুঁত। অনিমেষের কোনো ক্ষতি করতে চাই না আমি, আমি সত্যিই অনিমেষকে কোনো দুঃখ দিতে চাইনি।

এতে কি আসে যায় অনিমেষের? এতো একটা দুপুরের দুর্ঘটনা। দুপুরবেলা কোনো কাজ ছিল না, ফাঁকা-ফাঁকালাগছিল—। যাই হোক, অনিমেষ, আমি মনে মনে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, হলো তো?

'আমার তো কিছুরই অভাব নেই, তবু মাঝে মাঝে বিষম মন খারাপ লাগে কেন বলুন তো?'

'তোমার মন বলে যে কিছু আছে এই প্রথম জানলুম।'–কথাটা বলেই বুঝলাম, খুবই বেফাঁস হয়ে গেছে, তবুও গায়ত্রীর ওপর আমার বিষম ঘৃণা এসে গেল। আমি আদর করার ভঙ্গীতে ওকে কামড়ে দিলাম। গায়ত্রী আমার কথায় ধড়মড় করে উঠে বসেছিল–কিন্তু আমার মুখে সেই মঞ্চাভিনেতার সরল হাসি দেখে তৎক্ষাণাৎ ভুলে গিয়ে নিজেও হাসলো। 'আমাকে বুঝি খুব খারাপ ভাবছেন?'

'তোমাকে খারাপ ভাবতুম যদি না আজ দুপুরে তোমার কাছে আসতুম। তোমাকে মনে হতো নিছক মফস্বলের বউ। তুমি একটি রত্ন। তুমি বিয়ের আগে ক'টা প্রেম করেছে?'

'যাঃ!' ও হাসলো আবার। 'আমি মানুষ হয়েছি কাশীতে, ওখানে মেয়েই বেশি, ছেলে কোথায়?'

'তবু?'

'সে কিছু না। বলার মতো কিছু না।'

আমি চোখ বুঁজলুম। একটু একটু ঘুম পাচ্ছে যেন।

খানিকটা পর চায়ের কাপ নিয়ে এসে আমার থুতনিতে একটা টোকা মেরে বললো, 'উঠুন এবার পাশের ঘরে গিয়ে বসুন, লজ্জা নেই আপনার? বন্ধু দেখলে কি ভাববে–এঘরে এসে খাটে ঘুমোচ্ছেন?'

'পরীক্ষিৎ' আমি বললুম, 'কে ওকে গ্রাহ্য করে, ও আবার মানুষ নাকি?'

এরই মধ্যে গায়ত্রী কখন স্নান করে নিয়েছে এবং আবার শুদ্ধ পবিত্র দেখাচ্ছে ওকে। আমার মধ্যে আবার আলোড়ন হলো, রূপ দেখেই তাকে নষ্ট করার পুরানো ইচ্ছে জেগে উঠলো, হাতও বাড়িয়ে ছিলাম কিন্তু হাওয়া থেকে ফিরিয়ে আনলুম হাত–তুড়ি মারার ভঙ্গীতে। ধীরে–সুস্থে উঠে পাশের ঘরের ইজি-চেয়ারে বসলাম। গায়ত্রী বোধ হয় আশা করেছিল আমি যাবার সময় ওকে একবার চুমু খাবো।

গায়ত্রী পরীক্ষৎকে ডাকতে লাগলো। পরীক্ষৎ ঘুমের ভান করে পড়ে আছে। বিষম ডাকাডাকিতে ওঠে না। আমি ওকে একটা লাথি মারতেই আস্তে আস্তে চোখ তুললো, তারপর ঠোঁট ফাঁক করলো, তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'কটা বাজে?'

'চা। নিন, উঠে মুখ ধুয়ে নিন।' গায়ত্রী খুব মিষ্টি করে বললো ওকে।

অনিমেষ এলো সন্ধ্যের পর। খুব লজ্জিত মুখ। গলার টাই খুলতে খুলতে বললো, 'ইস, তোদের খুব কষ্ট দিয়েছি। এমন চাকরি, ছুটি নিলেও নিষ্কৃতি নেই! কি করলি সারা দুপুর।' পরীক্ষিৎ বিরক্ত মুখে বললো, 'সারা দুপুর আমি পড়ে পড়ে ঘুমোলুম শুধু। বিশ্রী ঘুম। অবিনাশ বোধ হয় লিখছিল না কি।'

'না, আমি লিখি–টিখিনি।'

'আসবার সময় একটা জিনিস দেখে মনটা বড় ভালো লাগছে।' অনিমেষ বললো অন্যমনস্ক গলায়, 'শ্মশানের পাশ দিয়ে আসবার সময় দেখি শ্মশান ধুচ্ছে। সব চিতাগুলো নেভানো, পরিষ্কার, কোন লোকজন নেই। ডোমগুলো একটা সদ্য শেষ—হওয়া চিতা জল ঢেলে–ঢেলে ধুচ্ছে। আমি খানিকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। মনে হলো, পৃথিবী থেকে যেন সব চিতা ওরা ধুয়ে ফেলছে। কোথাও আর কোনোমৃত্যু নেই।'

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। যাক, অনিমেষের মন এখন কবিত্বে ডুবে আছে। আমাদের দুপুর কাটানো নিয়ে ও আর বিশেষ মাথা ঘামাবে না।

বাইরে বসে চা খেতে খেতে খানিকক্ষণ আড্ডার পর পরীক্ষিৎ হঠাৎ অনিমেষকে একটু আড়ালে ডেকে বললো, 'শোন্'—

BANGLAPDF.NET

আমি সাধারণত ঃ কেউ আড়ালে গিয়ে কথা বললে সেখানে যাই না, কান পাতি না–কিন্তু এখন আমি কিছুতে অনিমেষ আর পরীক্ষিৎকে একসঙ্গে থাকতে দিতে চাইনা। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে নিরীহ মুখে বললুম, 'কি বলছিস রে?'

'রাত্তিরের দিকে একটু খেলে হতো না?' পরীক্ষিৎ জিজ্ঞেস করলো।

'কিন্তু গায়ত্রীর সামনে,' অনিমেষ বিব্রত মুখে বললো, 'কোনোদিন তো খাইনি। তুই যদি বলিস্—
,

'কোনোদিন খাসনি, আজ থেকে শুরু কর" পরীক্ষিৎ ওকে খোঁচা মারে। আমি বুঝতে পারলুম অনিমেষ সিত্যেই চায়না, বললুম, 'তার চেয়ে বেরিয়ে গিয়ে মাঠে বসে—'

নদীর ধারে চমৎকার ঘাট বাঁধানো। দূরে মার্বেল পাহাড় দেখাযায় নদীর ধারে চমৎকার ঘাট বাঁধানো। দুরে মার্বেল পাহাড় দেখা যায়। বাকি অন্ধকার। একেবারে, শেষ সিঁড়িতে একজন সাধু বসে আছে অনেকক্ষণ। দূরে শ্মশান। অনিমেষের ধারণা সত্যি নয়। তিনটে চিতা একসঙ্গে জ্বলছে হু–হু করে। শীতকালের এই শেষ দিকটাতেই বেশি লোক মরে–পুরোনো রুগীরা টেঁকে না। তিনজনে চুপচাপ বসে–ওয়াটার বট্‌লের গ্লাসে জল মিশিয়ে খাচ্ছি। পরীক্ষিৎ অস্বাভাবিক চুপ। সাধারণতঃ ও একটু নেশা হলেই বিষম বক্‌বক্ করে। আজ এমন চুপ কেন? ওর যে কোনো ব্যবহারই আমার কাছে সন্দেহজনক লাগছে। অনিমেষ, বললো, 'কাল সন্ধ্যেবেলা রূপগিরি ঝর্ণায় বেড়াতে যাবো, ভারী সুন্দর জায়গাটা।'

এই সময় অন্ধকারে সাইকেল রিক্সার আওয়াজ হলো। আমরা সচিকিত হয়ে দেখলুম তাপস। 'আরে বাবাঃ, বহুদিন বাঁচবি তুই', পরীক্ষিৎ চেঁচিয়ে বললো, 'সোজা এখানে এলি কি করে, গন্ধ শুঁকে?'

'না, বাড়িতে গিয়ে শুনলুম, তোরা নদীর পাড়ে এসেছিস। বাড়িতে বসতে পারতুম–কিন্তু গায়ত্রী রান্নায় ব্যস্ত, মাংস চাপিয়েছে, তাই সোজা চলে এলুম।'

আমরা তিনজনে তিনটি বাতিস্তম্ভের মতো স্তব্ধ হয়েও মুখোমুখি বসেছিলুম এতক্ষণ, তাপস এসেই প্রথমে এক চুমুকে বোতলের বাকিটুকু শেষ করে নিজের ব্যাগ থেকে একটা পুরো বোতল বার করলো। তারপর বললো, 'খবরের কাগজ পড়িস? এখানে বাংলা কাগজ আসে?'

'না! কেন রে?' আমরা সচকিত হয়ে উঠলুম।

'সুধীনদত্ত মারা গেছেন।'

'সেকি? এই সেদিনও তো দেখে এলুম সবিতাব্রতর বাড়িতে। রীতিমত শক্ত চেহারা। কি

'ঠিক জানিনা। বিমলেন্দু, শেখর, অম্লান, ছায়া ওরা সব গিয়েছিল ওর বাড়িতে। ওরা শ্মশানে যাবার সময় খাটে কাঁধও দিয়েছিল। আমি যাইনি; মৃত্যুর পর মানিকবাবুকে দেখে এমন অসম্ভব ভয় পেয়েছিলাম যে, আর কারুর মৃত্যুতে যাইনা। শুনলাম, হার্ট ফেলিওর। রাত্তিরবেলা নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছেন, মাঝ রাত্তিরে উঠে একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে একবার কাশি, সঙ্গে সঙ্গে শেষ।'

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইলাম। খুবই আশ্চর্যের কথা, চুপ করে থাকার সময় আমার মন সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে ভুলে বারবার চলে যাচ্ছিল গায়ত্রীর সঙ্গে দুপুরের দিকে— সেখান থেকে আমার স্যুটকেসের চাবি হারিয়ে যাওয়ায়, তারপর পকেটের দেশলাইয়ে, হঠাৎ জলের শব্দে, শ্মশানের আগুনে–তারপর আবার সুধীন্দ্রনাথ দত্তে ফিরে এসে খুবই আন্তরিকভাবে তাঁর জন্য দুঃখ বোধ করলুম। সবিতাব্রতর বাড়িতে তিনি আমাকে কি কি যেন বলেছিলেন, আমার মনে পড়লো না। আহা, ভারী সুন্দর দেখতে ছিল তাঁকে, মারা গেলেন! যাকগে কি আর হবে–ওয়াটার বটলে একটুও জল নেই। এখন কোথায় জল পাবো?

'একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছিস, সুধীন দত্ত এবং জীবনানন্দ দাশ এদের কারুরই মৃত্যু স্বাভাবিক নয়।' অনিমেষ বললো, –'অসুখে ভুগে ভুগে মরলে এদের যেন মানাতো না।'

'আয়, সুধীনবাবুর নাম করে আমরা বাকি বোতলটা খাই।' পরীক্ষিৎ বললো। শেষের দিকে আমাদের চারজনেরই বেশ নেশা গেল। আমি কতবার মনে করার চেষ্টা করলুম, স্যুটকেসের চাবিটা আমি কলকাতাতেই ফেলে এসেছি, না এখানে এসে হারালো। কিছুতেই মনে পড়ে না।

পরীক্ষিৎ ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নিচে। সাধুবাবার সঙ্গে কি নিয়ে কিছুক্ষণ বচসা করে ফিরে এসে বললো, 'না, নেই।'

'কি?'

'গাঁজা।'

তাপস বললো, 'রাত্তিরটা কি করবি?'

'ঘুমোবো,' আমি বললাম।

'ইয়ার্কি আর কি" এতদূরে এলুম ঘুমোবার জন্য? অনিমেষ ওর বৌকে নিয়ে একঘরে ঘুমোবে— আর আমরা তিন তিনটে মদ্দা এক ঘরে" ধ্যুৎ, এর কোনো মানে হয়?"

অনিমেষ তাড়াতাড়ি বললো, আচ্ছা গায়ত্রী পাশের ঘরে একা থাক, আর আমরা চারজনে একসঙ্গেশোবো।'

'কেন বাবা।' তাপস ধমকে উঠলো, 'আমি না হয় তোমার বৌ–এর সঙ্গে আজ শুই—আর তুমি ওদের সঙ্গে শোও। একটা রাত্তিরে কিছু হবে না। আমি বিয়ে করলে তুমি একদিন শুয়ে নিও। শোধ হয়ে যাবে।'

'তাই নাকি!' হা–হা করে পরীক্ষিৎ অট্টহাসি করে উঠলো। অনেকক্ষণ ধরে হাসলো, হাসি থামতেই চায় না। 'চমৎকার বলেছিস্, ওফ্।' আবার হাসি। শেষে একটা থাপ্পড় মেরে ওকে থামাতে হলো।

অনিমেষ মুচকি হেসে বললো, 'এসব কি আর এত সহজে হয়। অন্য জনেরও তো একটা মতামত আছে!'

তাপস বললো, 'ঠিক আছে, আমি ওর মত যাচাই করে দেখছি। তোর কোন আপত্তি নেই তো?'

এসব আলোচনা যত হয় ততই আমার ভোলো। ব্যাপারটা হাল্কা দিকে থাকে। আমার ঘটনা পরীক্ষিৎ বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। এরা তিনজনেই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু–কত স্বপ্ন, পরিকল্পনা করেছি একসঙ্গে। কিন্তু আজ আমার কেমন খাপছাড়া লাগছে। মনে হচ্ছে আমি ওদের দলের বাইরে, আমার সঙ্গে আর মিলছে না। এই ক্ষেপে ওঠানো সময়, সব রকম নিয়মহীনতা। এখনো তো পৃথিবীতে আছে কত মানুষ, আত্মবিস্মৃত, হেমন্তের অবিরল পাতার মতো। ঘুমোতে ও জেগে ওঠে, দশটায় অফিস যাবে বলে সারা সকালটাই যায় সেই প্রস্তুতিতে, এবং সত্যি সত্যিই অফিস যায় রোজ, তারা সিনেমা দেখে আনন্দ পায়, বৌকে নিয়ে রিক্সায় চাপতে পারে, তাশ খেলায় দু'বাজি জিতে স্বর্গসুখ পায়। আমিও তাদের মতই বাঁচতে চাই, দু'চারটে গল্প–কবিতা লিখে বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করার ভার আমাকে কে দিয়েছে? কী এমন বিষম দরকারী এই বন্ধুসঙ্গ, এই অসামাজিকতা, এই বিবেকহীন, বাসনাহীন, রমণীভোগ! না, আমি এসব আর চাই না। এখান থেকে কলকাতা গিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়বো, বহুদিনের ঘুম, সারাটা জীবন ঘুমন্ত মানুষের মতো ঘুরবো–ফিরবো অজ্ঞানে, আমার শিরা–উপশিরায় সমস্ত রক্ত ভীত এবং ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। এসব বখাটে বন্ধু–বান্ধবদের সঙ্গে আমি মোটেই মিশতে চাই না আর।

কিন্তু তার আগে যদি এবারের মতো বেঁচে যাই, পরীক্ষিৎকে সামলাতে পারি, যদি দ্বিধাহীন রেখে যেতে পারি অনিমেষের মন। হঠাৎ কেন আজ দুপুরবেলা! খুব অন্যায় কি? আমি কিন্তু সত্যিই অনিমেষকে কোনো কষ্ট দিতে চাই না।

পরীক্ষাৎ হাই তুলে বললো, 'অসম্ভব ঘুমিয়েছি দুপুরে। এখনো ঘুম গায়ে লেগে আছে। তুই কি করলি রে?'

অদ্ভুত ক্ষমতা আছে পরীক্ষিতের। যে যেটা চিন্তা করে গোপনে, ও ঠিক প্রসঙ্গে কথা বলবে। অন্ততঃ আমার সঙ্গে তো অসম্ভব মেলে। বললুম, 'দূরের বাঁধের কাছটায় গিয়েছিলাম আদিবাসীদের দেখতে। কিন্তু আজকাল আর আদিবাসী—মেয়েরা তেমন সুন্দরী নেই। পাঁচ-ছ'বছর আগেও ছত্রিশগড়ি মেয়েদের যা দেখেছি! এখন ব্লাউজ-শায়া পরে, কাচের চুড়ি পরে না, স্নান করার সময়ও সবকিছু খোলে না।'

অনিমেষ বললো, 'আপনি বুঝি ভেবেছিলেন সবকিছু রেডি থাকবে খুলে টুলে—আর আপনি গিয়ে চোখ ভরে দেখে আসবেন। আদিবাসীরাও সভ্য আর সজাগ হয়ে যাচ্ছে।'

আমি অন্যমনস্ক গলায় বললুম, 'হয়তো আগেই ওরা বরং সভ্য ছিল, এখন আমাদের মতো অসভ্য হচ্ছে।' বলেই মনে হলো, একথাটা বেশ বোকাবোকা হয়ে গেল, কারণ অনিমেষের কথায় বোধহয় ঠাট্টার সুর ছিল। কিন্তু আমার দুপুর-কাটানোর প্রসঙ্গের চেয়ে ছত্রিশগড়ি মেয়েদের নিয়ে সাধারণ কথাবার্তাও ভালো। 'তা ছাড়া', আমি আরও বললুম 'সাঁওতালরা—আমার মনে হয় না,' হাঁ, আমি— কি কি বলেছিলাম মনে নেই, তবে আদিবাসী প্রসঙ্গে নিয়ে কিছু কথা হয়েছিল। কিন্তু মোক্ষম কথা বললো পরীক্ষিৎ, 'অবিনাশটা মেয়েছেলে চাড়া কিছু জানে না। এই তিনদিন তুই কাটাচ্ছিস কি করে? নাকি চালাচ্ছিস কিছু গোপনে?'

আমার চোখদুটো হঠাৎ ঝিমিয়ে এলো। ইচ্ছে হলো ওকে খুন করি সেই মুহূর্তে। একবার ওর দিকে তাকালুম এবং সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত উদাসীন হাসি হেসে আমি অনিমেষের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললুম, 'আপনি আজকাল কি লিখছেন?'

অনিমেষ বললো, 'না, কবিতার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি বোধ হয়। কলম হাতে নিয়ে বসি সব ঠিকঠাক আছে কিন্তু ভাষা নেই।'

'আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে, তোদের পায়নি?' তাপস জিজ্ঞেস করে। গায়ত্রীকে দেখে এলুম মাংস চাপিয়েছে। চলযাই।'

অনিমেষ উঠে দাঁড়ালো। পরীক্ষিতের পা টলছে। তাপস আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললো, 'মুখটা গম্ভীর করলে তোকে একদম মানায় না, অবিনাশ।'

চারজনে আমরা একঘরে শুয়েছি। পাশের ঘরে গায়ত্রী। আজ খাবার পর সকলে একসঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলাম, গায়ত্রীও। তাপস খুব জমিয়ে দিয়েছিল। তাপস এসে পড়ায় খুব ভাল হয়েছে- পরীক্ষিতের পাগলামি আমাকে সহ্য করতে হচ্ছে না। তারপর বেশ রাত হতে অনিমেষ গায়ত্রীকে বললো, 'আজ এ ঘরেই থাকি। তোমার একা থাকতে ভয় করবে?'

'না ভয় কেন! না না।' গায়ত্রী মিষ্টি হেসে বললো।

'ভয় করলে আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারি।' তাপস সরল মুখে জানালো।

'তা হলেই আমার বেশি ভয় করবে।' সমস্বরে হাসি। গায়ত্রীর চোখের দিকে তাকাইনি।

গায়ত্রী ওঘরে গিয়ে আলো নিভিয়ে দেবার পর আমরা চারজনে খানিকক্ষণ তাশ খেললাম। আমার ভাল লাগছিল না। একবার খুব ভালো হাত পেতেই আমি তাসগুলো ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, 'নাঃ, এবার তোল্।'

প্রত্যেকেরই অল্প নেশা ছিল তখনও, সুতরাং শুয়ে শুয়ে গল্প করার নাম করে আলো নিভিয়ে দিতেই ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হল না।

মাঝরাতে বুকের ওপর একটা প্রচণ্ড ঘুশি খেয়ে জেগে উঠলাম। অসম্ভব লেগেছিল, স্পষ্ট আর্তনাদ করে আমি উঠে বসলাম। আমার পাশে তাপস, তারপর অনিমেষ, তারপর পরীক্ষিৎ। আমার চোখে

BANGLADOR.NET

তখনও ঘুমঘোর কিন্তু বুকে যন্ত্রণা। মনে হচ্ছে এরা তিনজনেই বহুক্ষণ ঘুমন্ত। ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে আলো জ্বালাতেই পরীক্ষিতের সুরেলা গলা শুনতে পেলাম, 'অনিনাশ কোথায় গিয়েছিলি রে?'

প্রথমটায় আমি বুঝতে পারিনি ওর মতলব। বললুম 'কোথাও যাইনি তো, হঠাৎ'—

'এই যে দেখলুম, তুই বাইরে থেকে এলি,' মিটিমিটি হাসলো পরীক্ষিৎ, 'আলো নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, সাপখোপ আছে।'

এবার বুঝলুম, ও কি চায়। ও সাজাতে চায়, আমি চুপি বাইরে গিয়েছিলাম। অর্থাৎ গায়ত্রীর ঘরে হয়তো। পরীক্ষিতের খাড়া নাকটার দিকে একবার তাকালাম। তারপর পা-জামার দড়িটা ভাল করে বেঁধে ওর দিকে এগুতে যাবার আগেই অনিমেষ বললো, 'না, না, আমি দেখেছি পরীক্ষিৎ আপনাকে ঘুসি মেরেজোগিয়েছে।'

রাগ ভুলে সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে পুরোনো হুল্লোড়ের ভাবটা এসে গেল। 'সেকি মশাই, আপনি জেগে আছেন? কেন? ওঃ হো'-বলে এমন জোরে হেসে উঠলুম যে তাপসও ঘুম ভেঙে তাকালো। আমার মধ্যে একটা অসভ্য, বিকৃত, মজার ইচ্ছে আগেকার দিনগুলোর মতো হঠাৎ ছটফট করে উঠলো। 'উঠুন উঠুন', অনিমেষকে হাত ধরে টেনে তুললুম-তারপর গায়ত্রীর ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলাম বেশ শব্দ করে। এক শরীর ঘুম নিয়ে গায়ত্রী উঠে আসতেই আমি অনিমেষকে হিড়হিড় করে টেনে আনলুম-অমন ডেলিকেট ধরনের ছেলে অনিমেষ—আমার এরকম বর্বরতায় খুব বিব্রত বোধ করছিল, কিন্তু ওর চেয়ে আমার গায়ের জোর বেশি, ওকে উঁচু করে তুলে গায়ত্রীর ঘরে ঠেলে দিয়ে বললুম, 'এই নাও তোমার জিনিস।' তারপর দরজা টেনে দিলাম।

আমার ব্যবহারটা বোধহয় জমল না, বোধহয় খানিকটা অতি-নাটকীয় হয়েছিল তাই পরীক্ষিৎ বা তাপস যোগ দেয়নি। কিছুক্ষণ চুপচাপ শোবার পর তাপস বিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার রে?'-'কিছু না, ঘুমের ঘোরে ও আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল, তাই বেচারাকে ঘরে পাঠিয়ে দিলাম।' পরীক্ষিৎ বললো, ''শোন আবিনাশ—।' আমি বললুম 'আজ নয়, আজ আমার ঘুম পেয়েছে, কোনো কথা শুনবো না।'

সেদিন রাত্রে আমি একটা ছোট স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্নটা হয়তো ছোট নয়, কিংবা অনেকগুলো স্বপ্ন। কিন্তু আমার অল্প একটু মনে আছে।

'স্বপ্নটা এই রকম ঃ

প্রশ্ন ঃ তোমার জিভটার বদলে কি দেবে?

আমি ঃ আর যাই হোক, দু'চোখের মণি নয়।

প্রশ্ন ঃ তবে?

আমিঃ আমার একটা পা—

—তা কি সমান হলো। জিভের সমান একটা পা?

—তবে, আমার হাতের আঙুলগুলো নিন, ডান হাতের আঙুল, যে হাত দিয়ে আমি লিখি।

—না, জিভ থাকলে তুমি অন্য লোক দিয়ে ও লেখাতে পারবে।

—তবে কি দেবো? বুকের একটা পাঁচরা নিন্।

—না, জিভের বদলে আর কিছু হয় না। আমি তোমার জিভটাই চাই।

—কেন? কেন?

—তুমি এক ধরনের সুখ চাও, তাই-ই পাবে। সে সুখের জন্য মানুষের জিভটা অবান্তর।

—না-না।

—কেন, পৃথিবীতে বোবা মানুষেরা যৌনসুখ পায়না?

BANGLADENET

—কি জানি। পায় হয়তো। অন্ততঃ পাওয়া উচিত। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, পাবো না। আমায় দয়াকরুন।

আমি ডাক ছেড়ে কাঁদতে আরম্ভ করলুম। আমার চোখের জলের ফোঁটাগুলো বিশাল বিশাল জলস্তম্ভের মতো ঘুরতে লাগলো।

কাজ সেরে যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলুম, আপনি কোন দেবতা তা তো জানা হলো না। কিন্তু তখন আমার জিভ নেই—সুতরাং আমার কথা বোঝা গেল না, দেবতাটি অস্পষ্ট ঘড়ঘড় শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেলে গেলেন। আমি দরজার পাশে পরীক্ষিৎকে পুরো ব্যাপারটার সাক্ষী হিসেবে দাঁড়ানো দেখতে পেলুম।

পরদিন সকালে আমার ঘুম একটু দেরিতে ভেঙ্গেছিল। স্বপ্নের কথাটা সকালে মনে পড়েনি। মনে পড়েছিল। অনেকদিন পর, আজ লেখার সময়। আমি মুখ ধুতে বাথরুমে পেস্ট আনতে গেছি, গায়ত্রী বেসিনে কাপ—ডিস ধুচ্ছিল, আমাকে দেখে চাপা গলায় বললো, 'আপনি একটি অসভ্য ও ইতর। কাল রাত্তিরে কি করলেন?' উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে আসার পর মনে পড়লো জিভ—ছোলাটা আনা হয়নি, মুখ ধোবার সময় ঐটা চাই-ই, নইলে বড় নোংরা লাগে। আমি আবার বাথরুমে ঢুকতেই গায়ত্রীঃ 'সামান্য একটুও কি, ছি ছি।' আমি বললুম, 'খুব কি খারাপ করেছি? অনিমেষের জন্য আমার মায়া হচ্ছিল।'

'লজ্জা করে না আপনার?'

আমি ওর নিচু থাকা ঘাড়ে আলতো দাঁত বসিয়ে দিতে গিয়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ও বনবিড়ালীর মতো ঘুরে দাঁড়াইতেই আমি বেরিয়ে এলাম।

আমলকি গাছের ছায়ায় বসে রোদ পোয়াচ্ছে পরীক্ষিৎ, তাপস খবরের কাগজের একটা শীটের উপর শুয়ে আর একটা শীট সম্পূর্ণ খুলে ধরে পড়ছে। অনিমেষ নেই। বেশ ঝকঝকে সকালটি, একছিটে মেঘ নেই আকাশে। ফটফট করছে নীল রঙ, তাপস চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, ওর চোখের মণি দুটোও খানিকটা নীলচে। ঘড়ঘড় শব্দ করে একটা তিনচাকার কিম্ভুতকিমাকার গাড়ি চালিয়ে একটা লোক এসে উপস্থিত হলো। আওয়াজটায় বিরক্ত হয়েছিলাম–আমি চোখ গরম করে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি চাই?' লোকটার বেশ তেল–চকচকে গোল মুখখানি, কিন্তু গলা কিংবা ঘাড় বলে কিছু নেই, থুত্নির নিচেই বুক। বলল, 'আমি আজ্ঞে, মনোহারী জিনিসপত্তর এনেছি।'

'কি আছে তোমার?'

'পাঁউরুটি, বিস্কুট, গরমমশলা, বাঁধাকপি, তেজপাতা, ঘি, তিলকুটো, চন্দ্রপুলি, শোনা পাপড়ি, আসল বাঙ্গালীর তৈরি—'। লোকটা অনেক কিছু বলতো এমন ওর মুখের ভাব, থামিয়ে বললুম, 'চাই—না।'

'আজ্ঞে?'

'চাইনা।'

'আজ্ঞে?'

বিরাট চিৎকার করে আমি বললুম, 'চা–ইনা।' লোকটা বুঝতে পেরে গাড়ি ঘোরালো। তাপস মনোযোগ দিয়ে কিছু পড়ছিল, শেষ না হওয়া পর্যন্ত চোখ তুলতে পারছিল না, এবার হঠাৎ বললো, 'ডাক্, ডাক্ লোকটাকে। ভারী চমৎকার ওর মুখখানা, ওকে আমার কাজে লাগবে।।' বিষম হল্লা করে লোকটাকে অনেকক্ষণ ডাকার পর ঘাড় ফেরালো, ঠিক ঘাড় না, বুক ফেরালো বলা যায়। আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে এলো। 'দোকান খোলো, দেখি কি আছে?'

'খাবার–টাবার নেবেন, না তরকারি, স্টেশনারি?'

'কি খাবার, দেখাও।'

'চন্দ্রপুলি, তিলকুটো, শোনপাপড়ি।'

'দাম বলো, কত করে?'

'দু'আনা পীস্। ডজন? দেড়টাকা। খাঁটি এক টাকা ছ'আনা পাবেন, স্যার।'

'বারো আনা দিতে পারি, এর চেয়ে বেশি হয় না ভাই।'

'না, পারবো না স্যার, কেনা দাম পড়ে না।'

'ওঃ, তোমার কেনা জিনিস নাকি? আমরা ভেবেছিলাম ঘরের তৈরি। তবে কে কিনবে?'

'না, মানে মালপত্তর স্যার, কিনতেই হয় স্যার, খরচ পোষায় না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার ক্ষতি করতে চাই না।' তুমি আদ্দেক—আদ্দেক দিয়ে যাও।'

'আধডজন করে নেবেন?'

'না, সব জিনিষের আদ্দেক। বারো আনায় চন্দ্রপুলির চন্দ্রটা দিয়ে যাও, পুলিটা তোমার থাক্।'

'চন্দ্র? শুধু চন্দ্র?'

'হ্যাঁ! যেমন ধরো তিলকুটো। তিলগুলোই দাও ('না হয় শালা, তর্পণ করবো একমাস)', তাপস আমার দিকে তাকিয়ে বললো–'তুমি কুটোগুলো স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারো।'

'পারবো না স্যার'—লোকটা খানিক্ষণ কি ভাবলো, তারপর বিরাট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

'তুমি হয়তো ভাবছো,' পরীক্ষিৎ বললো, 'আমরা প্রথমদিকটা মানে ভালো দিকটা নিয়ে নিচ্ছি বলে তোমার ক্ষতি হচ্ছে। বেশতো শোনপাপড়ির প্রথমটুকুই তুমি নাও আমাদের পাপড়িগুলোই দাও! কিহে?'

'না হয় না, তা হয় না।'

'পাঁউরুটির কোন ভাগটা নিবি?' তাপস জিজ্ঞেস করলো, 'পাঁউ না রুটি?'

'আমি রুটি খাইনা।' পরীক্ষিৎ জানালো।

'তবে বুঝি পাঁউ খাস? দাও, ওকে পাঁউটা দিয়ে যাও। পাঁউ দিতে পারবে তো?' লোকটা চুপ। ওর চোখের ফলক পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। মূর্তির মতো তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। 'আর কি আছে দেখি?' পরীক্ষিৎ এগিয়ে ওর দোকানগাড়ির ঢাকনা খুলে দেখলো। 'দারচিনি মানে দারুচিনি, শুধু দারু হ্যায় তুমারা পাশ? মহুল কিংবা পচাই?'

'না!'

'অ! দারচিনিকে আবার গরম মশলাও বলে। গরম মশলাটার পুরোটাই নেবো। আমি মশলাটুকু খাবো আর অবিনাশবাবুকে গরমটুকু দিয়ে যাও। তেজপাতারও পাতা চাইনা—তেজ দাও অবিনাশবাবুকেই, ওর দরকার।' আমি হাসলাম। লোকটা পকেট থেকে একটা সবুজ রুমাল বার করে মুখ মুছলো। 'এটা কি?' পরীক্ষিৎ হাত ঢুকিয়ে এক টুকরো আদা তুললো। 'আচ্ছা, ভালো জিনিস পাওয়া গেছে।' পরীক্ষিৎ, অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠলো।

'পুরোটা নিস্‌নি, পুরোটা নিস্‌নি, ওর ক্ষতি হয়ে যাবে। শোনো,' আমি বললুম, 'এরও তুমি আদ্দেক বেচে দাও, তোমার লাভই হবে ভাই। আদার আটুকু দাও পরীক্ষিৎবাবুকে, তুমি দা—টা নিয়ে দাও। এরপর তুমি 'চাই দা, চাই দা' বলে ফেরি করবে। লোকে কিনতে এলে তুমি দায়ের দামে আদা বেচে দেবে! আর পরীক্ষিৎবাবু আ–নিয়ে যা করবার করবেন।'

'দূর শালা! যত সব বাজে ঠাট্টা এই নিরীহ লোকটাকে নিয়ে।' তাপস বললো, 'আসলে জিনিসটার খোঁজনে!'

পরীক্ষিৎ বললো, 'দাঁড়া, আমি বার করছি।' খুব মনোযোগ দিয়ে বাক্সের ভেতরের সাপ জিনিসগুলো দেখলো। তারপর একটা পাঁউরুটি কাটা ছুরি হাত দিয়ে তুললো। 'হ্যাঁ, এতেই অনেকটা

হবে। শোনো ভাই, সীরিয়াসলি, তোমার কাছে মেরামত করার জিনিস আছে? এই ছুরিটা মেরামত করতে হবে।' লোকটা কিছু একটা উত্তর দিল, বোঝা গেল না।

'এই ছুরিটা মেরামত করা দরকার বুঝতে পারছো না? চন্দ্রপুলি তো দেখালে—চন্দ্রবিন্দুআছে?'

লোকটা বিকট ঘড়ঘড় শব্দ করলো।

'আঃ, বুঝতে পারছো না? ছুরির ছ'য়ের মাথায় চন্দ্রবিন্দু বসাতে হবে—আর একটা অনর্থ ড় লাগবে, মানে ড–এ শূন্য–র। এইটুকু বসালাতে পারলেই অবিনাশবাবু যত ইচ্ছে দাম দেবে। জিনিসটা তা হলে কি হল? ছুঁড়ি। তোমার হাতে ছুঁড়ি–টুঁড়ি আছে?'

'আসল কথায় এসো তো ভাই,' তাপস বললো নিচু গলায়, 'তোমার সন্ধানে মেয়েছেলে—টেলে আছে?'

'আজ্ঞে?'

'দেখো না ভেবে। তোমাদের এখানে এসেছি, দাও দু'একটা জোগাড় করে। সন্ধ্যের দিকে নিয়ে আসবে—'

'পারবোনা,স্যার।'

'পারবে না একথা বলতে নেই! ছিঃ! চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই। চেষ্টা করো আগে, চেষ্টা করার আগেই কি করে বুঝলে যে পারবে না?'

লোকটা একটা অপ্রত্যাশিত কথা বললো এবার। প্রায় ফোঁপানো গলায়। 'বাবু, আমি লেখাপনা শিখিনি আপনাদের মতো, আমি গরীব মানুষ, আমি গরীব, ওফ্'—একটুক্ষণ আমরা তিনজনেই চুপ করে রইলাম তাপস লোকটার কাছে কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো, 'তুমি গরীব মানুষ, হায় হায়, আগে বলোনি কেন, আমরাও বিষম গরীব, হায় হায়।' তাপস লোকটার গলা জড়িয়ে ধরতে গেল, 'ওঃ বুক জ্বলে যায়, আমরা কত গরীব জানো না, আমাদের কিছু নেই, আমরা তোমার আধকানা করেও কিনতে পারবো না, চলে যাও, আমরা ভিখিরি, লেখাপড়া—জানা ভিখিরি ওঃ'—তাপস হঠাৎ এমন মড়াকান্না জুড়ে দিল যে গায়ত্রী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো রান্নঘর থেকে–আর লোকটাও গাড়ি ঘুড়িয়ে হাঁটতে লাগলো মন্থর পায়ে।

গায়ত্রী লোকটাকে বললো, 'ও মুকুন্দ, আধ সের পিঁয়াজ দিয়ে যাও।'

লোকটা কিছুক্ষণ মাটি দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর ধরা গলায় বললো, 'পুরোটাই নেবেন তো মা, আদ্দেক দিতে পারবো না আমি।'

তাপস সমেত আমাদের তিনজনের হাসির চিৎকার অনিমেষ গেটের কাছ থেকে শুনতে পেল।

দুপুরে কি কি করেছিলাম মনে নেই। খুব বৃষ্টি হয়েছিল মনে আচে। আর খাবার সময় গায়ত্রীর হাত থেকে তেঁতুলের টকের বাটিটা ধরতে গিয়ে আমি ভেবেছিলাম গায়ত্রী তখনও ছাড়েনি, গায়ত্রী ভেবেছিল আমি শক্ত করে ধরেছি—সুতরাং গায়ত্রী ছেড়ে দিল এবং আমি ধরিনে, বাটিটা পড়ে ছিট্‌কে ভেঙে গেল। আমি ব্যতীত সকলে হাসাহাসি করার সময় পরীক্ষিৎ টেবিলের তলা থেকে আমার পায়ে লাথিমেরেছিল।

বিকেলবেলা আমরা একটা সাপ মারলুম। দলবল মিলে বেরুতে যাচ্ছি, বাড়ির গেটে হাত দেবার সঙ্গে তাপস বললো, সাপ! সাপ! গায়ত্রী!' প্রত্যেকেই এক সেকেণ্ডে তিন পা পিছিয়ে দেখলুম, গায়ত্রীর খুব কাছে একটা সাপ—বেশ বড়, কালো বেল্টের মতো, এতগুলো লোক দেখে চট করে ফুলবাগানে ঢুকে পড়লো। 'সর্বনাশ, বাড়িতে সাপ পুষে রেখেছিস? লাঠি নিয়ে আয়,' তাপস বললো, 'যা যা'। পরীক্ষিৎ গম্ভীর মুখে জানালো, ওটা সাপ নয়, এই শীতে সাপ আসবে কোথা থেকে? ওটা আসলে শয়তান; গায়ত্রীকে কোনো একটা গোপন কথা বলতে এসেছিল।'

'যাঃ, ঠাট্টা নয়, আমার বুক কাঁপছে এখনো, উঃ'—গায়ত্রী সরে এসে অনিমেষ ও আমার মাঝখানে দাঁড়ালো। পরীক্ষিৎ কথাটা এমন সুন্দরভাবে বলেছে যে আমি ছবিটি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলুম। সাপটা গায়ত্রীর শায়ার ভেতর থেকে যেন বেরিয়ে এলো, এই রমণীর দুই উরুর মাঝখানে কোন গুপ্ত কথা বলে। যেন কোনো পৌরাণিক কাহিনীর সত্য এই মুহূর্তে এখানে ঘোষিত হয়ে গেল। শয়তান শুধু নারীর কাছেই সে সত্য ঘোষণা করে যেতে পারে। এক মুহূর্তের জন্য দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে ভেষে উঠলো, চাক্ষুষভাবে দৃশ্যটা সত্যই ভয়ংকর, আমি তাই অনিমেষকে বললাম, 'যান লাঠি নিয়ে আসুন, ওটাকে কি এখানে পুষে রাখবেন নাকি?'

'আমি আসছি,' তাপস দৌড়ে ভিতরে চলে গেল গুরকির পথ পেরিয়ে। ও এমন ভিতু স্বভাবের—যাবার সময় এমনভাবে গেল পা ফেলে, যেন ওর কাছে সমস্ত পৃথিবীটাই এখন সাপে ভর্তি।

'কি দরকার ওটাকে মারার,' অনিমেষ বললো, 'এর আগেও ওটাকে কয়েকবার দেখেছি, কোনো ক্ষতি করে না কিন্তু।'

'কি যা—তা বলছেন। সাপ রোজ ক্ষতি করেনা—একদিনই করে। অন্ধকারে গায়ে পা দিলে চৈতান্যদেবের বাণী শোনাবে না। এখন ওদের হাইবারনেশন পীরিয়ড শেষ হচ্ছে, খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছে নতুন জীবনে। এখন ওদের তেজও যেমন বিষও সেইরকম মারাত্মক'

পরীক্ষিৎ বললো, 'যাই বল, জিনিসটা দেখতে ভারী সুন্দর। কি রকম উদাসীন ভঙ্গীতে চলে গেল, অকারণেমারিসনি।'

'তা ছাড়া, ওটার তো বিষ নাও তাকতে পারে,' অনিমেষ বলে, 'অতবড় সাপ—বোধহয়দাঁড়াস, অর্থাৎ যাকে ঢ্যামনা বলে।'

'মোটেই ঢ্যামনা নয়, ঢ্যামনা হয় ছাই—ছাই হলুদ, এটা একদম কালো।'

'বিষ নিশ্চয়ই আছে,' পরীক্ষিৎ বললো, 'সম্পূর্ণ বিষহীন কোনো জিনিস কোনো মহিলার কাছে আসবেই বা কেন?'

'ধ্যাত, আপনি সব সময় অসভ্য কথা বলেন—'

অনিমেষ আর আমি হাসলুম। পরীক্ষিৎ আমার চোখে চোখ ফেলেছে।

তাপস দুটো দরজার খিল এনে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'কে মারবে মারো আমি ওর মধ্যে নেই। তবে মারা দরকার। এই হস, বেরিয়ে আয়।'—বলে একটা খবরের কাগজ আগুন জ্বালিয়ে ঝোপটায় ছুঁড়ে দিল।

'সাপটা ওখানেই আছে, কোথাও যায়নি, আমি লক্ষ্য রেখেছি,' গায়ত্রী বললো।

'কিন্তু, ফুলগাছগুলো নষ্ট হবে,' পরীক্ষিৎ নিচু তালায় জানালো।

অনিমেষ লাঠিটা তুলে এগুতে গিয়েও যেন এই কথা শুনেই পিছিয়ে এলো। ওদের অস্বাভাবিক কবিত্ব দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। একটু বিরক্ত বোধ হলো। ঝাঁঝালো গলায় বললুম, 'ওগুলো তো দোপাটির ঝোপ, বিনা যত্নেই হয়, আবার হবে। তা ছাড়া শোন, সাপ হচ্ছে মানুষের শত্রু। শত্রুকে কখনো আক্রমণের সুযোগ দিতে নেই, তার আগেই মারতে হয়।'

'ওঃ!' পরীক্ষিৎ হঠাৎ চুপ করে গেল—যেন আমি এক অমোঘ যুক্তি দিয়েছি যার উত্তর হয়না। তারপর বললো, 'যদি মারতেই হয় সর আমি মারছি।' পরীক্ষিৎ ঝোপটার অনেকটা কাছে এগিয়ে গেল খিল হাতে—তারপর খুব সহজেই কাজ হয়ে গেল। লাল-সাদা ফুলের ঝাঁকের ওপর আন্দাজে একটা বাড়ি মারতেই শ্রিংয়ের খেলনার সাপের মতো সাপটা তড়াক করে ফনা তুলে উঁচু হলো। আঁ-করে গায়ত্রী একটা সরু আওয়াজ তুলে পিছিয়ে গেল দৌড়ে। পরীক্ষিৎ সাপটার দিকে চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলো, একটুও ভয় নেই, যেন ও কোনো এক গুণেনের মতো মন্ত্র দিয়ে বস করতে চায়

সাপটাকে। আমি ওর ডান পাশে এগিয়ে গেলাম আমাদের দু'জনের হাতেই বিলের ডাণ্ডা, একটু দূরে সাপটা অল্প অল্প দুলছে। পরীক্ষিৎ আমার দিকে তাকালো, 'ওকে একেবারে মারতে হবে বুঝলি, পালাবার চেষ্টা করলে মুস্কিল হবে।' তারপর যেমন ভাবে গালে থাপ্পড় মারে—সেই রকম পরীক্ষিৎ ওর লাঠিটা দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে সাপটার ফনায় মাপলো, আমিও সেইসময় লাঠি চালিয়েছিলাম, ঠক্ করে শব্দ হলো দুজনেরটা লেগে—সাপটা মাটিতে পড়তেই আমরা দু'জনে ধুপধাপ করে পেটালুম। অল্প সময়েই সাপটা নিস্তেজ হয়ে গেল।

সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকেই একটা সিগারেট ধরিয়ে পরীক্ষিৎ বললা,, 'এখন এটাকে কি করবি? সাপকে ফেলে রাখলে আবার বেঁচে যায়। বৃষ্টি পড়লেই বেঁচে উঠবে। পুড়িয়ে ফেলা উচিত। কি করবি? সাপটা কিন্তু জাতের—খাঁটি চন্দ্রবোড়া।'

'কিন্তু কে এখন ওটাকে পোড়াবো বসে বসে?'

'এক কাজ করা যাক্,' আমি বললুম, 'ওটাকে নিয়ে চল বড় রাস্তায় ফেলে দিই। কয়েকখানা বড় বড় ট্রাক ওটার ওপর দিয়ে চলে গেলেই হবে।'

'সেটা মন্দ না।' পরীক্ষিৎ ওর লাঠির মাথায় মরা থ্যাৎলানো সাপটাকে তুললো। তারপর সৈন্যবাহিনীর শোক-শোভাযাত্রায় আগে নিচু পতাকা হাতে যে লোকটা হাঁটে তার মতো ভঙ্গীতে পরীক্ষিৎ এগিয়ে চললো। যেন ওর সত্যিই খুব দুঃখ হয়েছে। পরীক্ষিৎকে আমি জ্যান্ত মুর্গির ছাল ছাড়াতে দেখেছি। জীবজন্তুর ওপর ওর দয়ামায়া বোধ যে খুব প্রবল তার তো কখনো পরিচয় পাইনি। কিন্তু বোধহয়, সাপ, টিকটিকি এইজাতীয় ঠাণ্ডা রক্তের জীবের প্রতি ওর সত্যিকারের কোনো টান আছে।

তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। লাল আকাশটার কোনো একদিকে সূর্য। এই সময় সূর্যের রশ্মিগুলো আলাদা ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এখন একটু চেষ্টা করলেই কল্পনা করা যায় যে সন্ধ্যোবেলার সূর্য্য থেকে অসংখ্য লাল রঙের সাপ পৃথিবীতে ঝরে পড়েছে। পরীক্ষিৎ লাঠিটা বাগানের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেবার আগে একবার সূর্যের দিকে তাকালো।

অনেকদিন আগে আমরা এখানে একবার বেড়াতে এসেছিলাম। বছর সাতেক আগে। তখন এ জায়গাটা অন্যরকম ছিল। একটা ঝিরিঝিরে ঝর্ণা। পাশে ছোট মন্দির। এখন দেখছি রীতিমত একটা নদী। বেশ গভীর জল মনে হয়, প্রবল স্রোত। ওপারে ব্রীজ বানিয়েছে—এসব ব্রীজ-টীজ কিছুই আগে ছিল না। বেশ ঝকমকে চওড়া কংক্রিটের—নদীর চেয়ে ব্রীজটাও কিছু কম সুন্দর দেখতে নয়! প্রশস্ত চাঁদের আলোয় ফট ফট করছে সাদা রঙ। গায়ত্রী একটা হাল্কা নীল রঙের শাড়ী পরে এসেছে— সুতরাং প্রায়শই ও মিশে যাচ্ছে জ্যোৎস্নার সঙ্গে। আশেপাশে লোকজন নেই। মন্দিরের কাছে কয়েকটা দোকান। অনিমেষ কি যেন আলোচনা করছে তাপসের সঙ্গে। আমি রেলিঙের ওপর ঝুঁকে কি যেন খুঁজছিলাম নীচে। কি খুঁজছিলাম মনে পড়ছিল না, গভীর মনোযোগ দিয়ে চোখ ঘোরাচ্ছি—অথচ কেন, ঠিক দেখতে চাই যেন মনে আসছে না। কি খুঁজছি—অনেকক্ষণ পরমনে পড়লো, একটি বাইশ-তেইশ বছরের ছেলেকে। স্পষ্ট মনে আছে, আগের বার যখন এসেছিলাম, আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম ঝর্ণাটার পাশে। আমার বারবার মনে হলো, ঝুঁকে তাকালে এখনও সেই ছেলেটাকে দেখতে পাবো। ঝর্ণার (এখন নদী) পাশে একটি মুগ্ধ যবা বসে আছে। না, কিছু দেখা যায় না অন্ধকারে। তখন কি সুন্দর চোখ ছিল আমার—ঝর্ণার চাঁদের আলো দেখলে কি ভালোই লাগতো। আমি হু-হু করে ভেসে-আসা হাওয়ায় বার বার নিঃশ্বাস নিয়েছিলাম। আজ কিছুই ভাল লাগছে না, অথচ আজও এ জায়গাটা কম সুন্দর নয়। বন্ধুরা, গায়ত্রী, চমৎকার ঠাণ্ডা জ্যোৎস্না, এমন কি যথেষ্ট সিগারেট আছে পকেটে—কিন্তু আমার খালি মনে হচ্ছে, এখান থেকে চলে যাই। বন্ধুদের কারুকে না বলে পালাই। যেন ভুল জায়গায় এসেছি। এই যুগপৎ জ্যোৎস্না ও হাওয়ার রাত আজ আমার জন্য নয়। বুকের মধ্যে ব্যথা ও ভয় হচ্ছে। বিষম পালিয়ে যাবার

...খমের ওপর সেই ছেলেটাকে যদি বসে থাকতে দেখি, তবে হয়তো এবারের মতো বেঁচে যাবো।

তাপস বললো, 'আই নীড এ উওম্যান, না হলে আমি ঠিক জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়াতে পারিনা।'

'এবার একটা চটপট বিয়ে করে ফ্যাল্,' অনিমেষ বললো।

'ভাগ শালা। চল অবিনাশ, ঐ চায়ের দোকানটায় যাই, যদি ফোক্ টোক্ জোগাড় করা যায়।'

'নারে, আমার ইচ্ছে নেই।'

'বিয়ে করাটাকে অত ঠাট্টা করিস না,' অনিমেষ বললো।

' কেন কি এমন পরমার্থ পেয়েছিস?'

'অনেক সুবিধে আছে। আমি তো ভাই বেশ সুখে আছি।'

'কে চায় হাত–পায়ে সুখ চায়। তা ছাড়া সুখটাই বা কি? কানের দুল, শাড়ী, মেনস্ট্রুরেশান, ডাক্তার, নেমন্তন্ন–সবচেয়ে মুস্কিল, কখনো একা থাকা যায় না। কিন্তু এসব বাদ দিয়েও তো মেয়েছেলে পাওয়া যায় বিয়ে না করে!'

'যাঃ, শুধু শুধু থিয়োরিটিক্যাল কথা বলিস্ না। যে সম্বন্ধে তোর অভিজ্ঞতা নেই সে সম্বন্ধে কথা বলা উচিত না।'

তাপস চকিতে অনিমেষের দিকে সোজাসুজি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমার অভিজ্ঞতার কথা আমি মুখে বলিনা কখনো, লিখে জানাই। তা—ছাড়া বিয়ে সম্বন্ধে তোরই বা কি নতুন অবিজ্ঞতা হয়েছে? তুই কি পৃথিবীতে নতুন বিয়ে করেছিস্। পৃথিবীতে মানুষ বিয়ে করছে অন্ততঃ পাঁচ হাজার বছর ধরে—তাদের সকলের অভিজ্ঞতার কথা আমরা জানি।'

'তাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা খারাপ?'

'কি গাড়োলামি করছিস্? বিয়ে করা উচিত কি উচিৎ না তাই নিয়ে সিম্পোসিয়াম চালাবি নাকি? যার ইচ্ছে করবে। কিন্তু একটা মেয়েছেলে চাই—এ কথায় বিয়ের প্রসঙ্গ আসে কি করে?'

'আমার বিয়ের কথাই মনে হলো। কারণ বিয়ে করে আমি স্ত্রীলোক এবং শান্তি দুটোই পেয়েছি।'

পরীক্ষিৎগান গাইছল। হঠাৎ গান থামিয়ে মন্তব্য ছুঁড়ে দিল, 'কিন্তু অনিমেষের মতো সুন্দরী বউ থাকলে ভাই শান্তি বেশিদিন রাখা যায় না।'

অনিমেষ কথাটা শুনলো কিন্তু কান দিল না। বললো, 'তাপস, তুই আর এ রকম পাগলামি কতদিন করবি? তোর তো লেখার জন্য সময়ের দরকার।'

'আমিও সুযোগ পেলে একটা ছোটোখাটো বিয়ে করে ফেলবো। আমি নিরীহ ভালো মানুষ হয়েই বাঁচতে চাই।' আমি বললুম।

তাপস একাই চলে গেল চায়ের দোকানের দিকে।

পরীক্ষিৎ ব্রীজের রেলিঙের ওপর উঠে বসেছে। প্রথমে গুনগুন করে গান করছিল, তারপর বেশ গলা ছেড়ে দিল। পর পর তিনখানা ন্যাকা রবীন্দ্র সঙ্গীত না থেমে শেষ করার পর বললো, 'বিনা নেশায় চেঁচালে বড় গলা ব্যথা করে। গতবার আমরা সবাই মিলে কি গান গাইতাম রে?'

'কি জানি আমার মনে নেই।' আমি একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে একটা টান দিতে না দিতেই সেটা হাত ফসকে জলে পড়ে গেল।

'তাপস জানে। তাপস ওটা খুব গাইতো। গেল কোথায় ছোকরা? একটু এদিক ওদিক তাকিয়েই পরীক্ষিৎ বললো, 'কাণ্ডটা দ্যাখ! সাধে কি আমি রাগি।'

গায়ত্রী গিয়েছিল মন্দিরে। ফিরে এসে ব্রীজের ওপাশে অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়েছে। অনিমেষ চলে গেছে ওর কাছে, দুজনের নিবিষ্ট হয়ে কি যেন বলছে।

'দেখেছিস, একটু চান্স পেয়েই জোড়া মেরে গেছে। এইজন্যই (অশ্লীল) আমি (ছাপার অযোগ্য, ছাপার অযোগ্য) একটু অন্ধকার পেলেই (অশ্লীল অশ্লীল, ছাপার অযোগ্য)।'

'যাক্ গে, ছেড়ে দে। নতুন বিয়ে করেছে, একেবারে একা থাকতে পারছে না আমাদের উপদ্রবে।'

'শুনিছিস্, কাল অনিমেষ কি বললো। একদম লিখতে পারছে না, ভাষা নেই ফাসা নেই, যত (অশ্লীল অশ্লীল, ছাপার অযোগ্য)। বিয়ে করে মজে গেছে। ঐ বললো না, শান্তি পেয়েছি। আমি ওর শান্তির বারোটা বাজাতে চাই। আজই—'

'তার নতুন বইটা কবে বেরুচ্ছে, নাটকটা শেষ করলি না?'

'কার জন্যে লিখবো? তুই কিছু লিখিস্ না আজকাল। তাপসটা লেখে ব্লাডি প্রোজ। এক অনিমেষ—তাও বিয়ে করে শান্তি পেয়েছে। দাঁড়া, ওর শান্তি ভেঙে দিচ্ছি। ওকে বলে দিই, যাকে নিয়ে অত সোহাগ করছো, সেই তোমার বউয়ের (ছাপার অযোগ্য, ছাপার অযোগ্য)।'

'যাঃ, কি যা—তা বকছিস্। তোর একটু ডিসেন্সি জ্ঞান নেই।'

'ওসব চালাকি ছাড়ো অবিনাশ মিত্তির। আমি সোজা কথা বলবো।' পরীক্ষিৎ হাতের সিগারেটে জোর টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে পায়ে ভর দিয়ে পাঁচিলের উপর দোল খেলো।

'পড়ে যাবি, পরীক্ষিৎ, ঠিক হয়ে বোস্।' আমি দেখতে পেলুম সেই অজগরের মতো নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওর মাথার চারপাশে। লম্বা চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে। হঠাৎ মনে হলো ওর মাথা দিয়ে দুটো শিঙ বেরুচ্ছে। 'গায়ত্রী মেয়েটা খুব ভালো,' আমি বললুম, 'ওরা দুজনেই দুজনকে খুব ভালবাসে।'

আমার মুখের দিকে গম্ভীরভাবে তাকালো পরীক্ষিৎ। বললো, 'আর তুই?'

'আমি হোপ্‌লেশ, আমার দ্বারা কিছু হবে না।'

'আমার নাটকটার জন্য কাঁচা মাল দরকার। আমার অনিমেষকে চাই।'

'এ খুব ছেঁদো কথা হলো। তোর কি মডেল লাগে লেখার জন্য?'

'ওকে নিয়ে লিখবো কে বলেছে। ওর গণ্ডগোল নিয়ে লিখবো। গল্প তো বানাতে পারিনা রে, তো হলে তা এতদিনে উপন্যাস ফুসন্যাস লিখে কেলেংকারী করতুম। অনিমেষকে ঈর্ষা করে লিখতে ইচ্ছে হয়।'

'শেকস্‌পীয়ার কিংবা ইয়োনেস্কোকে ঈর্ষা কর না!'

'যাঃ, বাজে বকিস না। তুই আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করছিস। কিন্তু এরই বা কি মানে হয়। বন্ধুরা রইলো একদিকে, আর বউ-এর সঙ্গে গুজুর গুজুর। শোন অবিনাশ, আমিই ওর সত্যিকারের বন্ধু। আমি ওর উপকারই করতে চাই। একটা মেয়ের কাছে ডুবে যেতে দিতে পারিনা।'

'পরীক্ষিৎ কাল ক'টার ট্রেনে ফিরবো রে আমরা?'

'জানিনা। অনিমেষকে ডাকি!'

'কলকাতায় ফিরে তোর নাটকটা স্টেজে করবো। হল ভাড়া নিয়ে।'

'তুই আমাকে ভোলাতে চাইছিস? না, আমি অনিমেষকে ডেকে বলতে চাই, আজই, এখনই, অনিমেষ'—

আমি হাসতে হাসতে বললুম, 'তুই অনিমেষকে কী বলবি? যত সব পাগলামি!'

পরীক্ষিৎ গাঢ় চোখে আমার দিকে তাকালো, একটাও কথা না বলে নিঃশব্দে হাসতে লাগলো। কী বিশ্রী ওর সেই হাসি। সেই হাসির মধ্যেও নীল ধোঁয়া। আমি অস্বস্তিকর ভাবে ওর হাসির সঙ্গে যোগ দিতে চাইলুম। আমার তখন হাসি পেল না।

হঠাৎ পরীক্ষিৎ বিষম জোরে অনিমেষের নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠলো। আমি থতমত খেয়ে বললুম, 'পরীক্ষিৎ, আগুনটা দে তো!' বলে, ওর মুখের সিগারেট থেকে আমার সিগারেট ধরিয়ে নেবার জন্য

এগিয়ে গিয়ে ওর ওপর ঝুঁকে পড়লাম। তারপর ডান হাত দিয়ে ওর পেটে একটা আলতো ধাক্কা দিতেই হাত দুটো ওপরে তুলে বাতাস ধরার চেষ্টা করে–পরীক্ষিৎ উল্‌টে পড়ে গেল। নীচের নদীর জলে ঝুপ করে একটা শব্দ হলো। আর শোনা গেল, পরীক্ষিতের আর্তনাদ নয়, জারুল গাছে একটা রাত পাখির কর্কশ ডাক? গায়ত্রী আর অনিমেষ ছুটে এলো চিৎকার করে।

পরমুহূর্তেই বিষম অনুশোচনায় আমার মন ভরে গেল। ছিঃ, কেন পরীক্ষিৎকে আমি জলে ফেলে দিলাম। খুবই বোকার মতন কাজ হলো এটা ।কোনো মানে হয় না। ও খুবই ভালো সাঁতার জানে,–নিশ্চয়ই বেঁচে যাবে। এর বদলে ওকে চলন্ত ট্রেন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেই একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো।

বিমলেন্দু

ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে দেখলুম, অত্যন্ত গম্ভীর এবং নিবিষ্ট চোখমুখে তাপস, অবিনাশ আর হেমকান্তি—সামনে তাশ ছড়ানো। তিনজনে বসে আছে অথচ চারজনের তা ভাগ করা। যেন ওরা চতুর্থ লোকের প্রতীক্ষায় ছিল, আমাকে দেখেই বলে উঠলো, 'আয়, তাশ তোল।'

'আমি তাশ খেলতে জানিনা।'

'শিখে নিবি, বসে পড়', অবিনাশ বললো।

'না, ওসব আমার ভালো লাগে না।'

'ও!' অবিনাশ চোখ না তুলেই বললো। ওদের খেলা থামলো না। অবিনাশ বললো, 'ফাইভ নো ট্রামপস্। চারজনের তাশ বিছয়েও যে তিনজনে ব্রীজ খেলা যায় আমি জানতুন না। এখন আমাকে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে হবে, অত্যন্ত বিরক্তিকর, আমি উঠে গিয়ে রেডিওর চাবি ঘোরালুম, যুদ্ধের বোমা বর্ষণের মতো আওয়াজ ও মাঝে দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া গানের লাইন। 'আঃ, বিরক্ত করিস না,' তাপস বললো, 'দে, একটা সিগারেট দে!' আমি উঠে পাশের ঘরে গেলাম। মায়া দাঁত দিয়ে কালো ফিতে চেপে ধরে চুল বাঁধছে আয়নার সামনে। ফর্শা গালে ফিতেটা। সায়া ও ব্লাউজ পরা, ভাঁজ–ভাঙ্গা শাড়িটা হাঁটুর উপর। আমাকে দেখে চমকে উঠলো না, লজ্জা পেয়ে শাড়িটা তাড়াতাড়ি তুলে বুকে জড়ালো না, ঠাণ্ডা চোখে আমার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

'দিদি কোথায় মায়া?'

'বাথরুমে।'

'তোমার কাছে একটা খালি খাম আছে? একটা চিটি পোস্ট করবো।'

'না নেই। আপনি পাশের ঘরে বসুন।' মায়া তখনও আমার চোখের দিকে চেয়ে ছিল, অত্যন্ত হিম সেই চেয়ে থাকা।

'বাড়িতে আর কেউ নেই বুঝি? পিসিমা?'

'না, আপনি পাশের ঘরে বসুন, দিদি যাচ্ছে।'

'মায়া, তুমি আমাকে একটা রুমাল দেবে বলেছিলে।'

মায়া ঘুরে দ্রুত চলে গেল ড্রেসিং টেবিলের সামনে, ড্রয়ার খুলে একটা ফর্সা ও সোনালি কাজ—করা রুমাল এনে বললো, 'এই নিন, 'পাশের ঘরে বসুন।'

আর কেউ আমাকে দেখেনি, তবু বুঝতে পারলুম, কি বোকা ও নির্লজ্জের মতো আমি রুমালটা চেয়েছিলাম। আর একটু দাঁড়াবার জন্য। কিন্তু মায়ার সঙ্গে আমি কিছুতেই কথা বলতে পারি না। ভয় পাই একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় মায়াকে ভালো করে দেখবো, মনে মনে ভাবলুম।

ও ঘরে কি কারণে ওরা চেঁচিয়ে উঠতেই মনে হলো, তাশ খেলা শেষ হয়েছে। ফিরে এলাম। অবিনাশ পয়সা গুনছে। হেমকান্তি ওর লম্বা মুখ তুলে আমাকে কিছু যেন বলতে চাইলো। পরক্ষণেই আবার মুখ নিচু করলো সতরঞ্চির দিকে। ওর স্বভাবই এই। মুখ দিয়ে কটা ওর কথা বের হয়, আঙ্গুলে গোনা যায়। কোন কথাটা কি ভাবে বলবে, ও হয়তো ভেবে পায় না। আমি বললুম, 'আজ কিসের মিটিঙ রে? হঠাৎ ফোন করে আসতে বললি কেন?'

'আজ মাংস খাবো। পয়সা নেই।' অবিনাশ বললো, 'তুই তো ইয়া লাস আছিস, তোর উরু থেকে সের খানেক মাংস দে' না—মশলা দিয়ে রাঁধি। মানুষের মাংস কেমন খেতে একটু চেয়ে দেখি।'

'যদি খেতেই হয়, তবে আমার কেন, কোনো সুন্দরী মেয়ের মাংস খা না।'

'দূর ব্লোকহেড! ওদের মাংস খেতে হয় চেটে চেটে কিংবা চুষে চুষে—চিবিয়ে গিলে ফেললে তো একেবারেই ফুরিয়ে গেল।'

মায়া আর ছায়াদি দু'বোন ঘরে এলো। ছায়াদি সদ্য স্নান করে এসেছে—ওর চুল, চোখের পাতা, চিবুক, ভুরু এখনো ভিজে। বললো 'চা খাবে? তোমরা যে আজ আসবে তা আগে জানাবে তো?'

'কেন, তা হলে কি চায়ের বদলে মদ খাওয়াতিস?' তাপস বললো।

'ধেৎ! তা নয়, মায়া যে দু'খানা সিনেমার টিকিট কেটে এনেছে!'

'তা মায়া যাক না অন্য কারুকে সঙ্গে নিয়ে, তুমি থাকো।'

'কে যাবে ওর সঙ্গে? তোমরা যাবে কেউ?'

'কেন, এত বয়েস হলো, কারুর সঙ্গে প্রেম—টেম করে না?'

'করে। আমার সঙ্গে।' অবিনাশ গম্ভীর গলায় জানালো।

'আমার ভীষণ মাথা ধরেছে, আপনারা কোন ওষুধ—? হঠাৎ হেমকান্তি বলে উঠলো, 'বড় যন্ত্রণা করে, রোজ সন্ধ্যে হলেই—'

'অ্যাসপ্রো আছে, এনে দেব?'

'না, ওতে কমে না। অন্য কোন, আপনারা,—ওষুধ।'

'আমি জানি,' হেলান অবস্থা থেকে সোজা হয়ে তাপস বললো, 'নেচার ট্রিটমেন্ট। কিন্তু একটু শক্ত, পারবেন?'

'না না, ও পারবে না,'—আমি জানালুম। তাপসের চোখে বদমাইসী।

'কেন পারবেনা? শুনুন, আপনি উঠে দাঁড়ান, ডানহাত দিয়ে বাঁ কান ও বাঁ হাত দিয়ে ডান করে ঈশ্বরকে প্রণাম করুন, তারপর মাথাটা জোর করে ঘুরিয়ে নিজের ঘাড়ে ফুঁ দিন—পারবেন তো—তারপর একটা বেগুনী রঙের পাখীর কথা ভেবে উল্টো মুখ করে সিঁড়ি গুনে গুনে নেমে যান, শেষ ধাপটায় একবার বসুন, আর ঘাড়ে ফুঁ দিন—এবার রাস্তার পানের দোকান থেকে দুটো পান কিনে নিজে একটা খেয়ে বাকিটা প্রথম যে মেয়ে ভিখারী দেখবেন, তাকে দান করুন। নির্ঘাৎ সেরে যাবে—সারতে বাধ্য।'

মায়া ফুলে ফুলে হাসছিল। হেমকান্তি নিচু দিকে মুখ রেখেই বললো, 'ওঃ, আচ্ছা?' এমণভাবে বললো, যেন অব্যর্থ বলে বিশ্বাস করেছে, কিন্তু আজ নয় কাল পরীক্ষা করে দেখবে।

'যাঃ, কেন ওকে বিরক্ত করিছিস তাপস? সত্যি, মাথা ধরলে ভারী কষ্ট হয়', ছায়াদি বললো, 'আপনি বরং মায়ার সঙ্গে সিনেমায় যান না। সেরে যেতে পারে।

হেমকান্তি কোন উত্তর দিল না। ওর লম্বা মুখখানা এমনভাবে তুলে ধরলো, যেন ওকে মৃত্যুদণ্ড দিলেও ভালো হতো এর বদলে।

'না, না, একজন অসুস্থ লোককে কষ্ট দেওয়া কোন মানে হয় না', মায়া জানালো।

'আমি যাবো?' আমি নিজেই ব্যগ্র গলায় বললুম।

'হ্যাঁ, আপনি আর দিদি যান।' মায়া সেই ঠাণ্ডা চোখ আমার দিকে তুলেছে।

'তার চেয়ে এক কাজ করা যাক না।' অবিনাশ বললো, 'আমাদের সকলের নামগুলো নিয়ে লটারি হোক। যার নাম উঠবে সেই যাবে।'

এই সময় বেশ জুতোর শব্দ করে পরীক্ষিৎ ঢুকলো। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। অনিমেষদের ওখানে বেড়াতে গিয়ে ও নাকি নদীতে পড়ে গিয়েছিল ব্রীজ থেকে। পরীক্ষিতের চোখ অসম্ভব লাল। অবিনাশ টুকরো টুকরো কাগজে আমাদের নামগুলো লিখে গুলি পাকচ্ছিল–জিজ্ঞেস করলো, 'তোর নাম দেব? তুই যাবি পরীক্ষিৎ, মায়ার সঙ্গে সিনেমায়?'

'হোয়াই নট্? কি ছবি বাংলা?'

'হ্যাঁ, ছায়াদি বললো।

'খারাপ নয়। বই খারাপ হলেও মায়াও তো থাকবেই পাশে।'

অবিনাশ কাগজের গুলিগুলো হাতে ঝেঁকে ছড়িয়ে দিল সতরঞ্চিতে। বললো, 'তুমি তোলো মায়া'

'আমি না, দিদি তুলুক।'

'না, দিদি কেন? তুমিই বেছে নাও না, কে যাবে তোমার সঙ্গে, অনেকটা স্বয়ম্বর সভার স্বাদ পাওয়া যাবে। জানি তো আমাকেই বেছে নেবে– সেটা মুখ ফুটে বলতে অত লজ্জা কিসের?'

'কক্ষনো না', মায়া হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো। 'আমার ইচ্ছে পরীক্ষিৎদার সঙ্গে যাওয়ার। দেখবেন, ওর নামই উঠবে।' মায়া তুলতে যাচ্ছিল, অবিনাশ ওর হাতখানা চেপে ধরে বললো, 'কিন্তু শোনোমায়া,—যার নাম উঠবে তার সঙ্গেই কিন্তু যেতে হবে–এমনকি হেমকান্তির নাম উঠলেও।'

'আমি?' অসহায় চোখে হেমকান্তি।

মায়া একটা কাগজের গুলি তুলে একা একা দেখে বললো, 'পরীক্ষিৎদার নাম!' ও ঠোঁট কামড়ে হাসিচাপছে।

'দেখি দেখি', বলে কাড়াকাড়ি করে ছায়াদি আর আমি কাগজটা দেখলুম। 'না, অবিনাশের'—

'জানতুম!' অবিনাশ হেসে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মোজা পরতে শুরু করে দেয়।

মায়া হাসতে হাসতে বললো, 'ওঃ কি গরজ! কি হ্যাংলা আপনি বাবা!'

পরীক্ষিৎ একটা লম্বা চুরুট ধরিয়েছে। মুচকি মুচকি হেসে অবিনাশের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুই চললি, তোর সঙ্গে যে কয়েকটা কথা ছিল। ফিরছিস তো এখানেই।'

'ফিরতে পারি। কিন্তু যদি মায়াদেবী শো'র পর আমার সঙ্গে ময়দানে ঘুরতে কিংবা রেস্টুরেন্টে বসতে রাজী হন–তবে দেরী হবে।'

'খবরদার মায়া, কোথাও যাবি না,' মায়ার অভিভাবিকা বলে।

মায়া বললো, 'আপনি কিন্তু হলের মধ্যে বসে ইয়ার্কি করতে পারবেন না। নিজে সাহিত্যিক বলে যে, যা ইচ্ছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মন্তব্য করবেন– ওসব অহংকার চলবে না।'

'পাগল হয়েছো,' অবিনাশ বললো, 'তোমার কাছে আমি অহংকার করবো" সুন্দরীর পাশে আবার সাহিত্যিকের কোনো মূল্য আছে নাকি? বিমলেন্দু, দশটা টাকা দে তো?'

'আমারকাছেনেই।'

'নেই কি! খবরের কাগজে লিখে তো খুব টাকা পিটছিস্। কিছু ছাড়

'নারে, সঙ্গে কিছু নেই।'

'নেই? যাঃ শালা শ্মশানের পাশে গিয়ে ব্যবসা কর।'

'এই নে।' পরীক্ষিৎ চরুটটা দাঁতে চেপে পকেট থেকে চামড়ার ব্যাগ বার করলো। দুটো দশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বললো, 'আসবার সময় একটা পাঁইট আনিস!'

'তুই তো যথেষ্ট মেরে এসেছিস। আবার কেন?'

'বাড়ি নিয়ে যাবো। রাত্তিরে দরকার।'

অবিনাশ মায়ার বাহু ছুঁয়ে বললো, 'চলো যাই। ছায়া, এদের একটু সামলে টামলে রেখো। ওঃ, একটা কথা বলিনি,' অবিনাশ আবার ঘুরে দাঁড়ালো, তারপর না হাসার ভঙ্গী করে বললো, 'কাগজের গোল্লাগুলো খুলে দ্যাখ, সবগুলোতেই আমার নাম লেখা। মায়া যেটা তুলতো, সেটাই আমার গুড নাইট, বয়েজ!'

আমাদের সকলের হাসি থামলে তাপস বললো 'হারামজাদা!'

আমি খুব অপমানিত বোধ করছিলুম। মায়ার জন্য নয়। মায়ার সঙ্গে যাবার যে আন্তরিক ইচ্ছে হয়েছিল আমার, সেজন্য। মায়ার সঙ্গে কখনো খারাপ ব্যবহার করিনি, বরং ওকে সাহায্য করেছি অনেক পরীক্ষার সময়। আসলে মায়া আমাকে ঘৃণা করে ছায়াদির জন্য। ছায়াদি এমন ভাব দেখায় যেন আমাকে কত ভালোবাসে। বেচারীর এ পর্যন্ত বিয়ে তো হলোই না, প্রেমিকও নেই। এতটা বয়স পর্যন্ত কুমারী। ছায়াদি যদি অনুরোধ করে–তবে অনায়াসেই ওকে বিয়ে করতে পারি আমি। শ্বেতি মোটেই ছোঁয়াচে রোগ নয়–তাছাড়া মেয়েটা বড় শান্ত, অনেকটা মায়ের মতো, আমার বড় শান্তি লাগে ছায়াদির কাছে। শুধু ওর ওই ন্যাকা পদ্যগুলো লেখার অভ্যেস ছাড়া দরকার। মায়া আমাকে ভুল ভেবেছে–আসলে, যে অবিনাশের সঙ্গে ওর এত মাখামাখি ঐ অবিনাশটাই লম্পট, বিবেকহীন, বদমাস। ও–ই মজা লুটে পালাবে। মায়াকে নিয়ে ও শেষ পর্যন্ত কি করবে কি জানি। ভাবতেও ভয় হয়–মায়ার ওরকম ঝর্ণার জলে ধোওয়া শরীর। লেখার জন্য জীবনটা কলুষিত করতেই হবে?–তাপস–পরীক্ষিৎ–অবিনাশদের তাই ধারণা। ওদের কারুর অসুখ হলে কপালের ওপর কে ঠাণ্ডা হাত রাখবে জানি না।

আমাদের বাড়ির ছাদে কয়েকটা সুন্দর গোলাপফুলের চারা আছে টবে বসানো। একদিন চা খেতে খেতে গাজীপুরের লালগোলাপটা দেখাচ্ছিলুম ওদের–অনেক চেষ্টার পর একটা গাছে সেদিন প্রথম ফুল ফুটেছে। হয়তো আমার গলায় একটু বেশি উচ্ছ্বাস লেগেছিল, পরীক্ষাৎ হঠাৎ সেই টবটা আছড়ে ভেঙে দিল। আধুনিকতা সম্বন্ধে এরকম ছেলেমানুষী ধারণা ওদের! জানে না, একশো বছর আগে ফুলকে অবহেলা করে এখন আবার ফুলের স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে। অবিনাশটা আবার ফুল খায়। গোলাপ, রজনীগন্ধা,সূর্যমুখী—খোনে যে ফুল দেখে–লোকের বাড়ির ফুলদানিতে বা উপহারে, বাগানে ও অমনি ছুটে যায়, 'ফুল আমি বড্ড ভালোবাসি'—বলে পাপড়িগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে খায়। আমি একদিন সরলভাবে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'তুই ফুল খাস কেন রে?' 'দ্যাটস্ দা অন্‌লি ওয়ে অভ অ্যাপ্রিসিয়েসান!' কথাটা খুবই গর্বের সঙ্গে বলে—যেন ভবিষ্যৎকাল ওর এই বাণীটি মনে রাখবে।

পরীক্ষিৎ বিশাল কাঁধের হাড়দুটো উঁচু করে চেয়ারে উঠে বসলো। 'ছাঁয়া, চা খাওয়াচ্ছো না কেন? যাও, চা–খাবার টাবার নিয়ে এসো।' ছায়াদি বেরিয়ে যেতেই তাপসের দিকে ফিরে বললো, 'তোদের একটা কথা বলার আছে, ভুলে যাবার আগেই বলি। দিন কয়েক ওপাড়ার দিকে যাস্‌নি কিন্তু!'

'কেন?'

'পরশু একটা খুন হয়ে গেছে ওপাড়ায়। পুলিশে ছেয়ে গেছে। দিন কয়েক—'

'তুই ওদিকে গিয়েছিলে কেন? তোর হঠাৎ একা—'

'অনিনাশকে খুঁজতে খুঁজতে তারপর কি রুক্ষু ঝঞ্ঝাট। এক মক্কেল পুলিশ আমাকে ধরে ফেলে আর কি! আমি দৌড়ে গিয়ে লক্ষ্মীর ঘরে ঢুকে দরজার বন্ধ করে দিলাম। সে বুড়িটা তো আমাকে দেখেই আঁৎকে উঠেছে। আমি বললুম, 'চেঁচিও না মা লক্ষ্মী, চোর–ডাকাত, নই, পুলিশের হামলা কমলেই বেরিয়ে যাবো। ও সেই ক্যানকেনে গলায় বললো, 'আজ এখানে এসেছো কেন মরতে?'

তাপস জিজ্ঞেস করলো, 'কোন্ বাড়িতে খুন হয়েছে?'

'প্রসন্নর বাড়িতে। লক্ষ্মীর কাছ থেকে সব শুনলাম। প্রসন্নর বাড়ির তিন তলায় মল্লিকার ঘরের ঠিক পাশের ঘরটা অন্ধকার থাকতো তোর মনে আছে? ওঘরের হাসিনা বলে একটা মেয়ের কাছে আসতো গোলক গুণ্ডা। সে নাকি খুব মাস্তান, ওপাড়ার সবাই তাকে চেনে। প্রসন্ন বাড়িওয়ালা একদিন বললো,

BANGLA INTERNET

"তুম আর এসোনা বাবা, তোমার ভয়ে আমার বাড়ীতে লোক আসেনা।" "চোপ শুয়ার।" বলে গোলক তাকে ধমকে দিয়েছে। তখন প্রসন্ন হাসিনাকে বললো, "তুই ওকে ঢুকতে দিবি না ঘরে।" হাসিনা বললো, "ও–মরদকে আমার সাধ্য কি না বলি। জোর করে ঢুকবে। তা ছাড়া টাকা—পয়সা ঠিক দিচ্ছে– এবাড়িতে ও আসছে–যাচ্ছে ভদ্দরলোকের মতো। রুপিয়াও জায়দা দিচ্ছে। কোনোদিন তো এখানে হল্লা করেনি।" "করেনি, করতে কতক্ষণ?" —প্রসন্ন হেঁকেছে, তারপর দিয়েছে হাসিনার ঘরের আলোর লাইন কেটে। গোলক তাতেও কোনো আপত্তি করেনি। রোজ আসবার সময় মোমবাতি কিনে আনতো। কাল মল্লিকার ঘরে সন্ধ্যেবেলা তিনটে বাবু এসেছিল। তারা আর একজন চেয়েছে। হাসিনা, তখন বাথরুম থেকে খালি গায় বেরুচ্ছিলো, তাকে দেখেই বাবুদের পছন্দ। কিন্তু হাসিনা রাজী নয়, ওটা গোলকের আসবার দিন। তখন বাড়িওয়ালা জোর করে দুটো লোককে ঢুকিয়ে দিল ওর ঘরে। খানিকক্ষণ বাদে গোলক হাজির হতেই লেগে গেল।

পরীক্ষিৎ চুরুট ধরাবার জন্য দেশলাই জ্বালাতেই আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'গোলক ধরা পড়লো?'

'মাথা খারাপ! দুটো লোক আর একটা মেয়েকে ছুরি মেরে সে হাওয়া। আমাকে লক্ষ্মী বললো, "গোলকের কিন্তু দোষ নেই বাপু, যাই বলো। তার যা ব্যাভার ছিল বাবুদের মাথায় হাগে। কেন তাকে ঘাটানো। সে তো নিজেকে বাঁচাবার জন্যই দুটোকে ছুটির চালিয়েছে।" – দেখলুম, গোলকের ওপর ওদের খুব ভক্তি। ওদের হীরো। আমি প্রসন্নর বাড়ি খুন শুনেই ভয় পেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম কাছাকাছি। তাতেই তো পুলিশের হাতে পড়ছিলুম প্রায়! লোক দুটোর চেহারার ডেসক্রিপসন শুনেই বুঝতে পারলুম অবিনাশ নয়,–তা ছাড়া অবিনাশ খুন হবার ছেলেই নয়।'

'আর মেয়েটা কে?'

'মল্লিকা!' পরীক্ষিৎ অন্যমনস্ক গলায় বললো।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইলুম। মল্লিকার নাম শুনে ওরা সবাই বিষন্ন হয়ে গেছে মনে হয়। আমিও মল্লিকাকে চিনতুম। একদিন ওদের সঙ্গে গিয়েছিলাম। ওরা জোর করে টেনে নিয়েগিয়েছিল আমায়।

স্যাঁতসেঁতে সিঁড়ি দিয়ে তিন তলায় উঠে আলো ঝলমল পরপর ঘর। মল্লিকা মেয়েটার ঘর ছিল চমৎকার সাজানো গোছা না; রেডিওতে ইংরিজি সুর বাজছিল। মা–কালি আর সিগারেট কোম্পানীর ক্যালেণ্ডারে ন্যাংটো মেয়ের ছবি পাশাপাশি দেয়ালে এবং অশ্বারূঢ় শিবাজী। এছাড়া কয়েকটি নকল টিকটিকি, আরশোলা, কাঁকড়াবিছে এখানে সেখানে ঝুলছে। বিরাট ভাসে একঝাড় লাল গোলাপ, অমন সাটিনের মত ঝলমলে লালগোলাপ আগে কখনো দেখিনি। মেয়েটা একেবারে পাগলাটে ধরনের ফর্সা, টান করে চুল বাঁধা, অল্প নেশার ঘোরে দুলছিলো, বলেছিল, 'তোমরা আবার কেন এসেছো? মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে ইংরেজীতে প্রাইভেট কথা বলবে, একদম দেখতে পারে না। ঐ লোকটা আবার বই লেখে'–তাপসের দিকে আঙুল দেখিয়ে, 'ওসব লেখক–টেখক আমার সয়না, মাইর।' অবিনাশ ততক্ষণে ওর বিছানায় টান–টান হয়ে শুয়ে পড়ে হুকুম করেছে, রেডিওটা বন্ধ করে দে মল্লিকা, পাখাটা খোল্‌না!। তারপর বলেছে, 'এই নে সিগারেট খাবি, ভালো সিগারেট আছে আজ।' তাপসের সঙ্গে কি নিয়ে যেন কথা কাটাকাটি হলো মেয়েটার। তাপস বললো, 'নাও টাকা নাও, একটা বোতল আনাও। দু'টোক গিললেই মেজাজ শরিফ হয়ে যাবে।'

'না। আজ ভাগো। আমার শরীর ভালো নয়।'

'তাতে কি হয়েছে, না হয় একটু গল্প–গুজবই করবো আজ।'

'না হবে না। বেরোও বলছি!'—মেয়েটা খুবই রেগে গেছে কি জানি।

'আচ্ছা বাবা তোমার টাকা অ্যাডভান্স দিচ্ছি।'

'টাকা দেখাচ্ছো মল্লিকা মিত্তিরকে?—কত টাকা—দেখি।'

'তাপস কুড়িটা টাকা এগিয়ে দিলো। হাসতে হাসতে মেয়েটা গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে ঘুরে টলে গিয়ে দেয়াল ধরে সামলাতে সামলাতে কাশতে লাগলো।

'আচ্ছা আর পাঁচ টাকা বেশি নাও।'

'পাঁচ টাকা, আবার পাঁচ টাকা!' সরু গলায় বিশ্রীভাবে হেসে উঠেলো মল্লিকা। তাপস চটে উঠল এবার। —'তোমার ঐ রূপের জন্য আবার কত চাও?'

'কি!' মল্লিকা বাঘিনীর মতো ফুঁসে তাকালো তাপসের দিকে। ঘন নিঃশ্বাসে ওর বুক ফুলে ফুলে উঠছে। আস্তে আস্তে বললো, 'রূপের দাম? রূপ কি কিস্যৎ পাঁচ ঘা জুতি! যাবার সময় পাঁচ ঘা জুতো মেরে যেও'বলে দশ টাকার নোট দু'খানা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেললো। আমি চুপ করে এই নাটক দেখছিলুম। অবিনাশ উঠে বললো, 'কি ঝঞ্ঝাট করছো মাইরি, দাও, এক গ্লাস জল দাও।'

'জল!' মল্লিকা ছুটে গিয়ে খাটের তলা থেকে কাচের কুঁজোটা টেনে বের করলো, তারপর হঠাৎ দুম্ করে কুঁজোটা ফেলে দিলো মাটিতে। অবিনাশ আর কোনো কথাবার্তা না বলে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'চল যাই, মাসির আজ মান হয়েছে!' —আমরা বেরিয়ে আসার সময় মল্লিকা বললো, ' দেখো, যেন কারুর পা কাটে না কাচে। আমার ঘরে রক্ত—ফক্ত চলবে না।—'

আমি বললুম, 'খবরটা শুনলে অবিনাশ খুবই দুঃখ পাবে। অবিনাশের ওপর মেয়েটার সত্যিই টান ছিল।'

'না পাবে না।' তাপস বললো।

'সত্যিই পাবে না।' পরীক্ষিৎ বলে, 'ঐ হারামজাদার বুকের মধ্যে দয়ামায়া কিছুই নেই। ওর আত্মই নেই বোধহয়।'

'অবিনাশও তোর সম্বন্ধে এই কথা বলে।' আমি বললুম।

'যা—যা! আমার বুকে ভালোবাসা আছে, তাই আমি কবিতা লিখি। অবিনাশ যা লিখেছে ওগুলো আবার লেখা নাকি? ওর দ্বারা কিছু হবে না।'

'তোদের ভালোবাসা কি রকম জানিস্। একটা পিঁপড়ে মরলে তোদের প্রাণ কাঁদে, কিন্তু বাড়িতে তোর মা খেতে পেলো কিনা সে সম্বন্ধে গ্রাহ্য নেই!'

তাপস আমাকে বললো, 'শালা, তোর সব কথার মধ্যে বক্তৃতার ঢঙ এসে যায় কেন রে?'

আমি চুপ করে গেলুম। পরীক্ষিৎ উদাসভাবে বললো, 'ছেলেবেলায় আমার মা মারা গেছে। মায়ের মুখটাও আমার ভালো করে মনে পড়ে না।'

ছায়াদি ট্রেতে করে গরম নিমকি ভাজা আর চা নিয়ে এলো। 'এতক্ষণ লাগে তোমার চা বানাতে?' পরীক্ষিৎ ধমকে উঠলো। তাপস বললো, 'তোর কবিতাগুলো কখন শোনাবি?'

'চা খাওয়ার পর না হয় —'

'না, চা খেতে খেতেই শোনা যাক্।'

ছায়াদি নির্লজ্জের মতো বাঁধানো খাতাখানা এনে সতরঞ্চির একপাশে বসলো।

'খারাপ লাগলে স্পষ্ট করে বলবে কিন্তু, হেমকান্তিবাবু, আপনার কি খুবই শরীর খারাপ লাগছে।'

'না—না।' হেমকান্তি মুখ গুঁজে বসেছিলো। এবার মাথা তুললো।

ছায়াদি পাতার পর পাতা পড়ে যেতে লাগলো। আমি একদম মনোযোগ দিলাম না সে দিকে। সব ছন্দ —মল দেওয়া ট্র্যাস। পরীক্ষিৎ, তাপসও নিশ্চিত শুনছে না। অন্য কিছু ভাবছে। ছায়াদির কি যে এই দুর্বলতা। রাশি রাশি লিখে চলেছে এইসব —ছাপাও হয় নানা জায়গায়—তবু তরুণ সাহিত্যিকদের শোনাবার কি লোভ! মাঝে মাঝে ওদের পিসিমা বাড়ি থাকে না —বা, মনে হয়, ছায়াদিই ওঁকে

কোথাও পাঠিয়ে দেয় —তখন এ বাড়িতে দলেবলে আড্ডা। পিসিমা ভারী ঠাণ্ডা মানুষটি, কাঁচা বেলের ভেতরের মত গায়ে রঙ, সব সময়েই হাসিমুখ —একদিন শেখর এসে বমি করেছিল, পিসিমা নিজের হাতে পরিষ্কার করেছিলেন। আমাদের বাড়িতে মা -পিসিমারা এসব করার কথা কখনো ভাবতে পারেন? তা নয়, পিসিমা এদের অভিভাবিকা তো নয়, গলগ্রহ, বুদ্ধিমতী মহিলার মতো তাই মানিয়ে নিচ্ছেন। আমাদের পক্ষে অবশ্য ভালোই, চমৎকার আড্ডার জায়গা—তাছাড়া দুটি মেয়ে উপস্থিত থাকলে জম-জমাট হয়। একমাত্র মুস্কিল, মাঝে মাঝে ছায়াদির লেখা নিয়ে আলোচনা করতে হয়। তবে মেয়েদের স্তুতি করাটা ঠিক মিথ্যে নয়, চর্চা রাখা ভালো। দুপুরে তাপস যখন ফোন করলো তখনই বুঝতে পারলুম, কপালে আজ কিছু বাজে পদ্য শোনার দুঃখ আছে। 'মেয়ের লেখা কবিতা —এ যেন গোল বোতলে চৌকো কর্ক মাইরি,' অবিনাশ বলে। অনেকটা ঠিকই বলে। ও ধড়িবাজ ছেলে—কি চমৎকার কেটে পড়লো মায়াকে নিয়ে। মায়াকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি। কিশোরী অবস্থা থেকে আস্তে আস্তে ওকে বড় হয়ে উঠতে দেখলাম। ওর ঐ সুকুমার, স্বর্গীয় শরীর অবিনাশ কবে নষ্ট করে দেবে কে জানে!

আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম —দেখলাম ছায়াদিও বেরিয়ে এসেছে। বললো, 'একটা কথা আছে তোমারসঙ্গে।'

'বলো।'

'এখানে দাঁড়িয়ে বলবো না, চলো ওপরের ঘরে যাই।'

ওপরের ঘরের দরজা ঠেলে খোলার আগেই বললো, 'না থাক্, চলো ছাদে যাই। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে।' অনেকগুলো টবে সাদা ফুলগুলো ফুটে উঠেছে। তিন-চার রকমের গন্ধ আমার নাকে লাগছে। ছোট্ট একটা ঘর আছে ছাদে। চারদিকে চমৎকার নির্জন। ছায়াদিকে কি রকম রহস্যময় দেখাচ্ছে। আমাকে কি বলতে চায়! আমাকে দিয়ে কোনো কাজ করাবার মতলব নাকি? আমি এতক্ষণে ওকে নিশ্চয়ই একটা চুমু খেয়ে খুশি করতুম —কিন্তু মায়ার ব্যবহারে মনটা কি রকম বিষিয়ে আছে। আমাকে ওর ভালো লাগতে না পারে, কিন্তু আমাকে দেখে ওর ব্রেসিয়ার-পরা বুকে শাড়িটা অন্ততঃ জড়িয়ে নিতে পারতো।

'চলো, এই কাঠের সিঁড়িটা দিয়ে চিলে ছাদে উঠবে? হু-হু করে হাওয়া ধাক্কা মারবে।'

'কি ব্যাপার, মনে হচ্ছে তোমার কথাটা বলার জন্য যেন পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জায়গা দরকার?'

'হ্যাঁ, সেকথা স্বর্গে দাঁড়িয়ে বলা উচিত।'

'আশা করি তুমি এখন বলবে না, -তুমি আমাকে ভালোবাসো?'

ছায়াদি থতমত খেয়ে আমার চোখে চোখ রাখলো। তারপর খাদে গলার স্বর নামিয়ে বললো, 'তুমিও বুঝি প্রাণপণে হৃদয়হীন আধুনিক হবার চেষ্টা করছো বিমলেন্দু?'

'না, তা নয়, তুমি বলার আগে আমি বলতে চাই। পৃথিবীর দিন এসে গেলও —একটি মেয়েকে আমি ভালোবাসি, এ কথা বলায় কোনো আধুনিকতা নেই। ছায়াদি, তুমি আমার কাছে কি চাও?'

'আমি তোমার কাছে অমৃত চাই।'

'আমার কাছে অমৃত নেই। সামান্য ভালোবাসা আছে।'

'না, ইয়ার্কি নয় বিমলেন্দু, আমি সত্যি তোমাকে কিছু জানাতে চাই।'

'আমি ইয়ার্কি করছি না, আমি প্রাণ থেকে বলছি।'

'ওকথা থাক। আমি অনেককে জানি, কিন্তু তোমাকেই আমার সবচেয়ে আপন লোক মনে হয়। কারুকে না বলে আমি আর পারছি না। বিমলেন্দু আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না।'

'সে তো আমরা কেউ-ই আর বেশিদিন বাঁচবো না। মানুষ জাতটাই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'না, সে কথা নয়, অসুখ। আমার লিউকোমিয়া হয়েছে।'

'লিউকোর্ডামা? ওটা আবার একটা অসুখ নাকি?'

'লিউকোর্ডামা নয়, লিউকোমিয়া। এ অসুখ হলে মানুষ বাঁচেনা। রক্তের শ্বেত কণিকাগুলো নষ্ট হয়ে যায়। যাকে বলে ব্লাড ক্যানসার। এর কোনো চিকিৎসা নেই। চলো, তোমাকে ডাক্তারের রির্পোট দেখাচ্ছি। ডাক্তার বলেছে, আমি আর বড় জোর বছর খানেক।'

'ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে কেন হঠাৎ?'

'হঠাৎ নয়, আজ ছ'মাস ধরে যাচ্ছি। তুমি যেদিন আমার শ্বেতির দাগধরা ঠোঁটে আদর করলে সেদিনই মনে হলো শ্বেতি দাগটা না সারিয়ে দিলে আমার চলবে না। কারণ তোমার ঠোঁটে সেদিনই একটা চাপা অহংকার দেখতে পেয়েছিলাম। অহংকার এইজন্য যে, তোমার মন এত বড় —তুমি ওসব দাগ–টাগ ঘেন্না করো না, এটা দেখাতে পারলে। কেন তোমাদের কাছে আমি এরকম ছোট হয়ে থাকবো? —জন্ম থেকে আমার শ্বেতি, তোমার নেই কেন?'

'তোমার ভুল ধারণা —'

'আমার সারা শরীর শির শির করে, জ্বালা করে। তাই ডাক্তারের কাছে —'

'আজ থাক, এই সন্ধ্যেবেলা ওসব কথা আমার ভালো লাগে না। চলো নীচে যাই।'

'না, তোমাকে শুনতেই হবে। আমি আর সময় পাবো না।'

'কি ছেলেমানুষী করছো, চলো নীচে।'

'না, বিমল, শোন।'

'না নীচে চলো। নীচে। আমার বড় অস্বস্তি লাগছে। আমার তেষ্টা পেয়েছে। ছায়াদি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি এগিয়ে ওকে স্পর্শ করলুম। ওর সারা শরীরে যেন কোন স্পন্দন নেই। আমি হাত ধরে নীচে নিয়ে এলাম যেন ওর পায়ের তলায় চাকা লাগানো, সমস্ত শরীরটা অস্তিত্বহীন, বাসনা বা প্রতিরোধ নেই, নেমে এলো নীচে।

রাত্তির সাড়ে দশটার মধ্যেও অবিনাশ ফিরলো না মায়াকে নিয়ে। এর মধ্যে আবার গন্ধ শুঁকে–শুকে হাজির হয়েছে শেখর আর অম্লান, হৈ হৈ ও চিৎকারে কান পাতা যায়নি এতক্ষণ, শেখর কাচের গ্লাস ভেঙেছে, অম্লান হাতের তাশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে জানালা দিয়ে —তাশ অদৃশ্য করার ম্যাজিক দেখবার ভান করে। এখন কি চেহারা হয়েছে ঘরটার। অসংখ্য পোড়া সিগারেটের, চুরুটের ছাই, কাপ উল্টে চা পড়েছে বিছানা ও চাদরে, শ'খানেক দেশলাইয়ের কাঠি, তাপসের কানে একটা মরা প্রজাপতি। ওটার উপর যতবার আমার চোখ পড়েছে আমি চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছি। প্রজাপতি নয়, হয়তো মথ, যেগুলো রাত্রে ওড়ে। হলুদ ও কালোয় মেশানো দুই ডানা মেলে ওটা পড়ে আছে। একটু আগে হঠাৎ উড়তে উড়তে ঘরে এসেছিল —সারা ঘরটা যখন পাক দিচ্ছিল অন্দের মতো, তখন আমাদের সকলের চোখগুলি ছিল ওর পিছনে। —'আবার কাকে দল থেকে খসাতে এসেছেরে ওটা,' পরীক্ষিৎ বলেছিল, 'কার হলুদ খামে ঝাঁপিয়ে পড়বে মানিক?'

'বেশ সুন্দর দেখতেরে পোকাটাকে, যা ছায়ার কপালে গিয়ে বোস। ওর যে বয়েস পেরিয়ে গেল।'

'এই তাপস, আমি তোর চেয়ে বয়সে ছোট জানিস,' ছায়াদি চেঁচিয়ে উঠলো। হেমকান্তি একদৃষ্টিতে ওকে দেখছিল। মাথা ধরার জন্যই কিনা, ওর দু'চোখ অসম্ভব লাল, দুই বিস্ফারিত চক্ষুতে প্রজাপতি দেখছিল হেমকান্তি। হঠাৎ ওটা ঝপ করে উড়ে বসলো তাপসের গায়ে। 'একি রে, একি, উঃ —'বলে

আরশোলা গায়ে বসলো কোন কোন মেয়ের ভঙ্গীর মতো ছটফট করে উঠলো তাপস। এক ঝটকায় ওটাকে গা থেকে ফেলে দিল। সেইটুকুই যথেষ্ট ছিল, প্রজাপতিটা স্থির হয়ে পড়ে রইলো।

'একি, মেরে ফেললি নাকি?' পরীক্ষিৎ আলতোভাবে ওর হাতের চেটোয় তুলে নিল, তারপর নিজের দৃষ্টি যেন ওর শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেখে বলল, 'না, শেষ হয়ে গেছে।' ওটাকে ফেলে দিয়ে আবার অন্য কথা-বার্তা বলতে লাগলো। তারপর থেকে আমরা এটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। খানিকক্ষণ বাদে চুরুট ধরাবার সময় অন্যমনস্কভাবে পরীক্ষিৎ দেশলাইয়ের কাঠিটা ছুঁড়ে দিতেই — সেটা গিয়ে পড়লো ওর ছড়ানো ডানায়, দপদপ করে জ্বলতে ও কাঁপতে লাগলো আগুনের ছোট্ট শিখা, ধোঁয়া উঠতে লাগলো সেখান থেকে। ওরা কেউ লক্ষ্য করেনি। আমি খুব চুপিচুপি, যেন কেউ দেখতে না পায় —যেন কোনো খুব অন্যায় করতে যাচ্ছি, এইভাবে কাঠিটা আস্তে তুলে অন্য জায়গায় ফেলে দিয়েছিলাম।

'নাঃ, ভালো লাগছে না, বাড়ি যাই।' পরীক্ষিৎ বললো। ওর শরীর যথেষ্ট খারাপ দেখাচ্ছে, তবু কি করে ঘুরে বেড়ায় কে জানে। মাথা ফাটিয়েছে ব্রীজ থেকে নদীতে পড়ে গিয়ে তারপর কেউ আবার বেঁচে ওঠে, একথা কখনো শুনিনি। ও বলেই বেঁচেছে।

শুধু তাই নয়, ব্রীজ থেকে নদীতে পড়ে যাওয়াও পরীক্ষিতের পক্ষেই সম্ভব। কি জানি ইচ্ছে করেই ঝাঁপ দিয়েছি কিনা, হয়তো প্রাণে বেশি কবিত্ব এসেছিলো।

আমারও আর বসতে ইচ্ছে করছিল না। ছায়াদিকে বললুম, 'আজ যাই কাল পরশু তুমি আমার ওখানে আসবে একবার! আমিই যেতুম, কিন্তু তোমাদের অফিসের ঐ ব্যানার্জি বড় বিশ্রীভাবে তাকায়।'

'তোমাকে যেতে হবে না। আমিই যাবো।'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে কাচের আলমারি খোঁজাখুঁজি করে দু'খানা পেপার ব্যাগ গোয়েন্দা উপন্যাস বেছে নিলাম।

'এগুলো এখন কেউ পড়ছে নাকি?' জিজ্ঞেস করলুম। ঘাড় নেড়ে ছায়াদি 'না' জানালো

পরশুদিনের মধ্যে আমাকে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে একটা লিখতে হবে —তার আগে এরকম কিছু হাল্কা বই না পড়লে আমার কিছুতেই মন বসেনা।

'তাপস, তুই এখন যাবি?'

'না, একটু অবিনাশের জন্য বসে যাই।'

'আপনি যাবেন নাকি পরীক্ষিৎবাবু?'

'অবিনাশের সঙ্গে আমার দরকার আছে। তাছাড়া টাকাটা নিয়ে গেল।'

দেয়ালে পারিবারিক গ্রুপ ফটোগ্রাফের মধ্যে ফ্রকপরা মায়াকে দেখতে পেলাম। হঠাৎ মনে হলো ওরা কি আজ সারা রাত এখানে বেলল্লা করবে?

ছায়াদি বোধ হয় আপত্তি করবে না। কিন্তু মায়া থাকতে দেবেনা কারুকে। মায়া এসব ব্যাপারে খুব কঠিন, হয়তো তার কারণ মায়ার কবিতা লেখার রোগ নেই।

'আমি যাবো, দাঁড়ান।' হেমকান্তি উঠে দাঁড়ালো। যেন ওর বিষম দরকার, এখুনি না গেলে চলবে না। অথচ আমি জানি, আমাদের মধ্যে যে-কোন একজন যদি যাবার কথা না বলতো, তবে হেমকান্তি এখানেই অনন্তকাল বসে থাকতো।

'আরেকটু বসে যা বিমলেন্দু, আমি যাবো।' শেখর বললো।

'তুই তো অন্যদিকে। আমি যাই —'

'বোস্ না, তোকে এগিয়ে দেবো এখন —'

'কতদূর এগিয়ে দিবি?'

'নরক পর্যন্ত।'

ওদের ফেলেই আমি আর হেমকান্তি বেরিয়ে এলাম। বাইরে বিষম ঠাণ্ডা। মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনলাম। 'আপনার মাথা ধরা কমেছে?'

হেমকান্তি ওর সুন্দর, বিষণ্ণ মুখ আমার দিকে তুলে বললো, 'না।' হেমকান্তির মতো রূপবান যুবা– আমাদের বন্ধু–বান্ধবদের মধ্যে তো নেই–ই, দেখেছিও খুব কম। আমার চেয়েও প্রায় আধ হাত লম্বা, চৈতন্যদেবের মতো গায়ের রঙ, ছিপছিপে শরীর, কপালের ওপর জোড়া ভুরু। অথচ মেয়েরা হেমকান্তিকে পছন্দ করেনা। অবিনাশের চেহারা গুণ্ডার মতো, একমাথা চুল, চাপা নাক, তবু অবিনাশ ললনাপ্রিয়। হেমকান্তির কি অসুখ আমি জানিনা, সবসময় চুপ করে থাকে, কথা বলতে চায়না অথচ বন্ধু–বান্ধবদের সংসর্গ ভালোবাসে। যে কোনো আড্ডায় আসা চাই, শেষ পর্যন্ত চুপ করে থাকবে, না জিজ্ঞেস করলে একটাও মন্তব্য করে না। চরম উত্তেজনা, বিষম তর্কাতর্কির মধ্যেও হেমকান্তি নিঃশব্দ। এমন যখন ওর স্বভাব তখন ও একা থাকলেই পারে–কিন্তু কে বলবে একথা। ও কবিতা লেখে না, কিছুই লেখে না। ইকনমিক্সে ভালো রেজাল্ট করেছিল, চাকরি বাকরি করেনা, তবু বাড়ির অবস্থা বোধ হয় অস্বচ্ছল নয়। বাড়ির লোকেরা ওর এই উদ্ভুত জীবন কি করে সহ্য করে বুঝিনা! ওর এইরকম নম্রভাবে চুপ করে তাকা আমারও বিরক্তিকর লাগে।

সবচেয়ে মজা হয় মেয়েদের সঙ্গে। যখন মেয়েরা থাকে, স্বভাবতই রূপবান হেমকান্তির দিকে তাদের বেশি কৌতূহল। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ের দিকে তাকায়নি, কথা বলেনি, প্রশ্ন করলে এক অক্ষরে উত্তর দিয়েছে। মেয়েরা এখন ওকে নিয়ে প্রকাশ্যেই হাসাহাসি করে। মায়া ওকে একদম সহ্য করতে পারে না। হেমকান্তি সম্বন্ধে গভীর বিতৃষ্ণা মায়ার চোখে মুখে ফুটে ওঠে, আমি দেখেছি।

অনেকক্ষণ পাশাপাশি চুপ করে হাঁটবার পর হেমকান্তি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি– বাড়ি ফিরবেন?'

'হ্যাঁ', আমি বললুম ' কেন, আপনি ফিরবেন না!'

'ঠিক– ইচ্ছে– আমার মায়ের খুব– অসুখ।' হেমকান্তি দাঁড়িয়ে পড়লো।

'তার মানে? অসুখ বলেই বাড়ি ফিরবেন না? কি রকম অসুখ?'

'খুবই – বলা যায়'—

আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম বাড়িতে হেমকান্তির অবস্থা। সকলে বিষম ব্যস্ত, উৎকণ্ঠা, ডাক্তার আসা–যাওয়া করছে— হেমকান্তি চুপ করে সারাদিন বসে আছে নিজের ঘরে, অথবা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সকলের ব্যস্ততা দেখছে। তার নিজের কিছুই করার নেই, — কেউ তাকে ডাক্তার ডাকতে বলবে না, ওষুধের দোকানে পাঠাবে না। জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসেও ওর মা যদি একবার আকুলভাবে ডেকে ওঠেন, ' হেম কোথায়, হেমকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে, হেম —তখনও হেমকান্তি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ভাববে সাড়া দেবে কিনা, জোরে কথা বলতে হবে —না ফিসফিসিয়ে, মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো —না হাঁটু মুড়ে বসবো, কপালে হাত রাখবো —না কাঁদবো পা ছুঁয়ে, —এসব বিপুল সমস্যার বদলে বাড়ির বাইরে থাকাই ভালো —হেমকান্তি ভাবে নিশ্চিত। আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। অনেক পোষা কুকুরের মুখের দিকে মাঝে মাঝে তাকালে যেমন মনে হয়, মানুষের ভাষায় কথা বলার জন্য বেদনা জেগে উঠছে তাদের মধ্যে —হেমকান্তির মুখেও সেই বেদনা। যেন ও মানুষের ভাসা জানেনা।

আমি হেমকান্তিকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললুম, 'কি বলছেন? খুব বেশী অসুখ নাকি? এতক্ষণ কিছু হয়ে যায় নি তো?'

'জানিনা।'

আমার বিষম ভয় হলো। হেমকান্তি বোধহয় মায়ের মৃত্যুর সময়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। এতক্ষণ কিছুই জানায়নি।

'শিগ্‌গির চলুন বাড়ি। আমি যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।'

কয়েক পা এগিয়েই হেমকান্তি আবার দাঁড়িয়ে পড়লো। বললো, 'না, আপনি—মানে—আমি একাই যাই। এসব জিনিস দুজনের ভাগ করে নেওয়া যায় না।'

হেমকান্তির বাম বাহু জোর করে চেপে আমি ছুটে চললুম। কাছেই সাদার্ন রোডের মুখটায় বাড়ি।

বাড়ির সদর দরজা হাট করে খোলা। সদরের সামনে খোলা জায়গাটায় চড়া পাওয়ারের আলো। রাস্তায় বিপুল জ্যোৎস্না আজ। সুতরাং কাছের ইলেক্‌ট্রিকের আলো আর জ্যোৎস্না এক জায়গায় মিশেছে। আমি তৎক্ষণাৎ সেই মিশ্রিত আলোর মধ্যে মৃত্যুর গন্ধ পেলুম। কোথাও কোনো শব্দ নেই। ভেতরে ঢুকে সিঁড়িতে পা দিলুম দু'জনে। এ বিষয়ে আমার অনুভূতি একেবারে নির্ভুল। আমি জানি, হেমকান্তির মা আর বেঁচে নেই। এই নিস্তব্ধতা, সিঁড়ি কিংবা দেয়াল —এর যে কোনো একটা দেখলেই এই মুহূর্তে মৃত্যুর কথা বুঝতে পারা যায়। যে বাড়িতে মৃত্যু হয়, সে বাড়িরই দরজা সে রাত্রে হাট করে খোলা থাকে, আমি দেখেছি। কেন? চোর ডাকাতের কথা তখন মনে থাকে না কারুর? কেন? মৃত্যুর থেকে আর বড় চুরি হয় না এই ভেবে? যাই হোক, মৃত্যুর বাড়িতে কখনো চুরি হয়েছে আমি শুনিনি। সে বাড়ির দরজার একটা পাল্লা ভেজানো পর্যন্ত থাকে না। দুটো দরজাই সম্পূর্ণ খোলা থাকে, আমি বারবার লক্ষ্য করেছি। হঠাৎ আমার মনে পড়লো, আমার বাড়িতে ভাত ঢাকা দিয়ে মা আমার জন্য জেগে বসে আছে। আমি কেন এত দেরী করেছি। আর কোনোদিন দেরী করবো না। কিন্তু এখন তো হেমকান্তিকে ফেলে চলে যাওয়া যায় না।

দোতলার বারান্দায় উঠতেই দেখা গেল তিনজন দামী পোশাক-পরা ভদ্রলোক দ্রুত বেরিয়ে আসছেন একটা ঘর থেকে। হেমকান্তিকে দেখেই তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন।

'একি, তুমি শ্মশানে যাও নি? সারা কোলকাতা খোঁজা হচ্ছে তোমাকে!'

তাঁদের কথার মধ্যে ভর্ৎসনার সুর ছিল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার বুক মুচড়ে উঠলো। হেমকান্তি মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল।

'চলো, আমাদের গাড়ি আছে, শ্মশানে যেতে হয়, জুতো খোলো!' সেই তিনজনের মধ্যে একজন খুব নরম গলায় বললেন।

'মামাবাবু, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি শ্মশান দেখতে পারি না।'

সেই ভদ্রলোক কাছে এসে হেমকান্তিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর বুকের মধ্যে অনেকখানি হাওয়া টেনে নিয়ে হু হু করা গলায় বললেন,' তোকে আমি কি আর বলবো হেম, চল, যেতে হয়, — যে গেলো সে ছিল আমার দিদি, তোর মা, —তোকে সান্ত্বনা দিতে পারবো না আমি, চল, হিন্দুধর্মের নিয়মগুলো মেনে দেখ, দুঃখ-কষ্ট আপনি কমে যাবে।'

আমি হেমকান্তির মুখের দিকে ভালো করে খুঁজে খুঁজে দেখলুম। সাদা পাথরের মূর্তির মতো স্পন্দনহীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কি জানি কি রকম দুঃখ কষ্ট ওর, চোখে মুখে যার কোনো চিহ্ন ফোটে না। হঠাৎ হেমকান্তিকে আমার অত্যন্ত নির্লজ্জ রকমের বিলাসী পুরুষ বলে মনে হলো।

BANGLADARPAN

ছায়া

ছেলেবেলায় বাবা বলতেন, 'ছায়া, তোকে আমি আর্টস্কুলে ভর্তি করে দেবো, তুই খুব নামকরা শিল্পী হবি।' বাবা আমাকে রঙের বাক্স কিনে দিয়েছিলেন। তাই দিয়ে আমি হরপার্বতী, গাছের মাথায় চাঁদ — আঁকতুম। বাবা আমার লেখাপড়া সম্বন্ধেও খুব যত্ন নিতেন। আমার জন্য মাস্টার রেখে দিয়েছিলেন। আমি ছেলেবেলায় খুব অসুখে ভুগতুম, বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়তুম শুধু —বাবা আমার জন্য লাইব্রেরী থেকে রোজ বই এনে দিতেন। বলতেন, 'লেখাপড়া শিখে বড় হবি, নিজের পায়ে দাঁড়াবি, পৃথিবীর কাউকে গ্রাহ্য করবি না। আজকাল মেয়েরা পুরুষের ওপর নির্ভর না করেও বাঁচতে পারে।' পরে বুঝেছিলাম, বাবার অতসব কথা বলার মানে, আমর ঠোঁটের নিচে, কানের পাশে সাদা দাগ। শ্বেতি। তাপসই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। তাপস বলতো, 'দেখবি, ক্রমশঃ তোর সারা মুখ, হাত-পা সাদা হয়ে যাবে। তোর আর বিয়ে হবে না।'

তাপস আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতো —সেই তমলুকে, উনিশশো বেয়াল্লিশে, চুয়াল্লিশে। ওর বাবা ছিলেন পোস্টমাস্টার, আমার বাবা দারোগা। আমাদের কোয়ার্টারের সামনে আমি আর মায়া ফুলের বাগান করেছিলাম। মা সিঁড়ির ওপর বসে বসে দেখতেন। মায়ের হাঁপানি ছিল বিষম হাঁটাচলা করতে পারতেন না। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলতেন, 'তোদের দু'জনের একজনও যদি ছেলে হতি, আমার কোনো ভাবনা থাকতো না।' আমরা আসলে পূর্ববঙ্গের লোক বলে 'বাঙাল বাঙাল' বলতো অনেকে, দারোগার মেয়ে বলে ভয়ও করতো। তাপসরা খুলনার, কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করতো না। তাপসের মা বলতো, 'খুকী বাড়ি যাও, ঝড় আসতিছে, পরে আর যাতি পারবা না।'

তাপসরা হাতে লেখা পত্রিকা বার করতো —আমাকে দিতো তার ছবি আঁকতে। আমি সুন্দর করে নানা রঙের ফুল লতাপাতা এঁকে দিতুম। আমি একবার বলেছিলাম, 'তাপস, আমার একটা পদ্য ছাপাবি এবারের বইটাতে?' তাপস বলেছিলো, 'ভাগ, তুই আবার কবিতা লিখবি কিরে? মেয়েদের দ্বারা কবিতা হয় না। মেয়েদের নিয়েই তো কবিতা লিখতে হয়!'

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুই কোন্ মেয়েকে নিয়ে লিখিস রে?'

'সুরঞ্জনাকে নিয়ে! অম্লান বদনে ও বলেছিলো। চৌধুরী-বাড়ির মেয়ে সুরঞ্জনা —তাপসের কথা শুনে আমার রাগ হলেও খুব বেশি হয়নি, কারন সুরঞ্জনা ছিল রাজকন্যার মতো রূপসী। আমি বলেছিলাম 'যা যা, সুরঞ্জনা তোর দিকে কোনোদিন ফিরেও তাকাবে না।' তাপস আর আমার দু'জনেরই বয়েস তখন তেরো। মায়ারআট।

তাপস ছিল ছেলেবেলার থেকেই একটু বখাটে ধরনের। ইস্কুলে পড়তে পড়তেই বিড়ি সিগারেট খেতো। দুপুরবেলা বাবা থানায় চলে যাবার পর তাপস আমাদের বাড়িতে আসতো। মা ঘুমিয়ে পড়লো ও দিব্যি সিগারেট ধরাতো, দেশলাই জ্বালবার সময় খুক করে একবার কেশে শব্দটা চেপে দিতো। নাক দিয়ে দোঁয়া বার করতো, রিঙ করতো, আমাকে বলতো, 'খাবি? খা—না!' মায়া এক-একদিন ওকে ভয় দেখাতো, 'বাবাকে বলে দেবো।' তাপস বাবাকে খুব ভয় করতো। তখন থেকেই তাপস অসম্ভব নিষ্ঠুর আর নির্লিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তাপসরা আজকার নিজেদের বলে আধুনিক সাহিত্যিক। আধুনিকতা মানে বুঝি নিষ্ঠুরতা!

ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় টেস্টের পর আমরা দু'জনে একসঙ্গে পড়াশুনো করতুম —তখনও বাবা মারা যাননি। আমাদের বাড়ির পিছনদিকটার ছোটঘরে বই-খাতা ছড়িয়ে বসতুম। তাপস অধিকাংশ সময়ই চিৎ হয়ে শুয়ে সিগারেট টানতে টানতে বলতো, 'তুই থিয়োরেমগুলো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মুখস্থ কর —তোর পড়া ধরবো।' আমারটা শুনে শুনেই তাপসের মুখস্থ হয়ে যেতো। এমনিতে বদমায়েসী-বখামি করলেও পড়াশুনোয় ও ভালো ছেলে ছিল। নিজের সম্বন্ধে বিষম অহংকার ছিল তখন থেকেই। বলতো, 'দেখবি এককালে তোদের ছেলে-মেয়েরা পরীক্ষার সময় আমার গল্প কবিতার ব্যাখ্যা মুখস্থ করবে।'

দু'জন উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে দুপুর কাটাতুম কিন্তু কখনো কোনো অসভ্যতা করেনি তাপস। আমিই বরং মাঝে মাঝে ওর একটা হাত অনেকক্ষণ ধরে থাকতুম। তাপসের কোনো ভাষান্তর ছিল না। কখনো কখনো ও আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতো —তারপর আমার ঠোঁটে-মুখে কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতো, 'আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তোকে আশীর্বাদ করছি ছায়া তোর ঐ দাগ একদিন মিলিয়ে যাবে। এমনিতে তোকে বেশ সুন্দর দেখতে। তা ছাড়া দাগ না উঠলেও ক্ষতি নেই —ও দাগ ছোঁয়াচে নয়, ওতে কোনো দোষ হয়না।' তাপসের সঙ্গে খুব ছেলেবেলা থেকে মিশেছি, — ছোট ছেলে-মেয়েরা যে কতগুলো ঠিকে অসভ্যতা করে — আড়ালে চুমু খাওয়া, জড়াজড়ি, কি প্যান্ট ফ্রক খুলে দেখাদেখি —সেসব কখনও না।

যখন প্রথম আমি বালিকা থেকে নারী হলাম, তখন কয়েক দিনের জন্য আমি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। সবসময় ছটফট করতাম, চুল বাঁধতে ইচ্ছে করতো না, আয়নায় শরীর দেখতুম, নিজেই নিজের বাহুতে চুমু খেতাম —শুয়ে শুয়ে বা বাথরুমে আমি নানান্ ছেলের কথা ভাবতাম চোখ বুঁজে —যেন তারা আমাকে আদার করছে কিংবা পাশে শুয়ে আছে। কিন্তু কখনও তাপসের কথা ভাবিনি।

তাপস একবার মাত্র অদ্ভুত কাণ্ড করেছিল। সেদিন দুপুরে ঘোর বৃষ্টি। আমি খাওয়ার পর পড়ার ঘরে বই খুলে বসে আছি —তাপস এলো অনেক দেরী করে, ভিজতে ভিজতে। পরীক্ষার মাত্র একমাস দেরী। তাপস সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ রইলো, কোনো কথা নেই, যেন কান পেতে কোনো শব্দ শুনছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই, বৃষ্টির আওয়াজে সর্বত্র শব্দহীন। বাড়িতে কেউ জেগে নেই, মায়া ইস্কুলে। জিজ্ঞেস করলুম, 'কিরে ভূতের মতো রইলি যে? আজ না গ্রাফের অঙ্ক কষার কথা ছিল। ভিজে জামাটা খুলে ফ্যালনা!'

শুকনো মুখে তাপস বললো, 'আজ সকালে একটা গল্প লিখতে আরম্ভ করেছিলাম। শেষ হলো না। গল্পটা শেষ করতে না পারলে মন স্থির হচ্ছে না। তোকে একটা কথা বলবো?'

'কি?'

'কিছু মনে করবি না, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হিসেবও ধরতে পারিস। মনে কর, আমরা হাইজিন পড়ছি।'

'কি ব্যাপার কি?'

'রাগ করা চলবে না কিন্তু। তোর শাড়ি-ব্লাউজগুলো সব একবার খুলে ফেলবি? আমি একবার তোকেদেখবো।'

শুনেই কি যে হলো আমার, বৃষ্টির শব্দ ছাড়িয়েও বুকের মধ্যে অন্য একটা প্রচণ্ড শব্দ হলো। বুঝতে পারলুম, শরীর হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আমি ঘরের কোণের দিকে সরে গেলুম।

'না না, মানে জানিস, খারাপ কিছু না, আমি কোনো মেয়ের সম্পূর্ণ শরীর দেখিনি। একবার দেখতে চাই। শুধু দূর থেকে —'

'তাপস!'

'তোর ভয় নেই, গায়ে হাত দেবো না, দূর থেকে —একবার, কেউতো নেই এদিকে।'

'তাপস, তুই এতটা —'

'সত্যি, আমার খুব ইচ্ছে হয়। গল্পটা শেষ করতে পারছি না। গল্পে এরকম একটা ব্যাপার আছে। অথচ নিজে না দেখে, অভিজ্ঞতা ছাড়া···লুকিয়ে চুরিয়ে যে কখনো দেখিনি তা নয়, ছোট মাসীকে চান করার সময় বাথরুমের দরজার ফুটো দিয়ে দেখেছি —কিন্তু সামনা-সামনি স্পষ্ট দেখতে চাই। তোকে ছাড়া আর কাকে বলবো?'

AMARBOI.COM

আমার শরীর কাঁপছিল। বললুম, 'ইতর কোথাকার। এটুকুও জানিস না, একথা কোনো মেয়েকে বলার আগে বলে নিতে হয়, আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

তাপস হো-হো করে হেসে উঠলো। তারপর বললো, 'ওঃ —তুইও বুঝি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চতুষ্কোণ' পড়েছিস?'

'না, পড়িনি। তোকে আমার সহ্য হচ্ছে না, তুই চলে যা —'

'পড়িস নি? তাহলে সব মেয়েই বুঝি এই কথা বলে। আচ্ছা থাক্।' তাপসের চেহারা খারাপ নয়, মাজা মাজা গায়ের রঙ, বড় বড় চোখ, মুখে একটা পাগলাটে ধরনের শ্রী ছিল। কিন্তু সেদিন আমার মনে হলো ওর মধ্যে যেন শয়তান ভর করেছে। আমি বললুম, 'তুই এক্ষুণি চলে যা, আর আমাদের বাড়িতে আসিস না। তোকে বাদ দিয়েই আমি পাশ করতে পারবো।'

সেবার অবশ্য আমার পরীক্ষাই দেওয়া হয়নি।

বছর আষ্টেক বাদে কলকাতায় শেষ পর্যন্ত তাপস আমার নিরাবরণ শরীর দেখেছিল। শেষ পর্যন্ত ওরই জিত্ হলো। সেটা ছিল সম্পূর্ণ আমার দোষ। তখন তাপসরা তরুণ সাহিত্যিকের দল আমাদের বাড়িতে আড্ডা দিতে শুরু করেছে। তখন আমি পাগলের মতো হয়ে উঠেছিলাম। মাথার ওপর কোনো অভিভাবক ছিল না। এখন আমি নিজেই নিজের অভিভাবিকা হতে পেরেছি। আমার স্বাস্থ্য এমনিতেই ভালো, দুবেলা ক্ষিদে পায়, মাঝ রাত্তিরেও অন্য রকম ক্ষিদে পেত। কিন্তু ছেলেরা কেউ আমাকে দিদি বলতো, কেউ বন্ধুর মতো। কিন্তু কেউ আমাকে আড়ালে ডাকেনি, আমাকে একা কেউ চায়নি। আমি সবার সঙ্গে হাসছি, কথা বলছি, কিন্তু কান্না পেত, কারুর বুকে আমি জীবনে মাথা রাখিনি। সেই রকমই এক বৃষ্টির দুপুরে তাপস এলো। এসেই বললো, 'হঠাৎ তোর কথা মনে পড়লো ছায়া। তাই এলাম।' কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ অভিমানে আমার বুক ভরে গেল। কেউ আসেনা হঠাৎ আমার কথা ভেবে, আমি জানি। ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'তাই নাকি? বোস্।'

'তমলুক গিয়েছিলাম —আজই ফিরেছি, স্টেশন থেকে সোজা তোর এখানে এলাম। তোকে আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম —হঠাৎ তমলুকে গিয়ে বিষম মনে পড়লো। তোদের কোয়ার্টারে অনেক লোক এসেছে। সামনের বাগানটায় ফুলের বদলে বেগুনের চারা লাগিয়েছে। বড় খারাপ লাগলো। হঠাৎ একঝলক হাওয়া দিতেই মনে হলো তোর মা যেন সিঁড়ির ওপর বসে আছেন আর তুই ফ্রক পরে জলের ঝারি হাতে ঘুরছিস। আমার ছেলেবেলাটাকে তুই বড় দখল করে আছিস। তখনই মনে হলো, ফিরেই তোর কাছে যাবো। বড় ক্ষিদে পেয়েছে। কিছু খেতে দিবি?'

দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল তখন, পিসিমা ঘুমোচ্ছেন।

'কি খেতে দেবো? দুধ চিঁড়ে খাবি?'

'হ্যাঁ, তাই দে না, ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে।'

তাপস সোজা আমার কাছে চলে এলো, কি করে ওর এরকম দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছিল জানিনা। আমার মুখটাকে জোর করে ধরে ঠিক আমার ঠোঁটের নিচে ও কানের পাশে —যেখানে সাদা দাগ, দীর্ঘ চুমু খেলো। আমার চোখে কান্না এসেছিল, আমি দুহাতে ওকে ঠেলে দিতে গেলুম। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। ও আমার ব্লাউজ, শাড়ি, শায়া সব খুলে ফেললো। আমি আর বাধা দিইনি। তাপস আমাকে বিছানায় শুইয়ে ফেলে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। আমি ক্লিষ্ট গলায় বললুম, 'তুই কি এখনো কোনো মেয়ের শরীর দেখিসনি?'

'হ্যাঁ, দেখেছি অনেক। কিন্তু প্রত্যেকে অন্যরকম। ছায়া, আমি তোকে সম্পূর্ণভাবে না দেখলে তোকে কখনো চিনতে পারতুম না। তুই সত্যিই অসাধারণ।'

BANGLA.NET

আমার শরীরের অন্য কোনো জায়গায় আর সাদা ক্ষত ছিল না বলে আমি সেদিন খুশি হয়েছিলুম, না হলে আমি চোর হয়ে যেতুম। আমি লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'তাপস, তুই আমাকে বিয়ে করবি!'

'না।'

'কেন!'

'কারণ, তোর কথা কখনো আমি ভাবিনি।'

'তবে আজ কি জন্য এসেছিস? শরীর?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'কেন?'

'কারণ, আমি তোকে ভালোবাসি।'

আমি উঠে বসে কাপড়টা জড়িয়ে বললুম, 'এর মানে কি?'

'মানে হয় না বুঝি? তা হলে জানিনা। যা মনে হলো তাই বললুম।'

'এ কিরকম অদ্ভুত মনে হওয়া?'

'সত্যিই তা জানিনা রে ছায়া। আমার যা মনে হয়, তাই বলি, তাই লিখি। বিচার-বিবেচনা করে অত দেখতে ইচ্ছে করে না। আজ যা বললুম, কাল হয়তো তা মনে হবেনা। তাতে দোষ কি? আমি এরকমভাবেই জীবন কাটাতে চাই।'

আমি মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। আমার চোখের জল থামছিল না। সম্পূর্ণ বিচার বিবেচনাহীন চোখের জল। বুক থেকে ঠাণ্ডা একটা গভীর উদাসীনতা উঠে এলো। তারপর তাপসের দিকে ফিরে খাটের ওপর খানিকটা জায়গা করে দিয়ে বললুম, 'আয়, দেখি, তোকেও দেখে সম্পূর্ণ চেনা যায় কিনা।'

সেবর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া হয়নি, কারণ পরীক্ষার সাতদিন আগে বাবা খুন হয়েছিলেন। বাবা গ্রামের দিকে গিয়েছিলেন ইন্সপেকসানে। রাত্রে ফিরলেন না। পরের দিন তাঁকে নিয়ে আসা হলো একটা গরুর গাড়িতে, বরফের গুঁড়োয় সারা শরীর ঢেকে। মরা মানুষের চোখ যে কত বিশ্রী হয় সেই প্রথম দেখলুম। সেই ঘটনায় মা কিছুদিন পাগল হয়ে গিয়ে ছিলেন।

আমার বাবা ছিলেন বেশ হাসি-খুশি মানুষ, খুব বড় চরিত্রের নয়। বাবা ঘুষ নিতেন, সন্ধ্যের দিকে রোজ খানিকটা মদ খেতেন আমরা জানতুম। চোর-ডাকাতদের দমন করার বদলে তাদের নিয়ে শান্তিতে বসবাস করাই ছিল তাঁর নীতি। ঘুষের টাকা জমিয়েই তিনি কলকাতায় আমার নামে এই ছোট বাড়িটা কিনে ভাড়া দিয়েছিলেন। তবে মদ চোলাই-এর দলটাকে দমন করবার জন্য তিনি কেন উঠে পড়ে লেগেছিলেন জানিনা, বোধহয় তারা বাবার মদেই ভেজাল দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ওটা টেররিস্টদের আড্ডা, আগস্ট আন্দোলনের রেশ তখনো থামেনি।

বাবা মারা যাবার পর আমাদের কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হলো। তারপরও কিছুদিন আমরা তমলুকে ছিলাম। অন্য একটা বাড়ি ভাড়া করে। কোয়ার্টার ছেড়ে দেবার সময় মায়া বলেছিলো, 'দিদি, ফুলগাছগুলো তো আমাদের, ওগুলো নিয়ে যাবো।' আমি বলেছিলাম, 'থাক্ না।' মায়া ছেলেবেলা থেকেই বিষম জেদি, যাবার সময় টেনে টেনে ফুলগাছগুলো তুলে নিল। যে বাড়িটায় আমরা গেলাম, সামনে মাঠ নেই, ছোট, অন্ধকার মতন। মায়া একটুকানি জায়গার মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি করে গাছগুলো লাগালো, কিন্তু গোলাপ, ডালিয়া, যুঁই, ক্যানা একটাও বাঁচলো না।

আমার পরীক্ষা দেওয়া হলো না সেবার, বর্ধমান থেকে বড় পিসিমা এসে রইলেন কাছে, তাছাড়া বরদা উকীল বাবার বন্ধু ছিলেন, আমরা জেঠাবাবু বলতুম, তিনি আমাদের দেখাশুনো করতে লাগলেন। বাবার টাকা-কড়ির ব্যবস্থা করা, কলকাতার বাড়ি থেকে ভাড়াটে তোলা সবই করেছিলেন। তাপস ততদিনে পাশ করে কলকাতার কলেজে গিয়ে ভর্তি হলো। সেবারই পুজোর ছুটিতে ওর সঙ্গে ওর দুই বন্ধু এসেছিল বেড়াতে —পরীক্ষিৎ আর অনিমেষ। তিনটে ঝকঝকে টাটকা ছেলে —সন্ধ্যের সময় রাস্তা দিয়ে চেঁচিয়ে গান গাইতে গাইতে যেতো। আমার সঙ্গে একবার বন্ধুদের নিয়ে দেখা করতে এসেছিল তাপস। কিন্তু তখন ওর ওপর আমার রাগ ছিল, সেইজন্য ভালোভাবে কারুর সঙ্গে কথা বলিনি। তখন আমি কবিতা লিখতে শুরু করেছি, মাঝে মাঝে ডাকে নানা পত্রিকায় পাঠাতুম। কোনো কোনো সময় তাপস, পরীক্ষিৎ আর আমার লেখা একই পত্রিকায় বেরুতো —কিন্তু আমি ওদের লেখা পড়ে বুঝতে পারতুমনা।

কলকাতার বাড়িতে একতলায় নতুন ভাড়াটে বসিয়ে দোতলায় আমরা উঠে এলাম বছরখানেক বাদে। তমলুক সেই ছেড়ে আসা চিরকালের জন্য —আমার ছেলেবেলার তমলুক। আসবার সময় মনে হয়েছিল, ওখানে আমরা বাবাকে ফেলে এলুম। কিন্তু মায়ের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসা দরকার ছিল।

মা বিছানায় শুয়ে পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন। তখন আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। মায়া ক্রমে যুবতী হয়ে উঠেছে। রাত্তিরে খাবার সময় অনেকক্ষণ ধরে গল্প করতুম আমি, মায়া, পিসিমা, মা। মা বলতেন, 'কলকাতা শহরে থাকার এই সুবিধে, পুরুষমানুষ না থাকলেও চলে।' মায়ার নানান রকম ছেলেমানুষী কাণ্ড নিয়ে আমরা রোজ রাত্রে খুব হাসাহাসি করতুম। মায়া কোনো কারণে রেগে গেলে সাতখানা-আটখানা করে কাচের গেলাসই ভাঙতো। ইস্কুলে যাবার সময় ছেলে-ছোকরারা যদি কোনো মন্তব্য করতো মায়া সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে তার উত্তর দিতো। মোড়ের মাথায় একটা ছেলে ওর সামনে শিস্ দিয়েছিল বলে মায়া সোজা সেই ছেলেটার বাড়িতে গিয়ে কড়া নেড়ে তার বাবাকে বলে দেয়। সেই ভদ্রলোক পরে এসে মায়ের সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা চেয়ে যান। মায়া একবার বায়না ধরেছিল, শীতকালে প্যান্টকোট পরে রাস্তায় বেরুবে। মা, পিসিমা কত ঠাট্টা করলেন, 'বিবিসাহেব' 'মসিবাবা' কত কি বলে হাসাহাসি করা হলো, কিন্তু মায়া অটল। এ যে সম্ভব না, তা মায়াকে কিছুতেই বোঝানো গেল না — সেই নিয়ে শেষ পর্যন্ত রাগারাগি শুরু হয়ে গেল —আমি মায়াকে কোন দিন বকিনি, কিন্তু ওর বোকা গোঁয়ার্তুমি দেখে চড় মারতে গিয়েছিলাম। কিন্তু মায়া মত বদলাবে না, রাগ করে খাওয়া বন্ধ করে দিল। মা শেষটায় বললেন, 'দে ছায়া, ওকে এক সেট বানিয়ে দে।' বাড়িতে দর্জি ডেকে মাপ দেওয়া হলো। যখন তৈরী হয়ে এলো —সব পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মায়ার কি হাসি। মা বিছনার ওপর উঠে বসেছেন, পিসিমা আর আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, মায়া বাবার শোলার টুপিটা পর্যন্ত মাথায় দিয়ে দুলে-দুলে হেসে খুন হলো। মা বললেন, 'আমার ছেলে ছিল না, এই তো একটা ছেলে হলো!'

মায়া সে পোশাক পরে একদিনও বেরোয়নি। কখনও খুব রেগে গেলে মায়াকে আমি সেই পোশাকের কথা তুলে ঠাট্টা করি।

মায়া একদিন সন্ধ্যেবেলা, এ বাড়িতে তাপস আর পরীক্ষিৎকে নিয়ে এসেছিলো। পথে দেখা হবার পর তাপস মায়াকে চিনতে পারেনি। ওকে এত বড় হতে তো দেখেনি তাপস। মায়াই 'তাপসদা' 'তাপসদা' বলে চেঁচিয়ে ডেকে উঠেছিল —তারপর টেনে এনেছিল বাড়িতে। ক্রমে ক্রমে এলো ওর বন্ধুবান্ধবদের দল – অবিনাশ, হেমকান্তি, অম্লান, অনিমেষ, শেখর, বিমলেন্দু। মা তখনও বেঁচে। বিমলেন্দুর দিদি আমার সঙ্গে বি.এ.-তে পড়তো —সেজন্য ও আমাকে 'ছায়াদি' বলে। সেই শুনে শুনে শেখর, অনিমেষ ওরাও। কেউ আপনি বলে, কেউ তুমি, তুই। অবিনাশ বলে, মেয়েদের মধ্যে একমাত্র আমার কবিতাই নাকি পাঠযোগ্য। মেয়েদের মধ্যে আমিই প্রথম আধুনিক। শেখর একটা কবিতা পত্রিকার

সম্পাদক, প্রতি সংখ্যায় ও আমার লেখা আগ্রহ করে ছাপে। আমি যদিও আমার গোপন দুঃখের কথা কিছুই এ পর্যন্ত লিখতে পারিনা। মায়া অবশ্য আমার লেখা সম্পর্কে ঠোঁট ওল্টায়। একবার পূজো সংখ্যার লেখার জন্য মনি অর্ডারে টাকা পেয়েছিলাম —মায়া বলেছিল, 'সে কি রে দিদি, ঐ পদ্য লেখার জন্যও লোকে টাকা দেয়? কে পড়ে রে?'

মায়ের মৃত্যুর সময় তাপসের বন্ধুবান্ধবরা খুব সাহায্য করেছিল। ওদের মধ্যে কেউ ভয়ংকর নিষ্ঠুর, কেউ উদাসীন, কেউ লোভী —কিন্তু ওরা কেউই অসৎ নয়। মনে মনে ওরা প্রত্যেকেই সম্রাট কিংবা জলদস্যু, কেউই ছিঁচকে নয়, সেইজন্যই ওরা সাধারণ নয় কেউ, ওরা সাহিত্যিক, আমি জানি। একদল পাগল।

মায়ের মৃত্যুর কথা মনে হলেই এখনো আমি সামনে-পিছনে তাকাই। এত ভয়ংকর শান্ত মৃত্যু যে হয় আমি ভাবতে পারিনি। এখন যেটা বসবার ঘর করেছি —আগে ঐ ঘরটায় একটা খাটে মায়ের দুপাশে আমি আর মায়া শুতুম। সেদিন ঘুমোতে যাবার আগে মা আমাদের দুজনের চুল বেঁধে দিলেন টান করে। সেদিন মায়া ওর তিনজন মেয়ে-বন্ধুর সঙ্গে সিগারেট খেয়েছে —এই কথা মাকে বললো। মায়ার কোনো কিছুই গোপন ছিল না, আমাকে আর মাকে সব কথা বলে দিত। —'ছেলেরা কেন সিগারেট খায় শখ করে সেটা —দেখবার জন্য খেয়েছিলাম, জানো মা। প্রত্যেকে তিনটে করে টেনে দেখলুম গীতালিদের ছাদের ঘরে, গীতালি তো কাশতে কাশতে বাঁচে না,- আমার কোন কষ্ট হয়নি —তবে অত আহ্লাদ করে খাবার কি আছে বুঝতে পারিনি।'

মা একহাতে মায়ার চুলের গোছা ধরে আরেক হাতে চিরুনি চালাচ্ছিলেন। আমি মায়ার মুখোমুখি বসে। আমি বললুম, 'ও একদিন খেলে কিছুই বোঝা যায় না, —পরপর কদিন খেলে রোজ রোজ খেতে ইচ্ছে করবে। সেই রোজ খাওয়ার ইচ্ছেটাই নেশা।'

'ওঃ, তুই এমনভাবে বলছিস, যেন তুই রোজ খেয়ে দেখেছিস্।'

মা হাসতে হাসতে বললেন, 'দিদি লেখে কিনা, তাই জানে। লেখক লেখিকাদের সব জানতে হয়।'

'আমি রোজ খেয়ে দেখবো মা? ছেলেরা পারে তো আমরা পারবো না কেন? খাওয়ার জিনিসে আবার ছেলে-মেয়ে কি?'

'খেতে পারিস, তবে বিড়ি সিগারেট খেলে ঠোঁট কালো হয়ে যায়। মেয়েদের কালো ঠোঁট দেখা তো কারুর অভ্যেস নেই, তাই খারাপ লাগবে।'

'তবে মেমসাহেবরা যে খায়?'

'মেমসাহেবরা ঠোঁট লাল করার জন্য লিপস্টিক মাখে। তুই মাখবি?'

'না, না, লিপস্টিক বিচ্ছিরি।'

আমি আর মা হেসে উঠলুম। ক'দিন ধরে মায়ের শরীর একটু ভালো ছিল। আরো কিছুক্ষণ গল্প করে আমরা আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ি। সেদিন সারারাত আমার সুন্দর ঘুম হয়েছিল। একছিটে স্বপ্ন পর্যন্ত দেখিনি। সকাল বেলা চোখ মেলে দেখলুম, মায়া উঠে বসে আছে —একদৃষ্টে মায়ের দিকে তাকিয়ে। কোনো কথা নেই। মায়ের দু'ঠোঁট খোলা, পাশ দিয়ে রক্ত। মা মায়ার দিকে তাকিয়ে আছেন। মা বেঁচে নেই। সারারাত আমরা মায়ের পাশে শুয়ে ছিলাম। কোনো এক সময় মা আমাদের ঘুম না ভাঙিয়ে চলে গেছেন। সারা রাত আমরা মৃতদেহের পাশে। একথা যখনই ভাবি, শরীরে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায়। এখনও মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে মনে হয়, মায়া ও আমার মধ্যে মা শুয়ে আছেন। এমনকি অফিসে, ট্রামে, বাসেও মাঝে মাঝে আমার পাশে মায়ের মৃত শরীরের অস্তিত্বের কথা মনে পড়ে। এই অনুভূতির মধ্যে

কোনো ভয় নেই, মায়ের চরিত্রের মতোই শান্ত স্নেহময়। কখনো কখনো মনে হয় এই স্নেহময় মৃত্যু আমার শরীরে ঢুকে গেছে। আমারও ইচ্ছে করে ঐ রকম শান্তভাবে মরে যেতে।

সারাদিন আমি কি করি? কিছুই না, মনে হয় চোখ বুঁজে কাটাচ্ছি। ভোরে ওঠা স্বভাব, উঠেই হীটারের প্লাগটা লাগিয়ে দিয়েই চায়ের কেটলিটা চাপিয়ে দিই। তারপরে বাথরুমে মুখ-হাত ধুয়ে স্নান করি। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে, আমি একা অনেকক্ষণ স্নানের ঘরে থাকি। মায়ার স্বভাবটা আদুরে ধরনের হয়েছে, বারবার ডাকাডাকি করলেও উঠতে চায় না। বুনো ধরনের ঘুম ওর, কাপড়-চোপড় এলামেলো করে দু'পা মুড়ে ঘুমোয়। স্নান করে বেরিয়ে এসে চায়ের কাপ ওর মাথার কাছে রাখি। বাবা মারা যাবার পর থেকেই আমি এমন সংসারী হয়েছি, খানিকটা বুড়োটে হয়ে গেছি জানি। সেইজন্যই মায়াকে ওর জলের মতো জীবন কাটাতে দিতে চাই। তাছাড়া ওকে কত সুন্দর দেখতে। আমি যদি মায়া হতাম, আমার এক এক সময় মনে হয়। এক একদিন রাত্রে আমি যখন সংসার খরচের হিসেব লিখি, তখন হিসেব না মিললে আমার রাগ হয়, তারপরেই হাসি পায়, মনে হয় যদি আমিও মায়ার মতন এখন পাশের ঘরে বসে রেডিওর নব্ ঘুরিয়ে ট্যাঙ্গো নাচের বাজনা শুনতে পারতাম! কখনো কখনো নীচতলার ভাড়াটে ভুবনবাবু এসে বলেন, 'ছায়াদেবী, আমাদের নর্দমা দিয়ে জল সরছে না —একটা ব্যবস্থা করুন। তাছাড়া আপনাদের বারান্দা দিয়ে জল ঢাললে আমাদের রান্নাঘরের পাশে ছড়ছড় করে পড়ে। আমি তো বাড়িতে প্রায়ই থাকি না —হেঁ হেঁ, বুঝতেই পারছেন, কিন্তু আমার ওয়াইফ বললেন, যখন মাস মাস ভাড়া গুনে যাচ্ছি, তখন অসুবিধে ভোগ করবো কেন? তুমি বাড়িউলিকে বলো! (বাড়িউলি শব্দটা উচ্চারণ করেই টুথব্রাস-গোঁপওয়ালা ভদ্রলোক লজ্জা পান। আমার সম্পর্কে ওরা নিজেদের মধ্যে যে ভাষা ব্যবহার করে তাই বেরিয়ে পড়েছে হঠাৎ। ছিপছিপে, চশমা-পরা, এম. এ. পাশ যুবতী যদি বাড়ির মালিক হয়—তা হলে যে তাকে সামনাসামনি বাড়িউলি বলা যায় না, এ বিশ্বাস ওর আছে মনে হলো।) তখন ইচ্ছে হয় উঠে গিয়ে ঠাস্ করে লোকটার গালে চড় মারি। তার বদলে আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি মায়া আছে কিনা। ও থাকলে চড় না মেরেও নিশ্চিত ঝগড়া বাধিয়ে দিতো। আমি শান্তভাবে বলি, 'আপনি একটা লোক ডেকে ব্যবস্থা করুন, খরচ যা হয় ভাড়া থেকে কেটে নেবেন।' লোকটা তখনও নড়তে চায়না, বুঝতে পারলুম, পর পর সাতদিন নাইট ডিউটি দেবার পর আজ ওর ছুটি—ভাঁজ-করা কাপড়ের লুঙ্গি-পরা লোকটা চেয়ারের দিকে গুটিগুটি এগোয়—আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বলি, 'একটা মিস্ত্রি পেলে আমাদের বারান্দাটাও সারিয়ে নেবেন।'

আমাদের সবচেয়ে খারাপ লাগে ভিড়ের ট্রাম-বাস। হাজার হাজার নিঃশ্বাসের গরমে আমার প্রাণ বেরিয়ে আসতে চায়। ইচ্ছে হয়, 'ডাকাত ডাকাত' বলে চেঁচিয়ে উঠি। লোকগুলো আমাকে প্রাণে মারতে চাইছে। কিন্তু উপায় নেই, ঠিক দশটার সময় আমাকে অফিসে যেতে হয়। কাজ ভালো লাগে না, পাবলিসিটির ফার্মের কাজ। নানা লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে হয়, লে আউট, ব্লক, কপি, ম্যাট, বিজ্ঞাপনের উমেদার, আর্টিস্ট, মাঝে মাঝে ছোটোখাটো কাগজ থেকে ছেলেরা আসে। প্রথমে আমার কবিতা চায় একটা, তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিজ্ঞাপনের কথা বলে। রাগে আমার শরীর জ্বলে যায়, কিন্তু আমার এই-ই চাকরি, সুতরাং, মিষ্টি করে হাসি, বলি, 'বিজ্ঞাপনের বাজেট তো শেষ হয়ে গেছে ভাই, এপ্রিলের আগে আর তো হবে না! কবিতা অবশ্য দিতে পারি —পনেরো পাতা ছাপবেন?' ছেলেগুলো 'কিন্তু কিন্তু' করে হাসে, তারপর 'নেক্সট উইকে আসছি' বলে সরে পড়ে। তবু এ চাকরিটা একদিক থেকে ভালো, অন্য ঝামেলা নেই, ওপরের অফিসারদের মাঝে মাঝে গাড়ি করে পৌঁছে দেবার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারলে ছুটির পর সত্যিই ছুটি। কিছুদিন কলেজে প্রফেসারি করেছিলাম, হাজার প্রশ্ন

সেখানে —বাড়িতে পুরুষমানুষ নেই কেন, কার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করি, কারা সব বাড়িতে আসে — অসহ্য!

আমি তো তবু ইচ্ছে মতন চাকরি বদলাতে পারছি। আর তাপস? একটা ইস্কুলে চাকরি করতো, ঝগড়া করে ছেড়ে দিয়েছে, তারপর আজ প্রায় দেড় বছর বেকার। ছি, ছি, ছেলেদের এতদিন বেকার থাকা মোটেই মানায় না। কিন্তু তাপসের তো দোষ দিতেও পারিনা, ওতো চেষ্টাও কম করছে না। তাপসের মাথা খুব ভালো ছিল, মন দিয়ে পড়াশুনো করলে ব্রিলিয়ান্ট স্কলার হতে পারতো, তবু যাই হোক ইংরিজিতে অর্নাস নিয়ে বি. এ. তো পাশ করেছিল। শরীরে কোনো রোগ নেই, শক্ত স্বাস্থ্য, বি. এ.-পাশ একজন ছেলে কোনো চাকরি পাবে না? ব্রিলিয়ান্ট স্কলার তো অন্য অনেকেই হয়, কারুকে কারুকে তো লেখকও হতে হবেই, কিন্তু সে কোনো জীবিকার সন্ধান পাবে না? ইস্কুলের চাকরিটা হারাবার ব্যাপারেও তাপসের কোনো দোষ নেই। পড়াবার সময় ও ক্লাসে বসে সিগারেট খেতো —তাই নিয়ে হেডমাস্টারের সঙ্গে ওর ঝগড়া। অঙ্কের মাস্টার কিংবা পণ্ডিতরা ক্লাসে বসে নস্যি নেয় তাতে কোনো দোষ নেই, আর ইংরেজির মাস্টার ক্লাসে বসে সিগারেট খেলেই দোষ? ছেলেরা দেখে দেখে শিখবে? ক্লাস থেকে বেরুলে ছেলেরা আর কারুকে সিগারেট খেতে দেখে না? বাবাকে দাদাকে দেখে না? ছেলেরা অনেক কিছু না দেখেও শেখে। শিখবেই —সে সব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি? ইস্কুলে এসে লেখাপড়াটা ঠিকমতো শিখছে কিনা সেটুকু অন্তত দেখলেই যথেষ্ট। আসলে, শুধু সিগারেট খাওয়া নয়, তাপস যে হেডমাস্টারের কথা নত মস্তকে মেনে নেয়নি, সেইটাই আসলে দোষ। প্রবীণ হেডমাস্টার যখন সিগারেট খাওয়া নিয়ে আপত্তি করেছিলেন, তখন তরুণ শিক্ষকের উচিত ছিল লাজুক মুখে নোখ খুঁটতে খুঁটতেবলা, ভুল হয়ে গেছে স্যার, আর করবো না। প্রধান শিক্ষককে অন্য শিক্ষকরা শ্রদ্ধা করবে, এইটাই তো নিয়ম। কিন্তু শ্রদ্ধা করবেই বা কি করে? হেডমাস্টার মশাই তাপসকে একটা চিঠি লিখেছিলেন বাংলায়, তাপস সেটা আমাদের দেখিয়েছিল হাসতে হাসতে, চোদ্দ লাইনের চিঠিতে পাঁচটা বানান ভুল, গোটা দশেক ইংরেজী শব্দ। হেডমাস্টার মশাই ইতিহাসের লোক—তাই তাঁর চিঠিতে বানান ভুল থাকবে? একটা গোটা বাংলা চিঠিও লিখতে জানবেন না? এদের হাতে শিক্ষার ভার, এরা প্রধান শিক্ষক, এদের লোকে শ্রদ্ধা করবে কি করে? নিজেদের বানান ভুল না সুরে অন্যের সিগারেট খাওয়ার দোষ ধরতে এসেছে!

তাপস আর একটা ইন্টারভিউ'র গল্প বলেছিল, শুনে হাসতে হাসতে আমরা মরি। রেলওয়ের গুডস ডিপার্টমেন্টের একটা কেরানীর চাকরি। কেরানীর চাকরি, তারই ইন্টারভিউ নিচ্ছে পাঁচজন জাঁদরেল অফিসার। তিনজন বাঙালী, একজন পাঞ্জাবি, একজন মাদ্রাজী। ইন্টারভিউতে ডাকা হয়েছে শ'খানেক ছেলেকে, তার মধ্যে এম. এ. —পাশই গোটা দশেক। তাপস ঢোকার পর —সবাই নিবিষ্টভাবে ওর অ্যাপ্লিকেশনটা পড়তে লাগলো। রেলের চাকরির অ্যাপ্লিকেশানে নাকি চোদ্দ পুরুষের ঠিকুজী কুষ্টি সব দিতে হয়, তবু ওদের একজন তাপসকে আবার নাম, বয়েস, কতদূর লেখাপড়া এসব জিজ্ঞেস করলো। তাপস কোনো গোলমাল না করে উত্তর দিয়েছে। গোঁপওয়ালা পাঞ্জাবিটি বললো, 'তোমার তো স্বাস্থ্য বেশ ভালোই আছে, তুমি এ চাকরি করতে এসেছো কেন?'

তাপস বললো, 'একটা কোনো চাকরি তো করতে হবে। আর কোনো চাকরি পাচ্ছি না।'

—তুমি এ কাজ পারবে?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি দায়িত্বের সঙ্গে সব কাজ করবো এবং নিশ্চিত আশা করি, আমার কাজে আপনাদের খুশী করতে পারবো।

অর্থাৎ তাপস বেশ বিনীতভাবেই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একজন আচমকা জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি জানো, আকবর কত সালে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন?'

তাপস চমকে গিয়েছিল, তবু বিনীতভাবেই বলেছে, 'ঠিক মনে নেই। এ চাকরির পক্ষে এটা জানা খুব দরকারী কি?'

—এসব সাধারণ জ্ঞান। সমস্ত শিক্ষিত লোকেরই জানা উচিত।

—না, আমি ঠিক জানি না।

—পৃথিবীতে তুলোর চাষ সবচেয়ে বেশি কোথায় হয়?

—এটাও আমি ঠিক জানি না। পরে জেনে নিতে পারি।

—ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো। নেক্স্ট।

এইবার তাপস জেগে উঠলো। টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে বললো, 'স্যার আমার ইন্টারভিউ হয়ে গেল? আমার চাকরি খুবই দরকার, আমার ইংরিজি লেখার পরীক্ষা নিলেন না?'

—তোমার হয়ে গেছে, তুমি যেতে পারো।

— না স্যার, অত সহজে আমি যাচ্ছি না। আমিও দু' একটা সাধারণ জ্ঞানের কথা আপনাদের কাছে জেনে যাবো। বলুন তো, সিরাজদৌল্লার বাবার নাম কি? আমি এটা জানি। আপনি জানেন?

—বলছি তো তুমি এখন যেতে পারো, বেয়ারা।

—মাইরি আরকি, বেয়ারা ডাকলেই আমি যাচ্ছি? ওটা খুব শক্ত, না? আচ্ছা, বলুন তো, কোন্ সালে প্রথম বাষ্প এঞ্জিন চলেছিল? বলুন।

—বেয়ারা, বাবুকো দরজা দেখা দেও।

—ওসব বেয়ারা ফেয়ারা ডেকে কোনো লাভ হবে না। একটা সাধারণ জ্ঞানের কথা আমি জেনে যাবোই। তোমাদের মধ্যে কার ক্যান্ডিডেট ঠিক করা আছে আগে থেকে?

— বেয়ারা, দরওয়ানকো বোলাও।

—আবার দরওয়ান দেখানো হচ্ছে। ও কথার জবাব না পেলে আমি এখানে ডিগবাজি খাবো, কাপড় খুলে নাচবো, তোমাদের থুতনিতে চুমু খাবো। ইয়ার্কি পেয়েছো সালারা? তোমাদের গুষ্টির পিণ্ডি করবোআজ!

শেষ পর্যন্ত দরওয়ানরা এসেই ওকে টেনে হিঁচড়ে বার করে দেয়। তাপস অনবরত আস্ফালন করতে থাকে —সেই ইন্টারভিউ বোর্ডের পাঁচজনের ও সর্বনাশ করে দেবে!

কিন্তু কিছুই সর্বনাশ তাপস ওদের করতে পারে নি। ওরা মোটর গাড়িতে চেপে ঘোরাঘুরি করে। সাহেব পাড়ায় থাকে, ওদের সমাজ আলাদা —দুর্গের মতন সে সমাজ সুরক্ষিত। তাপসরা সেখানে কিছুই করতে পারে না। তাপস অবশ্য এখনো শাসায় ও আর সারাজীবনে রেলে চড়ার সময় টিকিট কাটবেন, সুযোগ পেলেই রেলের বাথরুমের আয়নার কাচ ভাঙবে, বাল্‌ব চুরি করবে। কিন্তু তাতে ওদের কি ক্ষতি হবে?

তাপস আজও চাকরি পেলো না, আমার বড় মায়া লাগে —যখন তাপস বন্ধুদের কাছে গাড়ি-ভাড়া চায়। যে-রকম সাংঘাতিক লেখক হিসেবে তাপসের নাম, ঐটুকু নামেই যে-কোনো ইংরেজ লেখ লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করতো। এক একদিন তাপসের মুখখানা শুকনো দেখায় —বড় বেশি গম্ভীর

গম্ভীর থাকে —সেই সব দিন ওকে দেখলে ভয় করে, মনে হয়, ও যেন কোনো ভয়ংকর সর্বনাশের প্রতীক্ষায়আছে।

কিন্তু তাপসের কথা আমি ভাবছি কেন? তাপস নিষ্ঠুর, তাপস আমাকে গ্রাহ্য করে না। সেই এক দুপুর বেলা এসেছিল, তারপর থেকে আর আসেনি কখনো একা, ও আর আমাকে একা এসে দেখতে চায় না। আমিই কাঙালিনীর মতন ওর কাছে গিয়েছিলাম কয়েকবার, কী নির্লিপ্ত আর উদাসীন ওর ব্যবহার, একদিন শুধু সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিল, আয় ছায়া তোকে একটা চুমু খাই। বলার সঙ্গে সঙ্গেই, আমার অনুমতির অপেক্ষা না করেই ঝট করে এগিয়ে এসে আমায় চুমু খেলো, তারপর চলে গেল। যেন হঠাৎই ওর আমাকে চুমু খাওয়ার কথা মনে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে সেটা চুকিয়ে নিলো, আবার পর মুহূর্তেই ভুলে গেল আমার কথা। এই মানুষকে কেউ সহ্য করতে পারে? না। তাপস আমার কেউ না। এর চেয়ে বিমলেন্দু অনেক ভালো, বিমলেন্দু অনেক নির্ভরযোগ্য। ওর চোখের দৃষ্টিতে একটা সান্ত্বনা আছে।

কোনো কোনো দিন বিমলেন্দু খোঁজ করে অফিসে, 'ছায়াদি, আজ বিকেলে কি করছো, একটা ফিল্মে যাবে নাকি?' বাইবেল হাইসের বারান্দার নিচে বুক-খোলা শার্ট গায়ে বিমলেন্দু দাঁড়িয়ে থাকে। একটু নার্ভাসভাবে সিগারেট টানে। আমার জন্য কেউ দাঁড়িয়ে আছে ভাবলেই আমার গা শিরশির করে —আমার শ্বেতির দাগ-ধরা ঠোঁট জ্বালা করে ওঠে যেন। দূর থেকে যখন হেঁটে আসি হাওয়ার বিপরীত দিক দিয়ে, শাড়ি উড়তে থাকে, বিমলেন্দুকে দেখে আমার লজ্জা করে, কেন লজ্জা করে ঠিক জানি না। সিনেমার অন্ধকারে বসে অন্যমনস্কভাবে বিমলেন্দু আমার বাঁ দিকের বুকে চাপ দেয়। আমিও মাঝে মাঝে ওর হাত ধরে খেলা করি। এক এক সময় ওর কোলের ওপর হাত রাখি। —বোকা, অত্যন্ত বোকা ছেলেটা, বোক —। আমি হাত সরিয়ে নিইনা। আমার ভালো লাগে। বিমলেন্দুকে কোনদিন চূড়ান্ত প্রশ্রয় দিইনি। কখনো ইশারাও জানাইনি। দেখতে চাই, ও কি করে। কোনোদিন হঠাৎ হুড়মুড় করে আমায় জড়িয়ে ধরে কিনা। অথবা এমন হতে পারে আমি বিমলেন্দুকে পছন্দ করিনা, আসলে ওকে দুচোখে দেখতে পারিনা। ওর ঐ নির্লিপ্ত, হাঁসের পালকের মতো মুখ —কেন কোনো মেয়েকে দেখায়? কেন বিমলেন্দু আসে আমার কাছে, ওর কি আর কোনো মেয়ে-বন্ধু নেই, না ও আমাকে ভালোবাসে? নাকি ও আমাকে নিঃসঙ্গ মনে করে সঙ্গ দিতে আসে? বিমলেন্দু আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত,— গল্প কবিতা দুটোই ভাল লেখে, প্রবন্ধ সমালোচনার দিকেও আছে, বড় কলেজের জনপ্রিয় অধ্যাপক। প্রবীণ লেখকরা আমাদের মধ্যে বিমলেন্দুকে দেখলেই সাগ্রহে চিনতে পারে —আমাকেও চেনে অনেকে, সেটা আমি মেয়ে বলে। কিন্তু বিমলেন্দুকে আমি বোধহয় চাইনা, আমি চাই একটা ছটফটে, দুর্দান্ত, কেয়ারলেস যুবক —কার মতো? কার মতো? অবিনাশের – না, অম্লানের মতো, একটু আনন্দ হলেই যে কোমর থেকে বেল্টখানা খুলে বোঁ বোঁ করে ঘোরায়।

যে-সব বিকেলে বিমলেন্দু আসেনা, সাধারণতঃ কোনো কাগজের অফিসে যাই, অথবা বাড়ি ফিরে আসি, মায়া সন্ধ্যের পর বাড়ির বাইরে থাকে না, দুজনে বসে দাবা খেলি। পিসিমা চায়ের সঙ্গে গরম গরম ফুলকপি বা ওমলেট ভাজা দেন। রাত্রে খাওয়ার পর লিখতে বসি, অনেক লেখা পছন্দ হয় না, ছিঁড়ে ফেলি, কিন্তু প্রত্যেকদিন কিছু না-কিছু না লিখলে আমার ভাল লাগে না।

রাত্রে ঘুম আসে না, সারারাত ঘুমের কথা ভাবি। এক এক রাত্রে আমার শয্যাকণ্টকী হয়, বিছানায় কোনো জায়গায় শরীর ছোঁয়াতে ইচ্ছে করে না, অসহ্য বমি বমি লাগে। মনে হয়, মা আমার পাশে শুয়ে আছে। মায়ের জন্য কষ্ট হয়।

এইরকম আমার জীবনের দিন কাটে। কিন্তু কিভাবে কাটাতে চাই? আমার ইচ্ছে করে না চাকরি করতে, ইচ্ছে হয় সকাল ন'টা পর্যন্ত ঘুমোই, ইচ্ছে হয়, প্রতি কথায় গালাগালি করি, রাস্তাঘাটের বখা ছেলেরা যে-রকম মুখ-খারাপ কুৎসিত কথা বলে, আমারও ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে সেই রকম বলি,

'দূর শালা, দূর —ছাপার অযোগ্য, তোমার ইয়েতে ইয়ে দিই' —ইচ্ছে হয় খারাপ মেয়ের মতো কোমর দুলিয়ে হাঁটি —কখনো এসব বলতে বা করতে পারবো না, তবু ইচ্ছে হয়, আয়নার সামনে এইরকম ভঙ্গী করে দেখি। ইচ্ছে করে, সারাদিন শুধু শায়া আর ব্লাউজ পরে থাকি। দুটো ষণ্ডামার্কা চাকর থাকবে —হুকুম মতো তারা আমার ফুটফরমাস খাটবে, ধমকালে কুঁকড়ে যাবে, সাহস করবে না চোখের দিকে তাকাতে। ইচ্ছে করে, গোপনে তাপসের বুকে ছুরি বসিয়ে দিই। কিংবা নিজের বুকে।

এছাড়া, একা একা কান্না পায়। মায়া না থাকলে আমি বাড়িতে শুয়ে কাঁদি। আসলে সারাদিন আমি কি করি, তা জানি না। আমি কি করতে চাই, তা জানিনা। আমি খুবই শিগগির মরে যাবো, জানি। আমার কান্না পায়। মা, তোমার জন্য আমার বিষম মন কেমন করে।

অনিমেষ

একটু সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল তাই মাঠের মধ্য দিয়েই জিপ চালিয়ে দিয়েছিলাম। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'রণছোড়, তোমার ফিরে যাবার তেল আছে তো?' কথাটা জিজ্ঞেস করার পরই আমার লজ্জা হলো। প্রায়ই আমি ভুলে যাই যে, ও বোবা। রণছোড় ওর বিশাল দুটো চোখ মেলে আমার দিকে তাকালো। বুঝলাম, আছে। বোবা বলেই কি রণছোড়ের চোখদুটো এত বড়–? ওর চোখ সব কথার উত্তর দিতে পারে —কোনো মেয়ের চোখও এত পারে না। তাছাড়া ওর চোখের ভাষাও খুব সরল, শিশুরাও বুঝতে পারে। কিন্তু মেয়েদের চোখের ভাষা পড়তে হলে আলাদা বিদ্যে লাগে–আমার তা নেই।

দূর থেকে আমার বাড়িটা দেখতে পেলাম। সব ঘরে আলো জ্বালা। গায়ত্রী সব ঘরে আলো জ্বেলে রাখতে ভালোবাসে। একটা জানলায় ও বসে আছে? ও কি আমার জন্য বসে আছে ঐ নাকি আলোজ্বালা ঘরে বসে দূরের অন্ধকার দেখতে ভালো লাগে। একটা কুকুর ডেকে উঠলো প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ করে। ডাকটা খুব মানিয়ে গেল। দূরে আলোজ্বালা বাড়ি, মাঠে অন্ধকার, অন্যমনস্ক নীল আকাশ–এর মধ্যে একটা কুকুরের ডাক না থাকলে মানাচ্ছিল না।

আজ সকালে অবিনাশ একটা চিঠি লিখেছে। কতবার বলেছি, অফিসের ঠিকানায় চিঠি দিতে — বাড়িতে নয়, ওর খেয়াল থাকে না। গায়ত্রীর একটা খারাপ স্বভাব আছে – চিঠি খুলে পড়া। কলকাতার মেয়েরা এসব করে না —স্বামীর চিঠিও খোলে না। কাশীর মেয়েদের এ শিক্ষা নেই। আমার বন্ধুবান্ধবদের চিঠি গায়ত্রীর পক্ষে হজম করা একটু শক্ত। গায়ত্রী বলেছিল, 'কী অসভ্য আর কাঠখোট্টা তোমার বন্ধুগুলো। লিখেছে, মল্লিকাটা মারা গেছে! একটা মেয়ে —তাও মারা গেছে, তার সম্বন্ধে 'মল্লিকাটা' কি?' কী ভাগ্য আমার, মল্লিকা সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখেনি, তাই আমি বললুম, 'মল্লিকা হলো শেখরের ছোট বোন। খুব বাচ্চা তো —আর অবিনাশ ওকে খুব ভালোবাসতো, ওদের বাড়ি গেলেই খেলা করতো —তাই।' মল্লিকা মারা গেছে সে খবর আমাকে জানাবার দরকারই বা কী ছিল —মল্লিকার কাছে আমি কখনও যাইনি, ওদের মুখেই নাম শুনেছিলাম, তাপস খুব বলতো —তাপসের বোধহয় ঐ বেশ্যাটির উপর সত্যিই খুব টান ছিল। আর অবিনাশের তো সবাইকেই ভালো লাগে। মেয়েটা নাকি কোন্ বিখ্যাত অভিনেতার বে–আইনী মেয়ে।

অবিনাশ লিখেছে, 'পরীক্ষিৎ ভালো আছে। মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলেছে।' ওঃ সেদিনের রাত্রের কথা বাললেও ভয় হয়। পরীক্ষিতের ওরকম মদ খাওয়া নিয়ে হৈ চৈ করা আমি মোটেই পছন্দ করি না এইজন্য। আর মদ খেয়ে ব্রীজের রেলিঙে বসা কেন? অপঘাতে মৃত্যুই পরীক্ষিতের নিয়তি। হঠাৎ একটা আর্তস্বর —তারপরেই নীচের নদীতে শব্দ। গায়ত্রী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিল, ফিরে এসে ব্রীজের কোণে দাঁড়িয়ে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো। আমি কাছে যেতেই বললো, 'আমার আজ কেন জানি না ভালো লাগছে না, বোধহয় শরীরটা খারাপ, না —এলেই হতো মনে হচ্ছে।' এই সময় ঐ কাণ্ড। হা–হা–হা করে চারপাশের দোকান–জঙ্গল–মন্দির থেকে নিমেষে কয়েক শো লোক ছুটে এলো। আমরা

দুজনে দৌড়ে এলাম। আমি ছুটে গিয়ে ওর হাত চেপে ধরে বললুম, 'কী হয়েছে?' 'পরীক্ষিৎ পড়ে গেছে —হাত ছাড়ুন, ওকে খুঁজে আনি।' কথাটা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। পরীক্ষিৎ পড়ে গেছে —আর অবিনাশ এখান থেকে লাফিয়ে পড়বে তাকে বাঁচাবার জন্য? কোনটা বেশি ভয়ংকর, পরীক্ষিতের পড়ে যাওয়া, না অবিনাশের এখান থেকে লাফিয়ে ওকে খোঁজা —আমি এক মুহূর্তে বুঝতে পারলুম না। এখান থেকে লাফালে কেউ বাঁচে? পরীক্ষিতের এতক্ষণে কি হয়েছে কে জানে। এর নাম বন্ধুত্ব —অবিনাশের মতো ওরকম অকপট দুঃসাহসী আমি আগে কখনো দেখিনি। আমি আর গায়ত্রী দুজনে ওর হাত চেপে ধরলুম প্রাণপণে। অবিনাশ হ্যাঁচকা টান মারতে মারতে বললো, 'ছাড়ুন না, আমার কিছু হবে না। দেখি ওকে বাঁচানো যায় কিনা।' শেষ পর্যন্ত চা-ওয়ালা বিষ্টু ওকে জোর করে পাঁজাকোলা করে নামিয়ে এনে বললো, 'পাগল হয়েছেন আপনি মশাই, চলুন ব্রীজের নীচে যাই।' আমি এক ফাঁকে তাকিয়ে দেখলুম, ব্রীজের নিচে অন্ধকার, ভাঙা চাঁদের আলো, আর কিছু নেই। পরীক্ষিৎকে দেখা যাচ্ছে না। আমাদের সামনে সকলের আগে ছুটে গেল অবিনাশ, জামা-কাপড় খুলে সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

আমি এসব উত্তেজনা সাইতে পারিনা, এমন ছুটোছুটি চিৎকার। পরীক্ষিৎ মরে গেছে, একথা ভেবে আমার বুকের মধ্যে দ্রিমদ্রিম করে শব্দ হচ্ছিল। আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়িনি, পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, তার কারণ আমি সাঁতার জানিনা। ওরা কি কেউ ভাবলো, আমি শীতের ভয়ে জলে নামলুম না? বা প্রাণের ভয়ে? আমি সাঁতার জানিনা, একথা গায়ত্রীও হয়তো জানে না। ওর সামনে কখনো নদীতে বা পুকুরে স্নান করেছি বলে মনে পড়ে না। আমি ছেলেবেলায় একবার জলে ডুবে গিয়েছিলাম —সেই স্মৃতি আমি কখনো ভুলি না। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, পরীক্ষিৎ জলের নীচের নীল অন্ধকারে কী যেন খুঁজছে। বাতাস —এইমাত্র ওর বুক থেকে যে শেষ বাতাস ও বার করে দিয়েছে সেটুকু আবার ফিরিয়ে আনা যায় কিনা প্রাণপণে খুঁজছে। ওর জন্য বুকভর্তি বাতাস নিয়ে অবিনাশ গেছে। পরীক্ষিতের মুখের মধ্যে ফুঁ দিয়ে অবিনাশ বাতাস ঢুকিয়ে দেবে। আমিও বুক ভর্তি বাতাস নিয়ে পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি —আমি জলে নেমে পড়ার সাহস পেলুম না।

পরীক্ষিৎ মরার ছেলে নয়, একসময় ও দেশবন্ধু পার্কে ছেলেদের সাঁতার শেখাতো। যখন খুব পয়সার দরকার, পরীক্ষিৎ তখন দেশবন্ধু পার্কের পুকুরের ছোট দ্বীপটায় মাথায় একটা তোয়ালে বেঁধে দাঁড়িয়ে চেঁচাতো—'কে কে সাঁতার শিখবে, দু'আনা দু'আনা, ছুটে এস ছেলেরা, দু আনা দু আনা, সাতদিনে পুকুর পার করা শিখিয়ে দেব, দু আনা, সাতদিনে পুকুর পার করা শিখিয়ে দেব, দু'আনা দু'আনা – তখন পুকুরটা এরকম বাঁধানো ছিল না —ভাঙাচোরা। গরমের দিনে ছেলেরা বিকেলে এসে দাপাদাপি করতো, মন্দ আয় হতো না পরীক্ষিতের। দিনে বার-চোদ্দ আনা। মাঝে মাঝে একডুবে পুকুরের মধ্য থেকে মাটি তোলার খেলা দেখাতো। সুতরাং, জলে ডুবে মরা পরীক্ষিতের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু আচমকা অত উঁচু থেকে পড়ে যাওয়া, তাছাড়া এসব পাহাড়ী নদীতে আগাগোনা পাথর ছড়ানো, মাথায় আঘাত লাগলেই আর বাঁচার আশা নেই।

— অবিনাশ জলে ঝাঁপিয়ে খানিকটা খোঁজাখুঁজি করতেই —আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'ঐ যে, ঐ যে।' ব্রীজের একটা থাম ধরে পরীক্ষিৎ জলে ভেসে ছিল, অন্ধকার মুখে একটাও শব্দ নেই। চা-ওয়ালা বিষ্টু আর অবিনাশ ওকে ধরে নিয়ে এলো পাড়ে। রক্তে জল ভেসে যাচ্ছে —পরীক্ষিতের তখনও জ্ঞান ছিল, —বললো, 'আর বেশিক্ষণ থাকতে পারতুম না, মাথায় খুব লেগেছে।' হাসপাতালে পৌঁছুবার আগেই ও অজ্ঞান হয়ে পড়ল। ভয়ংকরভাবে ওর মাথা কেটে গেছে, অবিনাশ ওর মাথাটা চেপে ধরে আছে, চুঁইয়ে চুঁইয়ে তবু পড়ছে রক্ত, ডাক্তারের সামনে গিয়ে যখন অবিনাশ হাতটা তুললো, ওর দুই হাতের পাঞ্জা টকটকে লা—। আঙুল বিস্ফারিত করে অবিনাশ ওর ডান হাতের লাল পাঞ্জা আমার চোখের সামনে তুলে ধরলো। মুখে কোনো বিকার নেই —আমার মাথা ঝিম ঝিম করে উঠেছিল।

— খাওয়া শেষ করে একটা পাইপ ধরিয়ে জানলার পাশে বসলুম। পাইপ খাওয়া নতুন শিখেছি —বেশ চমৎকার লাগে একা একা। গায়ত্রী টুকিটাকি কাজ শেষ করছে। অনেকদিন কিছু লিখিনি। লেখার কথা ভাবলেই বুকের মধ্যে কি রকম যেন একটা শব্দ হয়। সিনেমার থীম মিউজিকের মতো। বেশ তো ঘুরছি ফিরছি —গায়ত্রীকে আদর করছি, বন্ধু-বান্ধবের কথা ভাবছি, নদী দেখলেই পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছি —তবু মনে হয়, কতদিন একটাও কবিতা লিখিনি —অমনি বুকের মধ্যে ঐ থীম মিউজিকটা ফিরে আসে। সুরটা দুঃখের নয়, রাগের, যে যে জিনিসকে ভালো লেগেছিল তাদের উপর অসম্ভব রাগ হয়! মনে হয়, তোমাদের ভালো লেগেছিল —তোমাদের তবে কবিতায় আনতে পারলুম না কেন, কেন আমার ভাষা গরীব হয়ে যায়। মনে হয়, হেরে গেলুম —কার কাছে —ঈশ্বরের কাছে, এই গাছপালা, পাহাড়, নদী, আকাশ যে-ঈশ্বরের ভাষা, তার কাছে —তখন মনে হয়, গাছের ছাল ছাড়িয়ে দেখি, ফুলের সমস্ত পাপড়ি খুলে ফেলি। গায়ত্রীর সঙ্গে রাত্রের কাণ্ড করি আমি আলো জ্বেলে, ওর সমস্ত কাপড়-জামা খুলেও ঐ স্ত্রী-শরীরের দিকে তাকাতে আমার ইচ্ছে করে না —ইচ্ছে করে ওর ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নিই, বুকটা ফাঁক করে দেখি, কেন ঐ বুকে মুখ রাখতে আমার ভালো লেগেছিল।

কেন, কেক, কেন-এর উত্তর খুঁজতেই সময় কেটে যায়। কেন এটা সুন্দর, কেন ওটা কুৎসিত এ প্রশ্ন নয়, কেন এটা আমার ভালো লাগলো, কেন ওটা আমার ভালো লাগেনি —এই অসঙ্গত প্রশ্ন। ভালো লাগে, তবে বিশেষ কিছুই আজকাল নতুন লাগে না। সবই মনে হয় আগে দেখেছি। যে-কোনো দৃশ্য, যে-কোনো মানুষ দেখলেই মনে হয়, আগে ওদের দেখেছি। যদি কখনো বিলেত আমেরিকায় যাই, তা হলেও আমার নিশ্চিত ধারণা, সেখানকার সব কিছু দেখেই আমার ধারণা হবে, এসব আমি দেখেছি অনেক আগে। বহু আগেই এসব আমার দেখা। তবে কি যারা এ্যাটম বোম বানাচ্ছে —তারা কবিদের চেয়েও বড় প্রজাপতি —তারা ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ধ্বংস করার চ্যালেঞ্জ নিয়েছে, ওরাও সৃষ্টি করছে — ধ্বংসের দৃশ্য, দৃশ্য হিসেবে তাও নতুন, স্নায়ু আর মাথার ধূসর পদার্থের কম্পনে মানুষ অনেক ধারণা, রসের স্বাদ পেয়েছে —কন্তু অ্যাটম বোমওয়ালারা একটা নতুন রসের সন্ধান দিয়েছে —সামগ্রিক মৃত্যুচিন্তা —এতদিন মানুষ শুধু নিজের মৃত্যু বা প্রিয়জনের মৃত্যুর কথা ভেবেছে —সাহিত্যেও ঐসব মৃত্যুর কথা — কিন্তু একটা মহাদেশ বা সমস্ত মানুষ জাতটার জন্য মৃত্যুভয় আমি একা একা ভোগ করছি এখন। সাহিত্য এর ধাক্কা সামলাতে পারছে না। প্রথম অ্যাটম বোমা ফাটার পরীক্ষার সময় ওপেনহাইমার বিড়বিড় করে ভগবদ্‌গীতা আউড়েছিল। আমি তো গীতা পড়ে ভালো বুঝতে পারিনি।

পরীক্ষিতের কবিতার বইটা উল্টেপাল্টে দেখছিলুম আর একবার। অঙ্কের মতো, নির্বোধের মতো লিখেছে —তাই ওর প্রত্যেকটি লাইন এমন জোরালো, এমন বিস্ফোরণের মতো। ওর শব্দ সম্বন্ধে কোনোই জ্ঞান নেই —শব্দ নিয়ে ভাবে না, তাই ওর প্রতিটি শব্দ অব্যর্থ। ওর চোখ ওর মাথার চারপাশে ঘোরে, যে কোনো একটা জিনিস ওকে হঠাৎ আকর্ষণ করে। আকর্ষণ? না, পরীক্ষিৎ আকর্ষণ কথাটা ব্যবহার করতো না। ও বলতো 'ডাক দেয়'। ওর ভাব খুব কম। মেয়েরাও ওকে ডাকে, ফুলও ডাকে, ভালোবাসাও ডাকে। অবিনাশ লিখতো, হ্যাঁচকা টান মারে। 'ভালোবাসার হ্যাঁচকা টানে ঢুকে গেলুম গর্তে, মৃত্যু বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু পরিবর্তে, গেলুম আধঘন্টা ক্লান্তি' —অবিনাশের সেই বিখ্যাত পদ্য যা কলেজের ছেলেরা এক সময় খুব আওড়াতো। পরীক্ষিৎকে চ্যালেঞ্জ করে অবিনাশ এক সময় গুটি আষ্টেক কবিতা লিখেছিল —প্রত্যেকটি বিখ্যাত হয়েছিল —তারপর হঠাৎ কবিতা লেখা ছেড়ে দিল। গল্পও লিখেছিল গোটা কয়েক —তা নিয়ে হৈ হৈ কাণ্ড, কী বিকট, কী অশ্লীল, সেই সব লেখা, এই রব উঠলো সাহিত্যের বাজারে। অবিনাশ বলেছিল তখন, 'একটা উপন্যাস লিখে দেশটা কাঁপিয়ে দেবো —বারোটা বাজিয়ে দেবো সাহিত্যের' —বোধ হয় দু-তিন পাতা লিখেছিলও-তারপর হঠাৎ একদিন সকালবেলা পরীক্ষিৎকে গিয়ে বলল, 'ভাই, মাফ্ কর, ওসব আমার দ্বারা হবে না, বড় ঝামেলা, আমি শান্তিতে পুরোপুরি রকম বাঁচতে চাই —কদিন ধরে উপন্যাসের কথা ভাবতে ভাবতে এমন মজে গেছি যে, কাল সন্ধেবেলায় রাস্তায় একটা সুন্দরী মেয়ে দেখে আমার উত্তেজনা হলো না, এ কী—? নিজের জীবনটা নষ্ট করে গল্পের নায়ক-নায়িকাকে বাঁচিয়ে তোলা আমার দ্বারা হবে না। নিজের জীবনের এমন চমৎকার সময়গুলো নষ্ট করে, খামোকা গল্প উপন্যাস লিখে লাভ কি? আমি ভাই ভালোভাবে খেয়ে

পরে বাঁচতে চাই। সাহিত্য–ফাহিত্য করে যত বোকার দল।' পরীক্ষিৎ বলেছিল, 'মেরে তোমার দাঁত খুলে নেব। জানোয়ার নাকি তুই, যে খালি খাবি আর –'

অবিনাশ জানে, নির্বোধ ছাড়া কেউ অমরত্বের কথা ভাবে না। যতদিন বাঁচা সম্ভব, যে রকম ইচ্ছে বাঁচবো—লিখে বা না লিখে। পরীক্ষিৎকে চিনতে ভুল হয় না —ঐরকম মদ খাওয়া, পাগলামি, হৈ হৈ —পৃথিবীর বহু কবির জীবনীতে এসব দেখা গেছে, পরীক্ষিৎকে দেখলেই মনে পড়ে আমার হফম্যানের সেই গল্পের নায়কের কথা, যে নিজের ছায়াটাকে বিক্রী করে দিয়েছিল। পরীক্ষিৎ সাহিত্য করার জন্য ওর ছায়াটা বিক্রী করে দিয়েছে। কিন্তু অবিনাশকে চেনা যায় না। তবে আত্মাটা বিশাল অবিনাশের — বিমলেন্দু ছাড়া ওরকম ক্ষমতাবান লেখক আমাদের মধ্যে কেউ নেই আমার মনে হয়। বিমলেন্দু না তাপস? পরীক্ষিৎরা বলে, 'তাপসই সত্যিকারের জাত লেখক, বিমলটা কমার্শিয়াল।'

আমার তাপসের লেখা ভালো লাগে না। ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু —কিন্তু ওর ঐ অদ্ভুত নিষ্ঠুরতা, কবিত্বহীনতা আমার সহ্য হয় না। তাপসকে আমি বিশ্বাস করি, ও লেখে, না কলম দিয়ে থুতু ছেটায় আমি বুঝতে পারিনা। মানুষ হিসেবেও তাপস অবিশ্বাসযোগ্য।

বিমলেন্দুকে ওরা পছন্দ করেনা, কারণ ও ছন্নছাড়া, ওর মুখ দিয়ে শিল্প সম্বন্ধে কোনো কথা বেরোয় না। আসলে বিমলেন্দু সবচেয়ে নতুন কথা লেখে। একথা আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি, সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে ওসব মদ খাওয়া কিংবা হৈ–হল্লোড়ের কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষের মধ্যেও যেমন একদল মদ খায় না, একদল খেতে ভালোবাসে, লেখকদের মধ্যেও তাই। আলাদা আর কোনো জাত–বিচার নেই। আমিও তো মদ–টদ খেতে ভালোবাসি না, বিমলেন্দু তো একেবারেই খায় না। ওর সঙ্গে আমার আলাপ অদ্ভুতভাবে। ও তখন 'অরুণোদয়' কাগজে সহ–সম্পাদকের চাকরি করে। হস্টেলে থাকি, আমি তখন কবিতা লিখতাম না। ওর —কাগজে একটা গল্প পাঠিয়েছিলাম, গল্পটা একজন মুমূর্ষু কবিকে নিয়ে; সেই গল্পের মধ্যে সেই কবির রচনা হিসেবে কয়েক লাইন কবিতাও ছিল। হঠাৎ একদিন বিমলেন্দু দেখা করতে এলো হস্টেলে, জিজ্ঞেস করলো, 'অনিমেষ মিত্র কার নাম?' আমরা তখন কমনরুমে টেবিল টেনিস খেলছিলাম, পরীক্ষিৎ বললো ফিসফিস করে —'ঐ ভদ্রলোক বিমলেন্দু মুখার্জি।' পরীক্ষিৎ তখন বিমলেন্দুকে খুব ঈর্ষা করে।

কবি বিমলেন্দু মুখার্জি —আমাকে খুঁচছেন? আমি প্রায় শিউরে উঠেছিলাম। বিমলেন্দু তখন থেকেই বেশ নাম–করা। তাড়াতাড়ি আমার ঘরে ডেকে নিয়ে গেলাম। ধুতির সঙ্গে ফুলশার্ট পরা, ফর্সা, শান্ত ধরনের চেহারা, কিন্তু গলার আওয়াজ শুনলে মনে হয় খুব আত্মবিশ্বাস আছে। বিমলেন্দুকে প্রথম দিন দেখেই আমার ভালো লেগেছিল ও মেয়ে হলে বলা যেতো, লাভ অ্যাট ফ্যার্স্ট সাইট। পরীক্ষিতের দিকে একবার আড়চোখে তাকালো বিমলেন্দু। বেশি ভূমিকা করলো না। পকেট থেকে সিগারেট বার করে টানতে টানতে বললো, 'আপনি 'অরুণোদয়ে' যে গল্পটা পাঠিয়েছেন, সেটা ভালো হয়নি।'

আমি অবাক। গল্প ভালো হলেও পাত্তা পাওয়া যায় না, আর খারাপ গল্পের জন্য সম্পাদক বাড়ি বয়ে এসেছে সমালোচনা করতে? আমি আমতা–আমতা করতে লাগলুম। পরীক্ষিৎ এককোণে দাঁড়িয়ে আয়নায় চুল আঁচড়াবার ভান করছিল। হঠাৎ বললো, 'আমি পরীক্ষিৎ ব্যানার্জি বলছি, গল্পটা ভালোই, আমি ওটা পড়েছি।'

'মোটেই না, ওটা যাচ্ছেতাই হয়েছে,' বিমলেন্দু বললো, 'ওটা গল্পই হয়নি, গপ্প।'

পরীক্ষিৎ প্রায় মারমুখী হয়ে এগিয়ে এলো।

'তবে, ওর মধ্যে যে ছোট্ট কবিতাটা আছে, সেটা আমি আলাদা কবিতা হিসাবে ছাপাতে চাই।' বিমলেন্দু বললো, 'কবিতাটা চমৎকার হয়েছে, এত ভালো কবিতা পরীক্ষিৎ ব্যানার্জি ছাড়া অন্য কারুর লেখা ইদানীং পড়িনি।'

বুঝলাম, আসলে পরীক্ষিতের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য এসেছিল বিমলেন্দু। আমাকে ছেড়ে ও তখন পরীক্ষিতের সঙ্গেই কথা বলতে লাগলো। তবু বিমলেন্দুকে সেই প্রথম দিনই আমার ভালো লেগেছিল।

শনিবার। আজ হাটে হরিণের মাংস উঠেছিল হঠাৎ, রণছোড়কে দিয়ে খানিকটা বাড়ি

BANGLADE.NET

পাঠিয়ে দিলাম। তারপর অনেকক্ষণ ধরে বাজারের সব দোকান ঘুরে জাফরান কিনতে ইচ্ছা হলো। নেই। মধ্যপ্রদেশের এইসব শহরগুলিতে জাফরান মেলে না। ঘি আর রসুন হাজার দিলেও জাফরান ছাড়া হরিণের মাংস জমে না। গায়ত্রী আবার হরিণের মাংস রান্না করতে জানে কিনা কে জানে। ওর বাবা ছিলেন কাশীর সংস্কৃত অধ্যাপক—কি জানি, হরিণের মাংস খেতেন কিনা। আমার বাবা রাকা মাইন্‌সে অনেকদিন ছিলেন—হরিণের মাংস খেতে বড় ভালোবাসতেন। হাজারীবাগ গেলেই কিনে আনতেন। লালচে রঙের পচানো হরিণের মাংসের গরম ঝোল রাত্রে বসে খেতাম ছেলেবেলায়, স্পষ্ট মনে পড়ে।

'হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে—জীবনানন্দর এই লাইনটা হঠাৎ অকারণেই মনে পড়লো। হরিণের মাংস খাবো ভাবতে ভাবতে একি একটা উল্টো রকমের কবিতার লাইন মনে পড়লো। বিষম গোলমেলে এই লাইনটা তারপর আধঘন্টা আমার মাথা জুড়ে রইলো। আমি হরিণটাকে খাবো, না হরিণটা আমাকে খাবে? আমি হরিণের মাংস খাবো আর হরিণটা আমাকে খাবে? আমি হরিণের মাংস খাবো আর হরিণটা খাবে আমার হৃদয়। কী স্পষ্ট সেই ছবি! আমি রান্নার তারিফ করতে করতে আরামে চিবিয়ে চুষে হরিণের মাংস খাচ্ছি, আর হরিণটা খুব গোপনে আমার হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। যদিও আমি শিকারী নই, তবু ভেবে আমার বুক শিউরে উঠলো। অসম্ভব! দরকার নেই আমার হরিণ! হরিণ! কথাটা ভেবে একটু হাসিও পাচ্ছে যদিও। এসব ভাবলে তো কোনো মাংসই খাওয়া যায় না। যখন মুর্গীর মাংস খাই, তখন মরার আগে সেই মুর্গীও কি আমাদের হৃদয়ের একটা অংশ খেয়ে যায় না? এসব ভেবে কি আমি গান্ধীবাদী নিরামিষাশী হয়ে যাবো নাকি? তা নয়, কবিতার মধ্যে আছে বলেই এ ব্যাপারটা এত মর্মান্তিক লাগছে। শিল্পের সত্য বড় ভয়াবহ। আজ অন্ততঃ হরিণের মাংস খেতে পারবো না। খালি একটা হরিণের জ্যান্ত চেহারা আর ছলছলে চোখের কথা মনে পড়ছে। হে। ঈশ্বর, আজ যদি গায়ত্রী রাগ করে বলে—'হরিণ–টরিণের মাংস আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না' — তবে খুব ভালো হয়। আমিও তাহলে একটু রাগ করে রঘুনন্দনের বৌকে অনায়াসে ওটা দিয়ে দিতে পারি। 'হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে—'। রঘুনন্দনের বৌ এর হৃদয় নেই। ও যখন বাসন মাজে উঠোনে বসে, ওর সম্পূর্ণ বুক আলগা থাকে। ঘুরতে ফিরতে আমার চোখে পড়ে, ওর কোনো হুঁশ নেই। বুকের নীচে যে–স্ত্রীলোকের হৃদয় থাকে, সে কখনও অপর পুরুষের সামনে অবহেলা ভরে নিজের বুক খুলে রাখে না। স্ত্রীলোকের হৃদয় গোপন রাখার জন্যই বুক গোপন রাখতে হয়। আসলে ও নিজের বুকের ঐ দুই চূড়ার কোনো মানে জানে না। ভাবে বুঝি কাচ্চা–বাচ্চার জন্য দু'খানা দুধ জমাবার ঘটি। গায়ত্রীরও একটা খারাপ অভ্যেস আছে, রাত্রে শোবার আগে বডিস পরে দুই বগলে স্নো মাখে। মুখে, গালে, বুকে মাখতে পারে, কিন্তু বগলে কেন? গোড়ার দিকে খাটে শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানতে টানতে ওগুলো দেখতে আমার খুব লোভীর মত ভালো লাগতো, মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরতুম। এখন চোখ জিনসিটাকে মনে হয় শরীর থেকে আলাদা। শরীর এক জিনিস চায়, চোখ তা চায় না। গায়ত্রীর শরীর আমার শরীরকে চুম্বকের মত টানে, অথচ চোখ তখনও চায় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে, অথচ—

'না, আলো নিবিও না।'

'হ্যাঁ, এখন ওঠো, কাল আবার ভোরে উঠতে হবে না?'

'না, আর একটু বসি, তুমি শোও।'

'কিছু তো লিখছো না; শুধু শুধু তো বসে আছো। তার চে'—

'না, লেখা নয়, আমার বসে থাকতেই ভালো লাগে এরকম। আজ আমার খুব মন খারাপ লাগছে।'

'কেন?'

গায়ত্রী আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। এবার ও কাঁধে হাত রাখবে আর তার পরেই কান ধরে টানতে আরম্ভ করবে। এই ওর এক উদ্ভুত আদর। কান টানা। আমি যে ওর পূজনীয় পতিদেবতা, ওর খেয়াল

থাকে না। দুই কান ধরে এত জোরে টানে যে আমার কান জ্বালা করে। আমি রাগ করে ওর নারুটা ধরে টেনে দিই। কিন্তু ওর ফরসা মুখে নাকটা এত লাল হয়ে ওঠে যে আমার মায়া হয়।

গায়ত্রী আমাকে একা রেখে দরজাটা ভেজিয়ে চলে গেল। আজ আমার মন খারাপ লাগছে একথাটা হঠাৎ বললুম গায়ত্রীকে, কিছু না ভেবে। নিজের স্ত্রীর কাছে, আজ আমার শরীর খারাপ লাগছে, বলার চেয়ে, মন খারাপ লাগছে, এ কথাটা বলা অত্যন্ত নিরাপদ। শরীর খারাপ লাগছে, শুনলেই—কী রকম লাগছে কোথায় শরীরের উপসর্গ কী—কী, ওষুধ—এরকম হাজার কথা। কিন্তু মন খারাপ লাগছে বললে অন্তত সভ্য স্ত্রীলোকেরা আর সে সম্পর্কে বেশী প্রশ্ন করে না। আসলে আমার শরীর খারাপ লাগছে না মন খারাপ লাগছে, আমি জানি না। এ সম্পর্কে তাপসের থিওরী ভারী চমৎকার! তাপস বলে, 'শরীর খারাপ আর মন খারাপ, এর সীমারেখাটা কোথা ক'জন বোঝে? আমার তো সন্ধ্যের দিকে যদি বিষম মন খারাপ লাগে, যদি মনে হয় হেরে গেছি, পৃথিবীতে আমি একা—তাহলেই বুঝতে পারি, দুপুর থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। তখন দুখানা কচুরি, খানিকটা তরকারি ফাউ আর চার পয়সার দই খেলেই বিষম চাঙ্গা লাগে। আবার মনে হয়, বিশ্ববিজয়ী। নিজেকে যখন ব্যর্থ প্রেমিক মনে হবে, তখন বুঝবি—জুতোর পেরেক উঠেছে, হাঁটবার সময় পায়ে ফুটছে, কিন্তু টের পাচ্ছিস না। জীবনে কিছুই করা হলো না—এই ধরনের উটকো মন খারাপ হলে— বুঝবি, নিশ্চিত হজমের গণ্ডগোল হয়েছে।' তাপসের এ কথাগুলো যে সম্পূর্ণ আজগুবি নয়, তা আমি মানি। তবু এ ধরনের গদ্যময় কথা পুরো মানতেও ইচ্ছে করে না। অবিনাশের কতগুলো নিজস্ব কাথা আছে। অবিনাশের একটা প্রিয় কথা হলো, প্রায়ই বলে রেগে গেলে, 'যাঃ শালা, শ্মশানের পাশে বসে ব্যবসা কর!' এ কথাটার মানে আমি বুঝতে পারিনি বহুদিন। এখনও হয়তো অবিনাশ কী ভেবে বলে, আমি জানি না। তবে বছর পাঁচেক আগে আমরা দলবল মিলে শ্মশানে বেড়াতে যেতাম। পাঁচ রকম লোককে দেখতেও ভালো লাগে—তাছাড়া বড় কারণ এই, যখন মদ খাবার জন্য জায়গার অভাব হতো, তখন বোতল কিনে নিয়ে শ্মশানে চলে যেতুম—ওখানে, আশ্চার্য, কোনোও বাধানিষেধ নেই। গঙ্গার পাড়ে বা শ্মশান-বন্ধুদের ঘরে বসে খেতুম—কেউ দেখলেও গ্রাহ্য করতো না, এমন স্বাভাবিক।

গগনেন্দ্র, পরীক্ষিৎ, শেখর, অরুণ ওরা আবার সাধুদের দলে বসে গাঁজা খেতো। 'বাঃ, বিনে পয়সায় কি ফাস্‌ক্লাস নেশা,' এই বলে গগনেন্দ্র টপিক্যালের প্যান্টপরা অবস্থাতেই ধুলোর ওপর বসে পড়তো। অয়েল পেইন্টিং? চলবে? চলুক না এক রাউণ্ড'। এই বলে গগনেন্দ্র তেলেভাজাওয়ালাকে ডেকে মাঠশুদ্ধ লোককে খাওয়াতো। অম্লানটা ছেলেমানুষ মাঝে মাঝে কাঁদতো গোপনে। একটা মড়া পোড়ানো শেষ হয়ে গেছে, মৃতের জ্যেষ্ঠ সন্তান একটা মাটির খুরিতে করে শেষ অস্থিটুকু কাদামাটি চাপা দিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিতে যাচ্ছে। আমি চুপি চুপি অম্লানকে বললুম, 'আচ্ছা মানুষের সব পুড়ে যায়, ওটা কি পোড়ে না রে? – কপাল না নাভি? ওটা কি স্টোন দিয়ে তৈরি?' অম্লান বললো, ' শোন—।' তারপর আর কিছু বলে না। আমি দেখলুম অম্লানের চোখে জল চিকচিক করছে। বললো, 'আমার বাবাকে পোড়াবার পর ওটা পাইন,জানিস্!'

'কোনটা?'

'ঐ যে ঐ অস্থি। আমি তখন অন্যপাশে বসেছিলাম—হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। ডোমটা বাঁশ দিয়ে অস্থি খোঁজাখুঁজি করছে। পাওয়া যাচ্ছে না। তখন রাত তিনটে। চিতা প্রায় নিভে এসেছে—এখানে সেখানে একটু আগুন। ডোমটা খুঁজছে খুঁজছেই। বললো, 'অস্থি-র আগুন দেখলেই চেনা যায় —অস্থির ওপরের লাল রঙের আগুন জ্বলে, একটু ঠাহর করলেই দেখতে পাবেন।' আমার তখন, জানিস অনিমেষ, বিষম পায়খানা পেয়েছিল, থাকতে পারছিলুম না, ওরকম মারাত্মক পায়খানা আমার সারাজীবনে পায়নি, আমি ভাবছিলুম কোনোরকমে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে স্নান করার সঙ্গে সঙ্গে ও কাজটা সেরে নেবো—কারণ ওরকম সময়, বাবার শেষচিহ্নটা খোঁজা হচ্ছে— আর আমি বলবো, আমার পায়খানা পেয়েছে—ভেবে দ্যাখ, এ

অসম্ভব, — কিন্তু ডোমটা বহু খুঁজেও অস্থিটা পাচ্ছে না, অথচ অস্থি পুড়ে যেতেও পারে না। আমি আর থাকতে না পেরে, এই যে পেয়েছি, বলেই এক টুকরো কাঠকয়লা তুলে মাটির চাপা দিয়ে ছুটে গঙ্গায় গেলুম। অনিমেষ জানিস, আমার বাবার আসল অস্থি বোধহয় শেষ পর্যন্ত কুকুর-বেড়ালে খেয়েছে' এই বলে অম্লান হঠাৎ রুমাল বার করে চোখ মুছতে লাগলো। ওর এই গল্পটার সঙ্গে কান্নার কী সম্পর্ক আছে ভেবে আমি তো হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। হায়, হায়, আমি যে আগাগোড়াই গল্পটা হাসির গল্প ভেবে মুখখানা হাসি-হাসি করে রেখেছিলাম। পায়খানা পাবার গল্প আবার কান্নার হয় নাকি? সেইদিনই অবশ্য বুঝতে পেরেছি, অম্লান কমার্শিয়াল সাকশেসফুল লেখক হবে। কারণ, ও এখনো জানে যে, শ্মশানে এলে দুঃখিত হতে হয়। অম্লান ইতিমধ্যেই পাঁচখানা উপন্যাসের প্রণেতা।

অবিনাশ একদিন একটা অদ্ভুত কাজ করেছিল। শ্মশানে। সেদিনও আমরা একটা গাঁজার দলে বসে গিয়েছিলাম। পরীক্ষিৎ আর শেখর হ—স্—হ—স্ করে লম্বা টান মেরে বুকের মধ্যে ধোঁয়া আটকে রাখছে। তারপর পাঁচমিনিট বাদে দুই নাকের ফুটো দিয়ে মোষের শিঙয়ের মতো সেই ধোঁয়া বার করছে। আমি দু-একবার টেনেই কাশতে লাগলুম। আমি রাউণ্ড থেকে সরে বসলুম। অবিনাশও এসবে নেশা পায় না। ও একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ আমাকে আর তাপসকে ডেকে বললো, 'চল, একটু ঘুরে আসি।' খানিকটা হেঁটে পাটগুদামের পাশ দিয়ে একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো, 'বাংলা আছে?'

'বাংলা অপান?'

'না ছিপ-আটা।'

'সাড়ে তিন টাকা পাইট লাগবে।'

'এক নম্বর তো? তিনটে ভাঁড় দিও।'

আমি অল্প অল্প নিচ্ছিলাম, বাংলা আমার সহ্য হয় না, অবিনাশ ঢক ঢক করে খেতে লাগলো, তাপস খুব গম্ভীর তাপসের বিখ্যাত অন্যমনস্কতা। মাঝে মাঝে ওর হয়, তখন ও উৎকট রকমের চুপ করে থাকে। হিউমার শুনলে হাসে না, তখন বোধহয় কোনো লেখার কথা ভাবে। অবিনাশ জিজ্ঞেস করলো, ' তোর নভেলটা শেষ হয়েছে তাপস?' তাপস ঘাড় নেড়ে জানালো, না। অবিনাশ অপর দিকে ফিরে বললো, 'ওসব গাঁজা—ফাঁজা টানতে আমর ভালো লাগে না, বুঝলেন? ঐ পরীক্ষিৎরা টানছে কেন জানেন? কবিতার মশলা খুঁজছে। গাঁজায় নাকি নানা রকমের ইমেজ দেখা যায়। এই ভিখিরির মতো ইমেজ খোঁজা কেন?'

'আপনার একথা বলা মানায় না, অবিনাশ।' আমি বললুম।

'কেন?'

'আপনি তো এখন লেখেন না। আপনার ইমেজের দরকার কী?'

'ওঃ।' অবিনাশ একটু বিব্রত হলো। 'অরুণও তো লেখে না। জীবনে কখনো লেখেনি। ও খায় কেন? আসলে স্বপ্ন দেখার নেশা, দুঃস্বপ্ন দেখার নেশা, স্মৃতি নিয়ে নড়াচাড়া করার নেশা থাকে অনেকের।'

'আপনার নেই?'

'না, আমি আর ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাকতে চাই না।'

আমি হেসে উঠলুম। 'এ বাসনা আপনার কতদিনের?'

'আমি তো সরল জীবনই কাটাচ্ছি। কী রে তাপস?'

'হয়তো।' তাপস বললো।

একটা লম্বা চুমুকে বাকিটা শেষ করে অবিনাশ বললো, 'আমি কলকাতার বাইরে একটা চাকরি খুঁজছি। তা ছাড়া আমি যে লিখি না, তা নয়, আমি একটা বড় গল্প লিখেছি।' তাপস সচকিত হয়ে বললো,'কবে?'

BANGLAPDF.NET

'আজ, একটু আগে। গঙ্গার পাড়ে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ গল্প, প্রায় পঞ্চাশ পাতার হবে। আশ্চর্য হু হু করে যেন ট্রেনের মতো গল্পটা আমার চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল।' এই দেখাটাই তো যথেষ্ট। লিখে আর কি লাভ? পাছে ভুলে যাই, তাই মদ খেয়ে মনের মধ্যে গেঁথে নিলুম।'

'ভাগ্, শালা, চালাকির আর জায়গা পাসনি!'

'বিশ্বাস কর, পুরো গল্পটা কয়েক নিমেষে দেখতে পেলাম।'

হাঁটতে হাঁটতে আমরা শ্মশানের পারে চলে এলাম আবার। 'সিগারেট আছে" নেই?' অবিনাশ একটা দোকানে গিয়ে বললো, ' দেখি এক প্যাকেট শাদা বিড়ি!'

লোকটা সিগারেট দিতে দিতে অকারণে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনাদের মড়া চিতায় চেপেছে?

'কী?'

'আপনাদের মড়া চিতায় চেপেছে?'

'আমাদের মড়া?' অবিনাশ গাঁ—গাঁ করে হেসে উঠলো। 'আমাদের মড়া কোথায় রে, অ্যাঁ?'

বুঝলাম অবিনাশের নেশা হয়েছে। অবিনাশ বললো, 'চল, আমাদের মড়া খুঁজে আসি।'

আমরা শ্মশানের মধ্যে ঢুকলাম। চারটে চিতা জ্বলছে সমানে ধক ধক করে। অবিনাশ খুশি মনে বললো, 'আজ বাজার ভালো। গগন থাকলে বলতো, আজ অনেক লোক পড়েছে। লোক না টোক। জয় মা কালী বল, লোকে বলে বলবে পাগল হলো।'

আমরা শ্মশানবন্ধুদের জন্য পাথর বাঁধানো ঘরে ঢুকলাম। একদল লোক সদ্য পোড়ানো শেষ করে আলকাতরা দিয়ে মৃতের নাম লিখছিল দেওয়ালে—

বাবু শবপ্রসাদ সাঁতরা

বয়স ৭২। মৃত্যু ঃ সাতুই জানুয়ারী

রিটায়ার্ড চৌকিদার

গ্রাম ঃ ঘোলা। পোঃ ইত্যাদি

অবিনাশ ওদের পাশে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে ওদের লেখা দেখলো। তারপর শেষ হলে, কাঁদো—কাঁদো মুখে বললো, 'দাদা, একটু আলকাতরা দেবেন, আমাদের মড়ার নামটাও লিখবো।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয় লিন্ না'— একজন মুরুব্বি সহানুভূতির সঙ্গে দিল। অবিনাশ গোটা গোটা অক্ষরে লিখলো—সাদা পাথরের দেয়ালে –

বাবু অবিনাশ মিত্র। নিবাস —জানা নাই।

জন্মকাল —জানা নাই। বয়স —জানা নাই

মৃত্যু তারিখ —জানা নাই।

তাপস বললো, 'আরও লেখ, বাপের নাম জানা নাই।'

আমি মুখ ফিরিয়ে দূরে দাঁড়িয়েছিলাম। অবিনাশকে এতটা সেন্টিমেন্টাল হতে আমি আগে দেখেনি।

শ্মশানের কতা মনে পড়লেই সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ে।

সেই ইটালিয়ান ধরনের সুন্দরী পাগলিটার কথা। রোগা, তরুণী রেনেসাঁস নাক, নীল চোখ। একটা হাফ শায়া আর লাল সাটিনের ব্লাউজ পরে নিবন্ত চিতার পাশে বসে আগুন পোহাতো। মেয়েটা এতই রোগা যে ওর শরীরে রস কতখানি আছে বোঝা যায় না, সেইজন্যেই বোধাহয় রাতের বাঘ-ভল্লুকেরা ওর দিকে তেমন নজর দেয়নি। কিন্তু অমন রূপসী আমি খুব কম দেখেছি —অথবা শ্মশানে, নিবন্ত চিতার পাশে বলেই ওকে অত সুন্দর দেখাতো। মাত্র দিন চারেক দেখেছিলাম মেয়েটাকে, চিতার পাশে ছাড়া অন্য কোথাও বসতে দেখিনি। কোনোদিন শুনিনি ওর মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ বার করতে। গগনেন্দ্র বড় ভালোবাসতো মেয়েটাকে। সোয়েটারের দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে গগনেন্দ্র সোজা তাকিয়ে

থাকতো মেয়েটার দিকে। আর বিড়বিড় করে বলতো, ' হে শ্মশানের ঈশ্বর, ঐ মেয়েটাকে অন্তত একঘন্টার জন্য আমাকে দাও' তাপস পাশে দাঁড়িয়ে হাসতো, তখন গগনেন্দ্র বলতো, 'যান না, দেখুন, অন্তত একবার, যত টাকা খরচ হোক।'

নিবন্ত চিতার আশেপাশেও লোক থাকতো। গেঁজেল, রিক্সাওয়ালা, সাধু হয়ে–যাওয়া সিফিলিসের রুগী, রাতকানা ভিখিরি। তাপস গিয়ে মেয়েটার পাশ ঘেঁসে বসে গাঁজার টান মারতে লাগলো। আমরা দূর থেকে লক্ষ্য করতুম। মেয়েটার ভ্রূক্ষেপ নেই। দুই হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে মেয়েটা কাঠি দিয়ে ছাই নাড়ছে। এমন সময় হুড়মুড় করে বৃষ্টি এসে গেল। শীতকালের মারাত্মক অকালবৃষ্টি, আমরা তখনই ছুটে বসবার ঘরগুলোয় ঢুকে পড়লুম, সবচেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো ঝানু গাঁজাখোররা —যারা একফোঁটা জল শরীরে সহ্য করতে পারে না। মেয়েটা চুপ করে বসে ভিজতে লাগলো। কী অদ্ভুত ওর চুপ করে বসে থাকা। সেইরকম হাঁটু মুড় থুতনি ভর দিয়ে কাঠি দিয়ে ছাই খুঁটতে লাগলো, লাল সাটিনের ব্লাউজ আর হাফশায়া, সেই মেয়েটা, নীল ঝকঝকে চোখে, এখনো চোখ বুঁজলে স্পষ্ট দেখতে পাই। তাপস বললো, 'না, পারলুম না, মাপ করুন, মেয়েটার অসম্ভব দাম্ভিকতাকে ছুঁতে পারলুম না।' আমার বন্ধুদের অনেক রকম এলেম ছিল, কিন্তু একটা পাগল মেয়েকে অ্যাপ্রোচ করার ভাষা কারুর জানা ছিল না। গগনেন্দ্র বললো, ' কে কে মল্লিকার কাছে যাবেন চলুন, আমি এই মেয়েটার মুখ মনে করে মল্লিকার কাছে যাবো।'

আমি কলকাতা ছেড়েছি চার বছর। জানিনা ওরা এখনো শ্মশানে বেড়াতে যায় কিনা। গগনেন্দ্র চাকরি করে বয়েতে, অরুণ বিলেতে গেছে। আমি ক্লান্ত হয়ে জব্বলপুরে রাত্রে বসে আছি। আমার মন খারাপ লাগছে। মন খারাপ না শরীর খারাপ জানিনা। গায়ত্রী বোধহয় খুব সুন্দর দেখতে। অন্তত আমার তো মনে হয় —অবশ্যই বউয়ের রূপ সম্বন্ধে স্বামীদের মন্তব্য গ্রাহ্য হয় না। পরীক্ষিৎ আমাকে বলেছিল, 'বউ বেশি সুন্দরী হওয়া ভালো নয়।' পাগল পরীক্ষিৎটা কি আমাকে ছেলেমানুষ ভাবে, যে বউয়ের রূপে ভুলে থাকবো। বা, কেরানীবাবুদের মতো —বউয়ের দিকে কে কুনজর দিল সেই নিয়ে। আচ্ছা, গায়ত্রী বোধহয় কখনো ভালোবাসা পায়নি, তাই আমাকে এতটা অবলম্বন করতে চায়। ও আমাকে সব সময় আচ্ছন্ন করে রাখতে চায়। ওর শরীরের ক্ষিধে একটু বেশী, নবীন যুবতীর কামুকতা যে এমন ভয়ংকর আমার জানা ছিল না, আমার বন্ধুদের মতো মেয়েদের সম্পর্কে আমার বেশি অভিজ্ঞতা ছিল না। তবু, মনে হয়, গায়ত্রী বোধহয় আমাকে পেয়ে খুশীই হয়েছে—একটা মেয়েকে খুশি করার কম নয়, বহু কবিতা লেখার চেয়েও বড়।

শ্মশানের পাগলিটার থেকেও বোধহয় গায়ত্রী রূপসী। সেই মেয়েটাকে এই বিছানায় মানাতো না। গায়ত্রীকে ওই খাটে কি চমৎকার মানিয়েছে, ছেলেবেলায় পড়া রূপকথার বইয়ের ছবির মতো। আমি ওর কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে গিয়েও হাত তুলে নিলাম। তুমি আর একটু ঘুমোও গায়ত্রী। আমি ইতিমধ্যে দাড়িটা কামিয়ে নিই। কাল ভোরবেলা বেরুতে হবে, তখন দাড়ি কামানো যাবে না। তা ছাড়া, রাত্রে দাড়ি কামাতে ভালোই লাগে। একটু গরম জল পেলে ভালো হতো । যাক। আমি সফেটি রেজর, ব্রাশ, সাবান খুঁজতে লাগলুম।

'এ কী গায়ত্রী, তুমি উঠে এলে কেন?'

'আমি তো জেগেই ছিলাম।'

'না, তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও, পরে তোমায় জাগাবো।'

'যাঃ, দাঁড়াও, আমি গরম জল করে আনি।'

গায়ত্রী আমার গালে ওর গালটা ঘষে দিয়ে বললো, 'কী খোঁচা – খোঁচা দাড়ি, বাবাঃ।'

অবিনাশের চিঠিটা রাখলুম, দাড়ি কামিয়ে সাবান মুছবার জন্য। এখন রাত ঠিক বারোটা–মাইক মাইনস এ সাইরেন বেজে উঠলো। একটা মুর্গীও ডেকে উঠলো প্রচণ্ড আওয়াজে। মুর্গীরা কি রাত্রে ডাকে —কখনো শুনিনি বা লক্ষ্য করিনি —ভোরবেলা দেখেছি একটা উঁচু জায়গা বেছে নিয়ে সূর্যকে ডাকে।

BANGLA PDF.NET

পৃথিবীর লোককে সূর্য –ওঠার খবর জানাবার ভার মুর্গীগুলোর ওপর কে দিয়েছে কী জানি। যে মুর্গীটা এইমাত্র জেগে উঠলো সেটা বোধহয় চাঁদের খবর জানাতে চায়। ঐ মুর্গীটা বোধহয় মুর্গীসমাজের মধ্যে বিদ্রোহী আধুনিক–সূর্যের বদলে চাঁদ কিংবা অন্ধকার ঘোষণা করতে চায়। ভেবেই আমার হাসি পেল। ওই মুর্গীটা বেছে নিয়ে কাল রোস্ট খেলে কেমন হয়' ?

'এ কী, এর মধ্যে গরম জল হয়ে গেল?'

'দাঁড়াও, তুমি চুপ করে বস, আমি তোমার দাড়ি কামিয়ে দিই।'

'তা হয় না, পাগল নাকি?'

'বাঃ, কেন হবে না।'

' সেফটি রেজর দিয়ে অপরে কামাতে পারে না। পারবে না, পারবে না আমার উঁচু –নিচু গাল কেটে যাবে। তোমাদের মতন অমন নরম তুলতুলে গাল হলে কাটা যেতো অনায়সে। তুমি বরং গালে সাবান মাখিয়েদাও।'

রাত্তিরবেলা গরম জলে ব্রাশ ডুবিয়ে গালে সাবান মাখতে সত্যিই বেশ আরাম লাগে। গায়ত্রী আমার দুপায়ের ফাঁকের মধ্যে দাঁড়িয়ে খুব যত্ন করে সাবান ঘসতে লাগলো। আমি চেয়ারে বসে এক হাতে ওর কোমর ধরে —'এই অসভ্যতা করবে না!' —বলেই গায়ত্রী আমার চোখে সাবান লাগিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে আমাকে দুই হাতে চোখ ঢাকতে হলো। গায়ত্রী হেসে দূরে সরে গেল। আমি ওকে উঠে ধরতে গিয়েও পারলাম না। দাড়ি কামাতে গিয়ে আমার থুতনিটা খানিকটা কেটে গেল।

'অন্তত বারো বছর ধরে তো দাড়ি কামাচ্ছো, এখানো শিখলে না, আনাড়ী!' গায়ত্রী হাসতে হাসতে বললো।

' তোমাদের তো এটা শিখতে হয় না, জানবে কী করে কি বিরক্তিকর কাজ।'

'আমি সেফটি রেজার দিয়ে কাটতে জানি! তোমার হয়ে গেলে আমাকে দিও, আমার একটু লাগবে।'

'তুমি কী করবে?'

'আমার দরকার আছে।'

'ওঃ, আচ্ছা, তোমারটা আমি কেটে দিচ্ছি।'

'না, আমিই পারবো।'

'হাতের নিচের চুল কাটবে তো? বাঁ হাতেরটা তুমি পারলেও, ডান হাতের নিচে পারবে কি করে?'

'খুব পারবো, বাঁ হাত দিয়ে।'

'না, এসো না লক্ষ্মী, দেখ আমি কি সুন্দর করে দিচ্ছি।'

গায়ত্রীকে ধরে এনে দাঁড় করালুম। ও ভিনাস ডি মেলোর ভঙ্গীতে দুই হাত উঁচু করে দাঁড়ালো। আমি সাবান মাখিয়ে খুব যত্ন করে সাবধানে ওকে কামিয়ে দিলাম।

'লাগছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হুঁ,' খুব দুষ্টুমি করে গায়ত্রী।

আমার শেখরের কতা মনে পড়লো। শেকর হস্টেলে থাকতে সাবান খেতো। নতুন চকচকে সাবানের কেক দেখলে শেখর লোভীর মতো এক কামড়ে আধখানা খেয়ে ফেলতো কচকচ করে —আমরা অবাক হয়ে দেখতুম শেখরের মতো অভ্যেস যদি থাকতো, তবে আমি গায়ত্রীর বগলের সাবান ধুয়ে না দিয়ে চেটে নিতাম। তার বদলে তোয়ালে দিয়ে মুছে দিয়ে আমি ওর বুকে মুখ গুঁজলাম।

'গায়ত্রী, আমার বিষম ইচ্ছে করে শিশুর মতো স্তন্যপান করতে। তোমার বুকে দুধ নেই কেন?'

'বাঃ, তুমি যে বিয়ের পর প্রথম প্রথম বলতে, আমার বুকে অমৃত আছে।' আমরা দুজনে হো –হো করে হেসে উঠলুম।

'তুমি বুঝি তখন আমার কথা বিশ্বাস করতে না।' আমি জিজ্ঞেস করলুম।

'তুমি বুঝি বিশ্বাস করে বলতে?' গায়ত্রী বললো, 'ওসব বিয়ের পর কিছুদিন বলতে হয়, শুনতেও ভালোলাগে।'

'না সত্যিই, বুকের দুধ খেতে আমার বিষম ইচ্ছে করে।'

'আচ্ছা, আমার একটা ছেলে হোক, তখন খেও।'

'কবে তোমার ছেলে হবে?'

'বাঃ, তার আমি কি জানি! সেটা কি আমার হাত! ওসব আজেবাজে ব্যবহার করতে কেন?

'ওসব জানিনা, কবে তোমার একটা ছেলে হবে বলোনা?'

'বা রে, সেটা তো তুমিই জানো'

'সন্তান বুঝি বাবার, মায়ের নয়?'

'বাবা না দিলে মায়ের কী করে হবে?'

'ওসব বৈজ্ঞানিক ধাপ্পা। তোমার পেটের মধ্যে জন্মাবে, তোমার রক্ত শুষে বড় হবে, তোমার শরীর ফুঁড়ে বেরুবে, আর তার জন্য দায়ী হবো আমি, সারাদিন গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবো কি বিদেশে থাকবো —ওসব বাজে কথা, সন্তান আসলে মেয়েদেরই হয়। তুমি আমাকে একটা ছেলে দাও গায়ত্রী।' গায়ত্রী আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি তোমাকে একটা ছেলে দেব?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, দেবো, আর আট মাস বাদে।'

' তার মানে?' আমি গায়ত্রীকে ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালুম।

'শত্রুর আমার পেটে এসে গেছে!'

'সত্যি, তুমি জানো?'

'হ্যাঁ, জানি, মেয়েদের ওসব জানতে ভুল হয় না।'

'গায়ত্রী! গায়ত্রী, গায়ত্রী!' আমি ওকে দু'হাতে তুলে একটা ঘুরপাক খেলুম।

'আঃ, ছাড়ো ছাড়ো' —.

'না না না, তুমি সত্যি বলছো? বুঝতে তোমার ভুল হয় নি তো? আমাকে ঠকাচ্ছো না?'

'না গো, ঠকাচ্ছি না, সত্যিই।'

'গায়ত্রী" উঃ, গায়ত্রী, আমার এত আনন্দ হচ্ছে—'

'ছাড়ো, লঅগছে। ছেলের জন্য তোমার এত কাঙালপনা কেন?

'এতদিন আমি পূর্ণ মানুষ হলুম। আমি গৃহস্থ, আমি পদস্থ চাকুরে, আমি সন্তানের পিতা! আমি কোথা থেকে জীবন শুরু করেছিলাম তুমি জানো? না, জানো না। আমার বাবা নেই, মা নেই, একটাও আত্মীয়ের মুখ আজ মনে পড়ে না। তেরো বছর বয়স থেকেই আমি একা। বাবার এক বড়লোক বন্ধু দয়া করে আমাকে মানুষ করেছেন —কলেজে যখন থার্ড ইয়ারে পড়তুম সেই সময় হঠাৎ তিনিও মারা গেলেন। তখন থেকে বিজ্ঞাপনের এজেন্ট সেজে, প্রুফ দেখে, তিনবেলা ট্যুইশনি করে হস্টেলে থেকেছি। এইজন্যই তাপস পরীক্ষিৎদের মতো বাউণ্ডুলে হয়ে যাইনি। আমার ঘর –সংসার ছিল না, তাই ঘর–

সংসার পাতবার বিষম লোভ ছিল আমার। কবে একদিন সুস্থ সাধারণ, দায়িত্বশীল মানুষ হবো, সেই ছিল আমার বাসনা —ভাগ্যিস আমি তোমাকে পেয়েছিলাম।'

'হয়েছে, হয়েছে, এখন শোবে চলো, আমার ঘুম পেয়েছে সত্যি।'

'চলো, এখন থেকে খুব সাবধানে থেকো, কিন্তু।'

'যদি বাচ্চা হবার সময় আমি মরে যাই?'

'পাগল নাকি? তোমার বয়েস তেইশ, এইতো বাচ্চা হবার ঠিক সময়।'

'খুব যন্ত্রণা হবে তখন, না?'

'তা হবে, যত যন্ত্রণা পাবে —শিশুর প্রতি তত ভালোবাসা হবে।'

'সন্তান কিন্তু সম্পূর্ণ আমার, তুমি বলেছ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার —আমার সব কিছুই তো তোমার।'

'আবার পাগলামি করছো? তুমি না আধুনিক লেখক —আধুনিকরা এসব বলে নাকি?

'ওঃ, হো – হো, তুমিও এসব জেনে গেছো!'

'চলো, শুয়ে পড়ি, আর না। দাঁড়াও, জানলা বন্ধ করে দিয়ে আসি।'

'কেন, জানলা খোলা থাক না! ঠাণ্ডা লাগবে?

'ঠাণ্ডা না। চাঁদের আলো আমার চোখে পড়লে ঘুম আসে না।'

'ওঃ, আচ্ছা অন্ধকার করে দাও।'

গায়ত্রী সব অন্ধকার করে দিল। এতক্ষণ বুঝতে পারিনি —আমার কপালের দু'পাশের শিরা দপ্‌দপ্ করছে এবং হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে —এই লাইনটাও মাঝে মাঝে মনে পড়ছিল। মাথা ধরার সঙ্গে এই লাইনটির কোনো যোগ আছে কিনা জানি না। অথবা এই দুটোই আলাদাভাবে আমাকে আক্রমণ করেছে —গায়ত্রীর সঙ্গে এই আনন্দের সময়ে। 'আঃ, গায়ত্রী, তোমাকে আমি বিষম ভালোবাসি!'

'তা বুঝি আমি জানি না?' গায়ত্রী হাসির শব্দ করলো।

অন্ধকারে ওর হাসি দেখা গেল না।

তাপস

সকালটাই শুরু করলুম একটা মারাত্মক ভুল দিয়ে। রোদ্দুরকে পাশে রেখে শুয়েছিলাম, যতক্ষণ শুয়ে থাকা চলে। ক্রমশঃ রোদ্দুরগুলি খুব স্বাধীন হয়ে সারা বিছানা ছড়িয়ে পড়লো। তখন পায়ের ধাক্কায় অতিকষ্টে জানলাটা বন্ধ করতেই রামসদয়বাবু সহৃদয় গলায় আপত্তি জানালেন, 'সকালবেলা যতক্ষণ শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হয় শুয়ে থাকুন তাপসবাবু, কিন্তু সকালের রোদ ও হাওয়া গায়ে লাগানো উচিত।' এর উত্তরে আমি বললুম, 'আপনার কাছে একটা খুচরা টাকা হবে? কাল সন্ধ্যে থেকে আমি দশ টাকার নোটটাভাঙাতে পারছি না।'

রামসদয় কাঁচি দিয়ে গোঁফ ছাঁটছিলেন ও আসন্ন বাথরুমের প্রস্তুতির জন্য পেটে থাপ্পড় মারছিলেন। পরের আওয়াটা কেমন হয়, সেই অনুযায়ী তাঁর মেজাজ নির্ভর করে। মনে হচ্ছে, আজ মেজাজটা ভালোই আছে। অত্যন্ত বিব্রত মুখে জানালেন, 'ইস্‌তাইতো, আমার কাছেও যে দশটাকার নোট সব। চাকরটাকে দিন না ভাঙিয়ে দেবে।' আমি জানি রামসদয় মিথ্যে বলেনা, ওর কাছে সত্যিই দশটাকার নোট। হয়তো

BANGLA BOI

অনেকগুলোই দশটাকার নোট থাকা সম্ভব। কেন চালাকি করতে গেলুম —পুরো একটা দশটাকার নোট চাইলেই চমৎকার হতো। আর কি শুধরে নেবার সময় আছে? এখন কি ওর হাত জড়িয়ে ধরে বলবো, 'বুঝাতেই তো পারছেন দাদা কথার কথা, পুরো দশটাই দিন।' রামসদু বাথরুমে ঢুকে পড়লেন, ওঁর প্রসন্নমুখ দেখে বুঝলুম বেগ এসে গেছে। আজ রামসদয়ের মন ভালো ছিল, আজ দশটাকা না চাওয়াটা চূড়ান্ত বোকমি হয়ে গেল। লোক ভালো রামসদয়, একমাত্র —টাক ঢাকবার জন্য চুলগুলো সামনের দিকে টেনে আঁচড়ায় —এছাড়া ওর কোনই দোষ নেই। নিশ্চিত দিত। তার ওপর যদি বলতে পারতুম, কাল মায়ের চিঠি পেয়েছি (দীর্ঘশ্বাস) কিংবা বন্ধুর অসুখ —কুড়ি কি তিরিশ হয়ে যেতে পারতো। ওঃ! সকালেই মোটা হরি শুনিয়ে গেছে, ঠাকুরের অসুখ, আজ সবাইকেই বাইরে খেতে হবে। তার মানে সারাদিন আজ কুহেলিকা। দুপুরবেলাটা শুয়ে শুয়ে কাটাবো ভেবেছিলাম। ইচ্ছে হলো মোটা হরির মুণ্ডুটা চিবিয়ে খাই।

স্টিম লণ্ড্রিতে কাচানো পেয়ার শার্ট –প্যান্ট ছিল —এইটুকুই যা সৌভাগ্য। পকেটের মধ্যে পয়সা না থাকলে জামা-কাপড় নোংরা থাকা মানায় না। তাহলে সত্যিই ভিখিরি মনে হয়। রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। সকাল নটা। সকালের চা-ও দেয়নি, এমন রাগ হচ্ছে, যে ইচ্ছে করছে, নাঃ, সকালবেলাতেই মুখ খারাপ করবো না। মুখে এখনো টুথপেস্টের বিচ্ছিরি স্বাদ লেগে আছে। পকেটে একটা নিঃসঙ্গ দশ নয়া পয়সা। এই দশ নয়া পয়সা নিয়ে পড়েছি মহা মুস্কিলে। কাল সন্ধ্যে থেকে ভাবছি। এটাকে কোনো বাজেটে ফেলা যায় না। চায়ের কাপ দু'আনা। কলুটোলার মোড়ে ছ'পয়সায় পাওয়া যায়-কিন্তু এতদূর হেঁটে গিয়ে চা খেলে সঙ্গে একটা টোস্ট না হলে —। সিগারেট কেনা যায় —কিন্তু সকালেই চা ছাড়া শুধু সিগারেট! চমৎকার হতো, যদি এই দশ নয়া পয়সায় একটা পোচ, দুটো টোস্ট, এক কাপ ভালো চা ও সঙ্গে দুটো সিগারেট পাওয়া যেতো। এইগুলো আমার বিষম দরকার এখন। এর একটাও হবে না বলে, ইচ্ছা হলো, পয়সাটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলি। কিংবা কোন ভিখিরিকে দিয়ে দিই। হঠাৎ একটা মুচিকে দেখে জুতো পালিশ করিয়ে নিলাম দশ নয়াটা দিয়ে। ময়লা জুতোটা মানাচ্ছিল না। এবার শরীর ও মন বেশ ঝরঝরে হয়ে গেল। এখন অনায়াসে বিমলেন্দুর কাছে যাওয়া যায়। বিমলেন্দু সকালে কমার্স কলেজে পড়াচ্ছে। আর বিমলেন্দুর কাছেই যখন যাবো, তখন ট্রামে যাওয়া যাক।

ট্রামটায় ভিড় ছিল না, জানলার কাছে বসার জায়গা পেয়ে গেলাম। দেখে মাঝপথে নেমে পড়া আমি মোটেই পছন্দ করি না। বসবার জায়গা পেয়ে বসে পড়া উচিত। সম্ভব হলে একটা বই খুলে পড়া। আমার কাছে বই ছিল না —কণ্ডাক্টরকে খুব ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগলাম। খুব পছন্দসই লোকটি, বেশ অলস স্বভাবের —কারণ প্যান্টের সব কটা বোতাম আটকায়নি, নিশ্চয়ই কানে কম শোনে —কারণ লোকটার মুখে চোখে একটা এলামেলো বোকামি আছে। অনেকটা ভবকেষ্টর মতো। ভবকেষ্টর মুখে অমন নিষ্পাপ বোকামির ছায়া কেন, আমি ততদিনও বুঝতে পারিনি, যতদিন না জানতে পেরেছি ও বদ্ধ কালা। ভবকেষ্টর বউ মালতী ওর ইয়ার ব্যাণ্ডের কাজ করে —সেইজন্য মালতীর মুখেও বোকামির স্বর্গীয় আলোছায়া খেলে। অনেকক্ষণ পর কণ্ডাক্টর আমার কাছে এলো। আমি বাঁ দিকের ঘাড়টা আলতোভাবে বেঁকিয়ে অন্যমনস্কভাবে নরম গলায় বললুম, 'দিমানচ্ছি।' লোকটা চলে গেল। যাক্ একবারেই সাকসেসফুল! এই অর্ধসত্যগুলোতে আমি খুব উপকার পাই। ঘাড় হেলানো দেখে লোকটা নিশ্চিত হয়েছিল, আমার উচ্চারণ শুনে দ্বিদাগ্রস্ত হয়ে চলে গেল। দিচ্ছি ও মাস্থলি এই দুটি শব্দের সন্ধি করে আমি ঐ শব্দটির সৃষ্টি করেছি। এবং বারবার উচ্চারণ করে রপ্ত করেছি ধাঁধাখানি। দিচ্ছি ও মাস্থলি, দিমানচ্ছি। কোনো ত্রুটি নেই। সেই সঙ্গে আছে ঘাড় হেলানো। লোকটার কান যদি ভালো হতো — তাহলে ও মহা মুস্কিলে পড়তো। বুঝতেই পারতো না —আমার কাছে কি আছে —মাস্থলি, না টিকিট

কাটবো। ও কি জিজ্ঞেস করতো —দেখান্? না দিন? দেখান বললো, ধমকে উঠতাম দেখাবো কি দিচ্ছি বললাম তো! যদি লোকটা লজ্জার মাথা খেয়ে বলতো, দিন। তাহলে বলতাম, দশটাকার খুচরো আছে ভাই? তখন যদি বলতো, না দশ টাকার খুচরো নেই, আমি আর বাক্যব্যয় না করে চুপ করে বসে থাকতুম। যদি মরীয়া হয়ে লোকটা দৈবাৎ বলেই ফেলতো, হ্যাঁ দিন, ভাঙিয়ে দিচ্ছি, তবে ব্যঙ্গের সুরে জিজ্ঞেস করতুম, এ-ট্রাম বেলগাছিয়া যাচ্ছে নিশ্চয়ই? না, গ্যালিফ্? ওঃ গ্যালিফ্, তাই বলো, — এইটুকুই জানিয়ে লাফিয়ে উঠে ব্যস্তভাবে নেমে যেতুম। আমি টিকিট ফাঁকি দিচ্ছি এ বিষয়ে দৃঢ় ধারণা করার মতো মুখ। বাপ-মা আমার জন্য টাকা-পয়সা, ভাড়াবাড়ি কিছুই রেখে যায়নি, শুধু দিয়ে গেছে ভদ্রলোকের মতো সুন্দর মুখখানি। এটাও মন্দ ক্যাপিটাল নয়, এতেও খুব অনেকটা কাজ হয়।

বিমলেন্দু ক্লাসে পড়াচ্ছিল। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে চোখাচোখি করলাম। তারপর কলেজ ক্যান্টিনে গিয়ে ডবল টোস্ট, পোচ আর চায়ের অর্ডার করে বসলুম।

চা শেষ হবার পর বিমলেন্দু এলো হন্তদন্ত হয়ে, হাতে কয়েকখানা বই, টাইপকরা নোট। 'কিরে কি ব্যাপার, আমার যে আজ বিষম চাপ, পরপর তিনটে ক্লাশ!'

'গুলি মেরে দে।'

'না ভাই, আজ পারবো না, আজ ছেড়ে দে।'

'দ্যাখ, বিমল, আমি না হয় বি· এ· পাশ! আমার কাছে প্রফেসারি দেখাস্ নি।'

'আস্তে বল, ছেলেরা শুনতে পাবে।'

'ক্লাশের পর কি করবি?'

'ডঃ মহালনবিশের বাড়ি যেতে হবে একবার।'

' কেন, তার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে?'

'ধ্যাৎ, ডাঃ মহালনবিশ আমার রিসার্চ গাইড। আজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তা ছাড়া ওর কোনো মেয়ে নেই। বিয়েই করেননি।'

'আজ সব ছেড়ে দে। আজ সারাদিন আমার কিছুই করার নেই। চল দু'জনে মিলে একটা পার্টি আর্গানাইজ করি। অনেকদিন একসঙ্গে বসা হয় নি।'

'আজ হবে নারে। আমার আজ উপায় নেই। তোরাই বেশ আছিস্ তাপস। চাকরি বাকরি করতে হয় না, ইচ্ছেমতো দিন কাটাতে পারিস। আমাকে সব মিলে পাঁচটা চাকরি করতে হয়। আমার গলায় দড়ি বাঁধা-দড়ির বাইরে যেতে পারিনা।'

'আচ্ছা, পাঁচটা টাকা ধার দে।'

' নেই। খুচরা পয়সা সম্বল।'

'পাঁচটা চাকরি করছিস, আর পাঁচটা টাকা ধার দিতে পারবি না? একমুঠো খোলা মানিক!'

'সত্যি পারিনা।'

'কতআছে?'

বিমলেন্দু পকেট থেকে খুচরো পয়সা বার করে গুনলো। চৌদ্দ আনা। আমি ওর থেকে সাত আনা নিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তোর ধারের সিগারেটের দোকান আছে?'

'আছেল।'

'আমাকে দু'প্যাকেট সিগারেট কিনে দে। আজ মেস বন্ধ। দুপুরে কোথায় খাবো ঠিক নেই।'

'তুই আমার বাড়িতে আয়। দুপুরে আমার সঙ্গে খাবি।'

BANGLADE.NET

'দেখি।'

ঘন্টা পড়তে বিমলেন্দুকে ছেড়ে দিলাম। তারপর হঠাৎ আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই রিসার্চ করছিস, আগে তো শুনিনি। ডক্টরেট হয়ে তোর কি মুকুট হবে? ছি ছি।'

'ডক্টরেট হলে মুকুট হবে না, কিন্তু মাইনে বাড়বে —'বিমলেন্দু শুকনো মুখে জানালো। আমি ওর মুখের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করলাম, সত্যি সত্যি ওর গলায় দড়ির দাগ দেখা যায় কিনা!

শীত নেই, বেশ ঝরঝরে রোদ, ভিড় শুরু হয়েছে। রাস্তার দুই বিপরীত মুখেই জনস্রোত, দু'দিকেই কেন লোক ছুটে যায় বুঝতে পারিনা। চারদিকেই পরের বাড়ি জলের রেটে নীলাম হচ্ছে —কি করে ওরা টের পায় কে জানে। আমি কোনোদিন টের পেলুম না। পেলেই বা কি। পকেটে নেই কানাকড়ি, দরজা খোলো বিদ্যেধরী! কোথায় যাই এখন? আশ্চর্য, কোনো জায়গা মনে পড়ে না। বন্ধুবান্ধবের খোঁজ করা যেতে পারে। কি বিষম যাচ্ছেতাই জীবন —এক এক সময় আমার মনে হয়, প্রতিদিন একই বন্ধুবান্ধবের মুখ। আর কি সব মুখ, আহা! হাওড়া স্টেশন যে সব নিরুদ্দিষ্ট আসামীর ছবি আছে —সবকটা এসে এখানে জুটেছে। হয় এর সঙ্গে দেখা, নয় ওর সঙ্গে আড্ডা, হৈ-হল্লা উত্তেজনা, ভালো লাগে না, সত্যিই খুব ক্লান্ত লাগে। প্রতিদিন একই রকম কাটছে —একথা ভাবলে বেঁচে থাকার আর কোনো পয়েন্ট থাকে না। মনে হলো, বিমলেন্দুই বোধহয় একা একা জীবন কাটাচ্ছে। আজকাল বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে ওকে প্রায় দেখাই যায় না, চারটে চাকরি, রিসার্চ, খবরের কাগজে লেখা, সেইসঙ্গে কবিতা —যেন এসবের মধ্যে ও কি এক গভীর ষড়যন্ত্র করে চলেছে। সব সময় অনুত্তেজিত ওর মুখ, কিছুটা বিমর্ষ, কি জানি আমাকে দেখে ও খুশি হয়েছিল, না বিরক্ত। মনে হয়, কিছুদিন পর হেমকান্তির সঙ্গে বিমলেন্দুর কোনো তফাৎ খুঁজে পাবোনা।

মায়ের মৃত্যুর পর একমাস অশৌচ করলো হেমকান্তি, নেড়া মাথায় রোজ হবিষ্যি খেতো। তারপর থেকে এখনও প্রায়ই মাথা কামাচ্ছে, মাছ-মাংস ছেড়েছে। এই রকমই নাকি সারাজীবন চালাবে। ঐরকম ফর্সা, লম্বা চেহারা, মুণ্ডিত মাথা, হেমকান্তি যখন আমাদের মধ্যে বসে, মনে হয় যেন অতীতের কোনো মর্মর মূর্তি। ও বোধহয় জানে না যে, মাথা কামিয়ে লোর পর ওকে বিষম অহংকারী দেখাচ্ছে —সেদিন যখন মায়ার দিকে হাত তুলে চায়ের কাপটা সরিয়ে দিলো, অস্ফুট গলায় বললো, 'আমি চা খাইনা আর' —মায়া চকিতে কাপটা নিসেরে গেল —আমার মনে হলো এ দৃশ্যটা আমি আগে কোথাও দেখেছি —কোনো ফিল্মে বা রূপকথায় বা উপন্যাসে, বা স্বপ্নে, যেন কোনো অহংকারী রাজপুত্র, বা নবীন সন্ন্যাসী, ফিরিয়ে দিচ্ছে কোনো উপযাচিকাকে। যদিও জানি হেমকান্তির ওরকম কোনো সাহসই নেই, আর মায়াও হেমকান্তিকে মোটেই পছন্দ করে না। মায়াকে আমারও যেন কেমন লাগে, ঐ কচি মেয়েটাকে আমি বড় ভয় করি। নইলে আমার সময় কাটাবার সমস্যা? অনায়াসেই মায়ার কাছে গিয়ে চমৎকার বসতে পারতুম, বলতুম, 'মায়া তোমার হাত দেখি।' ওর করতল দুহাতে ধরে গন্ধ শুঁকতুম, সমস্ত শরীরে চাপ দিতুম, ওর শরীর উষ্ণ হলে অনায়াসে জানানো যেতো, 'মায়া তোমার জন্য আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয়!' আমি ওর সঙ্গে বিছানায় শুতুম না, ওকে নিয়ে বেড়াতে যেতুম কিংবা কানে কানে কথা বলতুম কিংবা চোখের দুটো পাতা আঙুলে তুলে ফুঁ দিতাম, আমি ওর কৈশোরের রহস্য নিয়ে খেলা করতুম। কিন্তু মায়া আমাকে তা দেবে না, আমি গেলে চা দেবে, ইয়ার্কি করবে, তারপর একসময় বলবে, 'দিদিকে ডেকে দিচ্ছি, গল্প করুন।' দিদি যদি না থাকে বাড়িতে, তা হলে বলবে, 'আসুন দাবা খেলি।' খানিকটা বাদে নিশ্চিত জানিয়ে দেবে —'এবার বাড়ি যান।' বাঃ! আমি যদি ওর হাত চেপে ধরি, অন্যরকমভাবে ও হেসে উঠবে খিলখিল করে, যদি বলি, 'মায়া আমি তোমার কাছেই থাকতে চাই,' তাহলে ও হাসবে, বলবে, 'থাকুন না।' যদি জোর করে চুমু খেতে যাই —ও হেসে মুখ সরিয়ে নেবে কিন্তু ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠবে না। ওর সঙ্গে জোর করা যাবে না। মায়ার সমস্ত হাসিই অভিমানের, আমার

আমার মনে হয়। বরং ছায়া ভালো, ছায়া দুঃখিত কিন্তু বোকা। লোভী কিন্তু ঘুমন্ত। ছায়াকে হয়তো আমি খানিকটা পছন্দ করি ঠিকই, —কি জানি! অবিনাশের মতো হাড়হারামজাদা ছেলেই মায়াকে ট্যাক্‌ল করতেপারে।

এখন আমি কোথায় যাই! কোন মেয়ের সঙ্গেই প্রেম –ট্রমের সম্পর্ক নেই যে হঠাৎ যেতে পারি। প্রথম কলেজ –জীবনে ওসব চুকে গেছে। বাসন্তীর সঙ্গে কি গভীর ভালবাসার সম্পর্ক ছিল, আর একটু হলেই ওকে বিয়ে করে ফেলতুম আর কি! সেদিন বাসন্তীর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলো, নতুন বরের সঙ্গে চলেছে, খুশিতে মোটা হয়ে গেছে মেয়েটা, কিন্তু আশ্চর্য, আমার মধ্যে কোনোরকম ঈর্ষা কিংবা দুঃখ নেই, কিংবা উদাসীনতাও জাগলো না। খুবই সাধারণভাবে মাথা ঝাঁকালুম, 'কি খবর,' ' কেমন,' 'ভালো,' এইসব অনায়াসে বলাবলি করে চলে গেলুম। বাসন্তীও আমাকে মনে রাখেনি। মেয়েরা কেউ আমাকে মনে রাখে না। যে কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ হবার পরই তার চোখে তাকিয়েছি, বলেছি, 'চলো, রেস্টুরেন্টের কেবিনে বা হোটেলরুমে। চলো, ট্রেনের নিরালা ফার্স্টক্লাশ কামরায়। ব্লাউজে সেফ্‌টিপিন গেঁথো না, আমার আঙুলে ফুটে যায়, আর আঙুল বিষম স্পর্শকাতর এবং দামী, সেফ্‌টিপিন ফোটাবার জন্য নয়।' কেউ বেশিদিন টেঁকেনি। দু'একজন শেষ পর্যন্ত এগিয়েছে, অনেকে গোড়া থেকেই কেটেছে। কেউ কেউ, 'বিয়ে করো' বলে এমন বায়নাক্কা তুলেছে, ওফ! এক একজনকে সামলাতে কম ঝক্কি পোহাতে হয়েছে আমার! কত চোখের জল —টেলিফোনে চোখের জল, চিঠিতে চোখের জল। অথচ, কেউই আমাকে কোনো অভিজ্ঞতা দেয়নি। উপন্যাসটা লিখলুম, সবাই বললো, খুব কর্কশ এবং নিষ্ঠুর হয়েছে। ভেবেছিলাম উনিশ শো ষাট থেকে তেষট্টি সাল পর্যন্ত নিজে যা যা করেছি, সেই সবই লিখবো। তাই লিখেছি অনেস্টলি, যা যা মনে পড়েছে। কোনো নরম মুখ মনে পড়েনি, চোখের জল মনে পড়েনি, ভালোবাসা শব্দটাই মনে পড়েনি। জীবনে কখনো আমি ভালোবাসা পাইনি বোধ হয়। অথচ ভালোবাসার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলাম। স্ত্রীলোকদের কাছে তো কম অভিযান করিনি, কিছুই পাইনি, লোভ ছাড়া, অথবা হয়তো আমার বোধশক্তি নেই, যা পেয়েছি এখনও তা উপলব্ধি করতে পারছি না। পরীক্ষিৎ তো পেরেছে, মেয়েদের সামান্য স্পর্শও ওকে কবিতায় ভরিয়ে তোলে, ওর কবিতা ভালোবাসার কথায় মুখর। আমি কিছুই পাইনি, লোভ ছাড়া; লোভ আমাকে বহদূর নিয়ে গেছে, ভালোবাসার চেয়েও বড় আসনে, ইচ্ছে করছে এখনই কোনো স্ত্রীলোকের কাছে গিয়ে শুই, এই লোভ আমার মধ্যে এনেছে অ্যাকশন, আমাকে তাড়িয়ে চলেছে এইজন্য আমার শরীরে অসুখ নেই, আমার প্রত্যেকটি স্নায়ু সতেজ, ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম, আমি শিশিরের পতনশব্দ পর্যন্ত শুনতে পাই।

ট্রাম লাইনের পাশে বহক্ষণ কাটলো। রোদ্দুর বেশ চড়চড় করছে। কোন্‌দিকে যাবো এখানোও দিক ঠিক করতে পারিনি। মেসে ফিরে গিয়ে শুয়ে থাকা যেতো। কিন্তু দুপুরে একটা খাওয়ার ব্যাপার আছে। কিছু না খেয়ে শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ দেখা কবিতুময় না। আমার ঠিক পোষায় না। যত রাজ্যের কুচিন্তা আসে মাথায়, ইচ্ছে হয়, কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করি, অথবা পিছন দিকের জানালায় খড়খড়ি তুলে পাশের বাড়ির বাথরুমে উঁকি মারি। এ বয়েসে আর ওসব চলে না। আশ্চর্য, সকলেই দিব্যি চাকরি –বাকরি করছে —আমি ছাড়া। এমনকি পরীক্ষিৎও খবরের কাগজের প্রুফ দেখে। ইস্কুলের মাস্টারিটা না ছাড়লেই হতো, আরও কিছুদিন দাঁত কামড়ে লেগে থাকা উচিত ছিল। আসলে ওই স্কুলের হেডমাস্টারটার কান মুলে দেবার আন্তরিক ইচ্ছেটা আমি কিছুতেই চাপতে পারিনি। একেবারে জোচ্চোরের ঘুঘু লোকটা। ও শালার উচিত, শ্মশানের পাশে গিয়ে ব্যবসা করা।

অনেকক্ষণ দাঁড়াবার পর খেয়াল হলো, কেন দাঁড়িয়ে আছি। যদি ট্রামে বা বাসে যেতে যেতে কেউ আমাকে দেখে নেমে পড়ে —বস্তুতঃ আমি সেই প্রতীক্ষা করছিলুম। আমি কারুর কাছে যাবার বদলে যদি কেউ আমার কাছে আসে। কেউ আসে না। মেয়েকলেজ ছুটি হবার পর এই যে অসংখ্য লাল–নীল–হলুদেরা, এরা কেউ আমাকে চেনে না, কেউ আমার কাছে এসে বলবে না, 'আপনি কি তাপসবাবু? নিশ্চয়ই আপনি! আপনার 'উনত্রিশ দাঁতের লোকটা' উপন্যাস তো আমাদের ক্লাশের সব মেয়েরা পড়েছে।

বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে আপনার ছবি দেখেছি।' এসব ভাবতে বেড়ে লাগে। কত লোকের উপন্যাস আরম্ভ হয় এরকমভাবে! আমার বেলা শালা কিছু হলো না! কোনো মেয়েই আমার বই পড়েনি। কোথাও কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ হবার পর যদি শোনে, আমি একজন লেখক, তখন সেইসব মেয়েরা আমসীপানা মুখ করে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি লেখেন?' তাই তো, আমি কী লিখি; কচুপোড়া লিখি, তাছাড়া আর কি!

কোথায় যাবো? অম্লান! দোতলার ছোট গুমোট ঘর, পাশের হোটেলের অ্যাকাউন্টে খাওয়া, হো হো করে হাসবে অম্লান, নার্ভাস গলায় নিজের কবিতা মুখস্থ বলবে, আর চুটিয়ে পরনিন্দা পরচর্চা করা যাবে। এখন বাড়িতে থাকলে হয়। হে ঈশ্বর, অম্লানের যেন টাইফয়েড কিংবা পক্স, অন্ততঃ মাম্‌স হয়ে থাকে। যাতে বিছানায় শুয়ে থাকবে। নইলে ওকে বাড়িতে পাওয়া এ সময়, ঈশ্বর, তোমারও অসাধ্য। অম্লানের ঘরে বহু রাত কাটিয়েছি। যে কোনো প্রোগ্রামে বেশি রাত হয়ে গেলেই অম্লানের বাড়িতে —বারোটারপর পরীক্ষিতের আবার বাস বন্ধ হয়ে যায় —দু'জনে কতবার এসছি এখানে। ওর বাড়ির দরজার ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে খিল খোলা যায়, ঢুকে গেছি ভিতরে, ঘুম থেকে উঠে এসে অম্লান একটুও না চমকে আমাদের ঘরে ডেকেছে —হাসি-হাসি মুখ করে বলেছে, 'রাত্তিরে তো ঘুমোতে দেবে না জানি, বেল্লা করবে, সকালবেলা চা, ডবল ওমলেট সাঁটাবে, সিগারেট সবকটা ধ্বংস করবে —তারপরগাড়িভাড়াও চাইবে নিশ্চয়ই। ওঃ, পদ্যলেখা শুর করে কি অন্যায়ই করেছি! তোদের মতো বন্ধু জুটিয়েছি, ভিখিরিরও অধম। তা জগাই মাধাই, আর একটি কোথায় —কাঙাল হরিদাস?'

পরীক্ষিৎ হাসতে হাসতে বলেছে, ' সে আবার কে রে?'

' কেন, শেখর? তিনজন না হলে তো তোমাদের চলে না। অবিনাশ তো শুনেছি কেটে গেছে, সে নাকি আজকাল ভালো ছেলে! হ্যাঁরে, তোদের যে প্রতিভা আছে, ঠিক জানিস্ তো? না কি এরকম বাওয়া হয়ে শিল্পী সেজে (অম্লান উচ্চারণ করে 'Sil পি)) জীবনটা নষ্ট করবি —শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না? আমি কিন্তু তোদের প্রতিভার এখনও কিছু টের পাইনি।'

সারা ঘরে ছড়ানো বই ও পুরোনো তিনবছরের খবরের কাগজ, মাটির খুরিতে চুরুটের ছাই, জীবনে একবারও না —কাচা বেড সীট, খাটের শিয়রের বইএর র‍্যাক থেকে শবের গন্ধ আসে —অম্লান আমাদের ঠাট্টা করে। অম্লানের ঠাট্টা শুনে পরীক্ষিৎ গম্ভীর হয়ে যায়। আমি হাসতে হাসতে বলি, 'অম্লান, আমি শিল্পীও সাজিনি, জীবনটাও নষ্ট করছি না।' শিল্পীরা কি রকম সাজে, কিভাবে জীবন নষ্ট হয় কে জানে!

অম্লান বাড়িতে নেই।

তিন জায়গায় ব্যর্থ হয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে এলাম। অম্লানের ঘরে তালা বন্ধ, অবিনাশের বাড়িতে গিয়ে শুনলাম অনিমেষ আর গায়ত্রী কলকাতায় এসেছে, আছে ছায়াদের বাড়িতে —অবিনাশ সেখানে। গগনকেও যদি অন্তত পাওয়া যেতো। গগনকে পেলেই সবচেয়ে ভালো হতো, ও নিশ্চিত আমার কথায় অফিস কাটতে রাজী হতো, ওর কাছে সব সময় টাকা থাকে —ওর মতো ডেস্‌প্যারেট কেউ নেই — একটা কিছু ঘটে যেতো। গগনকে গিয়ে ডাকলে বাড়ির দরজায় নেমে আসে গগন, কপালে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে আমার বিনীত প্রস্তাব শোনে, কিছুক্ষণ কি ভাবে, তখন ওর মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না। বোঝাই যায় না, ও আমার কথা শুনছে, না অন্যকথা ভাবছে। রাজী হবে কিনা সন্দেহ, তারপর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে গগন বলে, 'চুপ, একমিনিট দাঁড়া, আসছি।' ঠিক একমিনিট বাদে গায়ে জামা দিয়ে বেরিয়ে আসে গগন, বাড়ি থেকে কুড়ি পা পর্যন্ত গম্ভীর মুখে আসে তারপর একটানে মুখোসটা খুলে বলে, 'মাইরি, চমৎকার দিনটা আজ, চুটিয়ে ফুর্তি করার মতো, চল, কোথায় যাবি বল।'

গগন অফিসের কাজে এলাহাবাদ গেছে। খুব বেঁচে গেছি, মায়ার সঙ্গে প্রেম করার আছিলায় ওদের বাড়ি আজ যাইনি —ওখানে অত লোক দেখলে খুবই খারাপ লাগতো। তিনটে মেয়ে এক বাড়িতে— ছায়া, মায়া, গায়ত্রী, —অনিমেষের মাসতুতো বোন গীতাও কি আর আসেনি! ওখানে গেলেই ভজরং

গজরং করে সময় কাটাতে হতো। একসঙ্গে অত মেয়ে আমার সহ্য হয় না, বড্ড বাজে রসিকতা শুনে হাসতে হয়। আজ আমার সে রকম মেজাজই নেই। অবিনাশটা ওখানে কি করছে কে জানে

অনেকদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আসিনি। সুন্দর নরম ঘাসে ভরে আছে এই দুপুরবেলা। ঘাস দেখে গরুর মতো আনন্দ হচ্ছে আমার। কৃষ্ণচূড়া ফুল খসে খসে পড়েছে। ১৫ই এপ্রিল সব গাছগুলো সম্পূর্ণ লাল হয়ে যায় —বহু বছর লক্ষ্য করেছি। ও পাশের ঐ হলদে ফুলগুলি নাকি রাধাচূড়া —একটি মেয়ে আমাকে বলেছিল। এক সময় এই ঘাসের উপর বহুক্ষণ শুয়ে কাটাতুম। ছায়া আসতো, ছায়াকে টোপ ফেলে অন্য দু' একটা মেয়েকেও টেনে আনা যেতো। একদিন মনে আছে, পুরো দুঘন্টা ভিজেছিলাম এখানে বসে, ছায়ার সঙ্গে বাসন্তী আর নীলা বলে দুটি মেয়ে এসেছিল —প্রচণ্ড বৃষ্টি, সবাই দৌড়ে দৌড়ে পালালো—আমরা বৃষ্টির মধ্যেই বসে রইলুম, দূরের বারান্দা থেকে সবাই আমাদের দেখতে লাগলো – কেয়ারটেকার এসে বললো, 'আপনারা করছেন কি, নিউমোনিয়ায় মরবেন যে!' আমরা অগ্রাহ্য করে তবু বসেছিলাম। মেয়েদুটো হাসছিল খিলখিল করে। ভিজে ব্লাউজ —ব্রেসিয়ার ফুঁড়ে বুকের গোল স্পষ্ট হয়ে উঠলো ওদের —আমি ওদের অশ্লীল গল্প শোনাতে লাগলাম, ক্রমশঃ আধোশোয়া প্রত্যেকটি মেয়ের বুকে ও পিছনে চারটি বাটির মতো গোল দেখে উত্তেজিত হয়ে আমি নীলা বলে মেয়েটির পিছনে আস্তে আস্তে পা দিয়ে টোকা মেরেছিলাম, তারপর, বৃষ্টিশেষে, নীলা কিরকম চমৎকার আমার সঙ্গে একা বাড়ি ফিরতে রাজী হয়ে গেল। সেই নীলা এখন সর্বেশ্বরকে বিয়ে করে মেয়েকলেজের অধ্যাপিকা হয়েছে। একদিন দেখা হবার পর বললো, লেক টাউনে জমি কিনেছে, শিগগিরই বাড়ি তুলবে। একটিমাত্র ছেলে হয়েছে, তার কী নাম রাখবে —সেজন্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখেছিল। বেশ সুখে আছে নীল, এই তো জীবন, এই তো সুখ, সেই বৃষ্টি –ভেজা মাঠে আবার কেউ ফিরী আসে না। আজকাল আর ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আমাদের কেউ আসে না। সবাই পুরো সাহিত্যিক বা অধ্যাপক বা চাকরিতে ঢুকেছে। আমিই শুধু বোকা রয়ে গেলুম।

খুব ক্ষিদে পেয়েছে আমার। সত্যিকারের ক্ষিদে, বিমলেন্দুর সাত–আনা গাড়িভাড়াতেই হাওয়া। সিগারেটও ফুরিয়ে এলো। দুপুরে যে কোনো ভাবেই হোক, পুরো পেট খেতেই হবে, কোনো চালাকি নয়। না খেয়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না। আমার সুখের শরীর, খিদে একেবারে সহ্য হয় না। তা ছাড়া, দুপুরে আর সবাই খাবে, আমি একা কেন না খেয়ে থাকবো? ইয়ার্কি নাকি? আজ বড় ইচ্ছে করছে, মাংসের ঝোল দিয়ে লুচি খেতে। লুচির বদলে ভাত হলেও আমার বিশেষ আপত্তি নেই, কিন্তু মাংস আমার চাই–ই।

লাইব্রেরির দরজায় কার্ড চায়। কোথায় পাবো? বহুদিন ওসব চুকে গেছে। অনেকরকম বোঝাবার চেষ্টা করলুম, ঘাড়মোটা নেপালী হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। লোকটার হাত জড়িয়ে ধরে বললাম, 'দে ভাই, একটু ঢুকতে দে, বড় ক্ষিদে পেয়েছে!' লোকটা তবুও শোনে না। তখন আমি বললুম, 'লাইবিরিমে হামারা লিখা একটা কেতাব হ্যায়, জান্‌তা? হামসে কার্ড চাও মাৎ, দু'দশ বরষ বাদ হিঁয়া পর হামারা ফটো ঝুলেগা, সমঝা?' লোকটা বললো, 'নেই সাব, কার্ড দেখাইয়ে।' তখন আমাকে নিজের ব্যবস্থা করতে হলো। এইসব সরকারি বোকামির প্রতিষেধক আমি জানি। গেট থেকে কয়েক –পা পিছিয়ে এলাম, বারান্দায়, যেখানে দুপাশে ফুলের টব, এদিক ওদিক তাকালাম আকাশের দিকে, নেপালীটা আমাকে লক্ষ্য করছে। হঠাৎ আমি গণ্ডারের মতো খানিকটা মোশান নিয়ে প্রবল বেগে দৌড়ে নেপালীটাকে ভেদ করে গেট দিয়ে ঢুকে গেলাম। লোকটা 'আরে আরে' বলে পেছনে ছুটলো —আমি তিনজনকে ধাক্কা মেরে, একটা মেয়েকে ধাক্কা বাঁচাতে গিয়ে পিছলে পড়তে অন্য একটা মেয়ের হাত থেকে সাতখানা বই ফেলে দিয়ে ক্যাটালগ কেবিন খানাকে বোঁ বোঁ করে তিনটে পাক দিয়ে —যতক্ষণে নেপালীটা আমাকে ছুঁয়ে ফেললো —ততক্ষণে আমি লেন্ডিং সেকশানের কাউন্টারে একটা লোকের হাত চেপে ধরেছি ও বলেছি, 'অশোক, অশোক, দ্যাখ, একি উৎপাত। তোর সঙ্গে দেখা করতে আসবো, তবু কার্ড চাইছে!' গোলমালে অনেক লোক পড়া থামিয়েছে ও মজাখোর লোকেরা ভিড় জমিয়েছে আমার

চারপাশে, নেপালীটা হাত ধরে টানবার চেষ্টা ছাড়েনি। দীর্ঘ সবল কালো অশোক শান্ত চোখ তুলে বললো, 'কি, কার্ড আনেননি? ছোড় দেও দারোয়ান, হামারা চেনা আদমি হ্যায়।' আমি অশোকের ব্যবহারে থমকে গেলুম। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকালুম অশোকের দিকে। 'আপনি' বলে কথা বলছে আমার সঙ্গে, দু-তিন মাস আগেও তো ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। অশোক বললো, 'কোনো বই দরকার থাকে যদি, তবে ঘুরে-টুরো দেখুন; আমি একটু ব্যস্ত এখন।'

আমি তবু করলুম না, গোঁ মেরে দাঁড়িয়ে থেকে বললুম, ' তোর সঙ্গে একটু দরকার আছে, অশোক।' এক মিনিট আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কাউন্টারের দরজা খুলে বললো, ' ভেতরে আসুন।'

অশোকের কাছে খেতে চাইবো ভেবেছিলাম কিন্তু ওর অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা ব্যবহারে কি রকম ভ্যাবচাকা মেরে গেলাম কি ব্যাপার, অশোক আমার সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করতে চাইছে? আমি বললুম, ' তোর কি ব্যাপার, তুই কেমন আছিস?' আমি ওর কাঁধে চাপড় মারলুম।

'ভালোই! বিশেষ কিছু বলবেন?' —সেই রকমই ঠাণ্ডা গলা অশোকের। 'না বিশেষ কিছু না। এমনিই'—

'তা হলে—'। এই বলে অশোক এমনভাবে থেমে গেল যে 'এখন যাও' আর বলতে হলো না। আমি 'আচ্ছা চলি' বলে পিছন ফিরলুম। অশোক আমার কাছে এসে গলার আওয়াজ নিচু করে বললো, 'ওঃ, আপনাদের জানানো হয়নি, মাসখানেক আগে আমি বিয়ে করেছি। —আচ্ছা পরে দেখা হবে।' আমি স্তম্ভিতভাবে অশোকের দিকে ফিরে তাকালুম। জিজ্ঞেস করলুম, 'বিয়ে করেছিস মানে? আমাদের খবর দিলি না? কী ব্যাপার তোর?' অশোক আলগাভাবে বললো, 'খুব ব্যস্ত ছিলাম, বেশী লোককে বলা হয় নি।' বেশী লোক আর আমি? অশোক আর একটিও কথা না বলে কাজে মন দিয়েছে। আমি বেরিয়ে এলুম। এরকম আশ্চর্য আমি বহুদিন হইনি। একি রহস্য! খুব স্পষ্ট মনে পড়ছে, অশোকের সঙ্গে জীবনে কখানো খারাপ ব্যবহার করিনি। টাকা ধার নিয়ে মেরে দিইনি। বেশ চমৎকার বন্ধুত্ব ছিল এক সময়। এক মেসে এক সঙ্গে দু'বছর কাটিয়েছি। হঠাৎ অশোক আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয় অস্বীকার করতে চাইছে—। কেন? কি জানি! বিয়ে করেছে, নেমন্তন্নও করেনি। এর কোনোরকম কারণই মনে পড়ে না। খানিকটা দূরে গিয়ে অশোকের দিকে ফিরে তাকালুম। মহাত্মা গান্ধীর ছবির নীচে অশোক মুখ নিচু করে কাজ করছে, এদিকে চেয়েও দেখছে না, —সারাদিনে এই প্রথম আমার বিষম মন খারাপ লাগলো। খালি পেট ও মন খারাপ এই দুটো একসঙ্গে থাকা খুবই বিচ্ছিরি। অশোকের কাছে খেতে চাইবো ভেবেছিলাম, তাও হলো না, অথচ অশোক আমার মন খারাপ করে দিলে। মানুষ এত নিষ্ঠুর!

হলঘরের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে হেঁটে গেলাম আস্তে আস্তে। নিওন আলোর নীচে ঝুঁকে-পড়া মুখগুলি ভালো করে খুঁজে খুঁজে দেখলুম। না, আমার কেউ চেনা নেই। আমাকেও কেউ চেনে না। এক সময় প্রায় আদ্ধেক লোক চেনা থাকতো শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে টেবিলে, দুপাশের ঝুঁকে-পড়া পড়ুয়াদের দেখে হঠাৎ যেন মনে হলো —লঙ্গখানায় ভিখিরিরা খেতে বসেছে। লাইব্রেরি কোনোদিন আমার এত খারাপ লাগেনি। মহাপুরুষের উক্তি চারদিকে কোল হল করে। অসহ্য কোলাহল।

উর্দু অ্যালকভে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক চিরঞ্জীব রায়চৌধুরী বসে আছেন। বুঝলুম, আর একখানা থানইট বাজারে ছাড়বার মতলব। আজকাল আবার নবেলের মধ্যে দু'এখানা ইংরেজী কোটেসান.-ফোটেসান থাকলে লোকে খুব আধুনিক মনে করে —চিরঞ্জীব রায়চৌধুরীরাও এসব জেনে গেছেন। তাই বুঝি ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে—তা ছাড়া বিনা পয়সায় পাখার হাওয়া। আমি চিরঞ্জীব রায়চৌধুরীর কাছে গিয়ে বললুম, 'কেমন আছো! নতুন উপন্যাস বুঝি?'

'এই যে, কেমন আছো তপেশ? তারপর —(হাত দিয়ে যে বইটা থেকে টুকছিলেন তার নাম আড়াল করে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার বইটা পড়েছি, সবটা পড়েছি, বুঝলে, বেশ ভালোই হয়েছে, প্রথম তো, খুবই ভালো হয়েছে, তোমার হাত আছে তপেশ, লিখে যাও, বুঝলে'—

আমি গোল গোল চোখে মোলায়েম গলায় বললুম, 'আপনি কষ্ট করে সবটা পড়লেন?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই, বলো কি, তরুণ লেখকদের লেখা না পড়লে কি আর সাহিত্যের পালস বোঝা যায়?' ভদ্রলোক হাঃ হাঃ করে হাসলেন। এই নিয়ে সাতাশবার এই অশ্লীলকে আমি বলেছি যে আমার নাম তপেশ নয়, তাপস। নামটাই উচ্চারণ করতে শেখেনি —ও আমার বই পড়েছে। আমার বই পড়লে ও এইরকম নিশ্চিন্তে বসে লিখতে পারতো কিংবা বোকার মতো হাসতো? তা হলে এতদিনে ওর অম্বলের অসুখ হতো না? বস্তুতঃ লোকটার ব্যবহারে আমি এমন অসম্ভব চটে গেলুম যে, ওকে কি শাস্তি দেবো মনে মনে ভাবতে লাগলুম। এই মুহূর্তে ওর নাকে মুলে দেবো না পকেট মারবো —এই নিয়ে দ্বিধা করলুম খানিকক্ষণ। পকেটে একটা পাঁচ নয়া পয়সা নিয়ে হেডটল করতে লাগলুম। হেড নাকমলা, টেল পকেটমারা। ওর সঙ্গে অন্যান্য কথা বলতে বলতে পয়সাটা বার করে দেখলুম। টেল। জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি এবার কি নিয়ে লিখছেন, স্যার?' —এক সময় উনি আমার অধ্যাপক ছিলেন।

'এবার খুব বড় থীম ধরেছি ভাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ —সব মিলিয়ে বিরাট প্ল্যান। এর মধ্যে একটি নায়ক আর তিনটি নায়িকার জীবন –দর্শন। হাজার –পাতার বই হবে অন্তত, স্বল পাইকা।'

'নায়ক কিসে মরেছে এবার? ট্রেনের নিচে সুইসাইড?'

'না হে, প্রত্যেকবার একরকম হয় না। বন্যায় ভেসে যাবে।'

'ওফ্,' আমি অভিভূত গলায় বললুম 'কতটা লিখলেন?'

'সাতদিনে প্রায় ওয়ান ফিফথ লিখে ফেলেছি। এখন যুদ্ধের ব্যাপারে মুসোলিনির একটা স্পীচ ঢোকাবো।'

'আপনাকে খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে। চলুন, চা খেয়ে আসি।'

'চলো যাই, হ্যাঁ, অনেকক্ষণ বসে আছি। খাটতে হয় হে, ফাঁকি দিয়ে সাহিত্য হয় না। বিনা পরিশ্রমে ইতিহাসে আসন পাওয়া যায় না'—

'আপনার আগের বইটা কত এডিশন হলো, তেরো না চোদ্দ?'

'একুশ চলছে। বম্বে থেকে কিনেছে শুনোনি? তেলেগু ভাষায় অনুবাদ বেরুচ্ছে এমাসে।'

ক্যান্টিনে খুব ভিড় ছিল, আমি ওঁকে চিড়িয়াখানার ভেতরের দোকানে নিয়ে এলাম।

ঢুকেই আমি পাঁচ সাত রকমের ঢালা অর্ডার দিয়ে দিলাম। 'ওকি, ওকি,' ভদ্রলোক হ্যাঁ হ্যাঁ করে উঠলেন, 'অত খাবার কে খাবে? তুমি কি খেয়ে আসোনি নাকি?'

আমি বিগলিত ভাবে বললুম, 'আপত্তি করবেন না আজ, অনেকদিন বাড়ে আপনাকে পেয়েছি। আজ আমি আপনাকে খাওয়াবো। আপনি আমার বইটা পড়েছেন কষ্ট করে—'

'না, না, তা কি হয়, কি খাবে খাও না, পয়সার জন্য কি। আমি বয়োঃজ্যেষ্ঠ, তুমি পয়সা দেবে কেন? আমার আবার অম্বলের'—খানিকক্ষণ চুপচাপ প্লেট সাবাড় করার পর বললুম, 'আপনি তবু আমার বইটা পড়েছেন–ওমুক–ওমুক বিখ্যাত লেখকেরা তো উল্টেও দেখেননি। সব শালা বিখ্যাত সাহিত্যিক।'

প্রসন্ন মুখে চিরঞ্জীববাবু বললেন, ' তোমার আবার রাগলে ভাষাজ্ঞান থাকে না। বুঝলে, অনেকে বোঝেন না যে ইয়ং ব্লাডই হলো সাহিত্যের —' হঠাৎ চিরঞ্জীব রায় চৌধুরীর মুখের রেখা কোমল হয়ে এলো। একটু আলতো ভাবে বললেন, 'পয়সার লোভটা বড় সাংঘাতিক —সবাই ও লোভ সামলাতে পারে না। আমিও যে ঠিক পেরেছি, তা বলতে পারি না। টাকার লোভে অনেক সময় হেলাফেলা করে বাজে লেখা লিখেছি। কিন্তু কি জানো, এখানো আমার মাঝে মাঝেই মনে পড়ে

তোমাদের বয়েসটা —যখন সাহিত্যই ছিল ধ্যান-জ্ঞান, সাহিত্যের জন্য সাধানা করেছি। বুঝলে টাকা-পয়সা কিছু না—'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সেকি, টাকা-পয়সা কিছু না তো আপনি লেখেন কেন? আমি তো দু'চারটে টাকা পাবার আশাতেই লিখি। নইলে আর লেখার কি দরকার?'

'যাঃ এটা তোমার বানানো কথা। তোমাদের এই বয়েসে টাকা-পয়সা কিছু না- সাহিত্যই হচ্ছে —।'

'চিকেন স্টু -টা কিন্তু চমৎকার করেছে, একটু খেয়ে দেখুন।' আমি বললুম হাত মুছে কফিতে চুমুক দিতে দিতে। তিনি বললেন, 'সিগারেট আছে তোমার কাছে?' ছিল। কী যেন ভেবে তবু বললুম, বললুম, ডাকতে যেতেই আমি বললুম, 'দিন, আমি নিয়ে আসছি। কি সিগারেট?'

—গোল্ডফ্লেক।

—বসুন, এসে আপনার উপন্যাসের প্লটটা শুনবো।

দোকান থেকে বেরিয়েই একটি অত্যন্ত সুন্দরী কিশোরী মেয়েকে দেখতে পেলাম। সাদা ফ্রক-পরা, রাজহংসীর মতো। মেয়েটার পেছনে পেছনে খানিকটা গেলাম। তিনচার জন মহিলা, দুটি বাচ্চা, দুজন পুরুষের একটি দলের মধ্যে ঐ মেয়েটি। মেয়েটি কী কারণে যেন অভিমান করেছে, মুখখানি তাই ঈষৎ থমথমে। ঐ অভিমানের জন্যই ওর মুখখানা কী অপরূপ হয়ে উঠেছে। মেয়েটিকে মনে হয় —ঐ দলটা থেকে একেবারে আলাদা। বস্তুত সারা পৃথিবীর থেকেই ওকে আলাদা মনে হয়। মেয়েটি চুম্বকের মতন আমায় টানলো। মেয়েটা গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। আমিও বাইরে এলাম। বেরিয়েই দেখলুম, একটা বিরাট ষ্টেশন ওয়াগান, মেয়েটি দলবলের সঙ্গে সেটাতে উঠছে। মেয়েটির সঙ্গে একবারও আমার চোখাচোখি হয়নি। ও আমাকে দেখেনি। আমিও ইহজীবনে ওকে আর দেখবো না। গাড়িটা চলে যেতেই আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। তারপর চোখে পড়লো সামনেই একটা থ্রি বি বাস। এই বাস এমনই দুর্লভ যে দেখামাত্র আর অন্য কোন কথা আমার মনে হলো না। বাসটা স্টার্ট দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি দৌড়ে উঠে পড়লুম। এবার দু'টাকার নোটখানা ভাঙিয়ে টিকিট কাটতে কোনো অসুবিধে হয় না। ফেরৎ খুচরোটা পকেটে রাখবার পর নিজেকে বেশ ধনী মনে হয়। একটা পাঁচ নয়া ছুঁড়ে সার্কুলার রোডের বুড়ি পাগলিটাকে দিলাম।

এবার? রোদ্দুর ও ছায়ার মধ্যে দিয়ে বাস ছুটে যায়। লোকজন ওঠে ও নামে। আমি কোথায় নামবো জানিনা। এসপ্লানেড পর্যন্ত টিকিট কিনেছি। এবার কোথায় যাবো? এখনও দীর্ঘসময় পড়ে আছে। আবার কি গোড়া থেকে খোঁজা শুরু করবো? ন্যাশানাল লাইব্রেরিতেই তো বিকেলটা কাটাতে পারতুম। কোনোরকম ইংরেজিটা পড়তে পারি —অনিমেষ বা বিমলেন্দুর মতো না হলেও, এককালে তো কিছু ইংরেজি বইও পড়েছি। সিলিনের বইটা আদ্দেক পড়েছিলাম পাঁচমাস আগে —সেটা শেষ করা যেতো। কিংবা রিকুইজিশান স্লিপের গোছার উল্টোপিঠে একটা ছোট গল্পও মকশ করতে পারতুম, লিখলে দু'চারটে টাকাও কি আর পাওয়া যেত না, টাকার জন্য কম উঞ্ছবৃত্তি না করে। কিন্তু পড়তে বা লিখতে কিছুই ভালো লাগে না। যেন একটা বাঁশের খাঁচায় বন্দী আছি, দাঁত দিয়ে কেটে খাঁচা ভেঙে সহজেই বেরুতে পারি, বেরুতে ইচ্ছে করছে না বলেই আটকা রয়েছি। হঠাৎ একথাটা কেন মনে হলো? খাঁচা ফাঁকা আসলে বাজে হ্যাক। কিন্তু এ তো মহামুস্কিল, এখন কোথায় যাই? মহাশূন্যে রকেটে যারা যায় —পৌঁছুতে পারুক বা নাই পারুক, তারাও জানে, তারা কোথায় যাবে। আমি জানি নি। মৃত্যুর পর শরীরের পঞ্চভূত জানে, তারা কোথায় যাবে। আমি জানি না। খুনী আসামীও জানে সে কোথায় যাবে, আমি —নাঃ, এরকম ভাবে দিন কাটে না। এবার যার কাছে যাবো, দেখা না পেলে আমি ভয়ংকর চটে যাবো তার ওপর, প্রতিশোধ নেবো, দরকার হলে তার নামে থানায় ডাইরি করে আসবো। বাকি আছে

শেখর। দেখি শেখরকে। কিছু পয়সাকড়ি পেলে পুরী কিংবা কাশীতে ঘুরে এলে বোধহয় ভালো লাগতো। চিরঞ্জীববাবুর সঙ্গে পরে যখন আবার দেখা হবে প্রথমেই পায়ের ধুলো নিয়ে এমন ভুলিয়ে দেবো।

শেখর বাড়িতেই। কারণ, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজায় টোকা মেরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর বিনা শব্দে দরজা খুলে গেল। খালি গায়ে শেখর, একটা ধুতি জড়িয়ে পরা, আমার দিকে ভুরু তুলে বললো, 'কি ব্যাপার, তুই?'

একটু থতমত খেয়ে বললাম, 'এমনি এলাম।'

'হঠাৎ এ সময়?'

আমি কি ভুল শুনছি, আমি বুঝতে পারলুম না। নাকি কোনো বিদেশে এসেছি, যেখানে কারুকে চিনি না? নাকি রিপভ্যানের মতো দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে উঠে দেখছি হঠাৎ সব বদলে গেছে? নচেৎ, শেখর! শেখর বলছে, হঠাৎ এ সময়? যেন আমাকে চেনেই না, সেই শেখর, যে আমাকে —, আমি যাকে —যে আমাদের, আমরা যাকে —। সেই শেখর যে সিনেমা দেখতে গিয়ে অবধারিত গণ্ডগোল বাধাবে —'ও দাদা টাক চুলকুনো থামান,' 'ও ডানদিকের মশাই, প্রেমালাপটা একটা আস্তে,' কিংবা 'এই যে, সিনেমাটা পিছনের দিকে নয়, সামনের দিকে' —এইসব দিয়ে প্রত্যেকদিন ঝগড়া বাধাবে আর আমরা ওকে বাঁচাবো, আর যে শেখর মদ খেয়ে রাস্তায় শুয়ে পড়লে আমরা ওকে লরিচাপা থেকে বাঁচাতে যাই — যে শেখর কবিতার জন্য বাড়ি পুড়িয়ে দিতে পারে, ছ'বছর ধরে যে কবিতার পত্রিকা বার করে বাপের টাকা ওড়াচ্ছে, পরশুদিনও যে শেখরের সঙ্গে আমি তিনঘন্টা কাটিয়েছি। হঠাৎ কেন জানিনা, আমার চোখে জল এসে গেল। সত্যিকারের কান্নার চোখে, আমি চোখ নিচু করলুম। অশোক প্রথম আঘাত দিয়েছিল, তারপর শেখর।

শেখর মুখ কালো করে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর বললো, 'দাঁড়া, আমি আসছি, সিগারেট কিনতে বেরুবো।' শেখর আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে গেল! আমাকে ভেতরে যেতে বললো না। না বলুক, কিন্তু দরজাটা ভেজানো, আমি কি চলে যাবো? কেন এবং কোথায় যাবো? আমি শেখরের ওপর যথেষ্ট রেগে যেতেও পারছি না, তার বদলে আমার মন ভেঙে আসছে। শেখর চটি গলিয়ে চট করে ফিরে এলো। কোনো কথা না বলে কিছুক্ষণ হাঁটলুম। তারপর সদর পেরিয়ে আসার পর ও বোমার মত ফেটে পড়লোঃ 'ইডিয়েট, রাস্কেল, অশ্লীল অশ্লীল, তোকে না অত করে বললুম সেদিন" দুপুর বেলা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ দেখলে খবরদার আমাকে ডাকবি না।'

'কেন রে?' আমি সম্পূর্ণ আকাশ থেকে নরকে পড়লুম।

'ফের— মি করছিস্?

'সত্যি, আমি কিছুই জানি না, বিশ্বাস কর।'

'বিশ্বাস করলো, আমাকে ডোবাবার মতলব'—

'না, না, সত্যি শেখর, বিশ্বাস কর, আমার কিছুই মনে নেই,' —শেখর বুঝতে পারেনি, কিন্তু আমার গলা কান্নায় বন্ধ হয়ে আসছিল।

'সেদিন বলিনি তোকে যে দুপুরবেলা একটা বিরাট বড়লোকের মেয়েকে প্রাইভেট পড়াচ্ছি। মাসে আড়াই শো দেবে —তা ছাড়া গেঁথে ফেলতে পারলে —'

'একদম মনে ছিল না, সত্যিই —'

'মনে ছিল না? কে ন ছি —ল না? যদি দেকে কতগুলো লোফার ছ্যাবড়া সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব' —শেখর এই কথাটা হেসে বলেছিল। আমি শেখরকে মোটে ঈর্ষা করলুম না। বরং খানিকটা যেন করুণা হলো। বললুম, যাঃ আমাকে মোটেই লোফার কিংবা ছ্যাঁবড়া সাহিত্যিকের মতো দেখতে নয়। প্রায় তোর মতোই ভালো চেহারা আমার।'

'এখন কেটে পড় ভাই। আমাকে চান্স দে।'

আমি অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে চোখ মুছে নিলাম। শেখরকে ছাড়তে কিছুতেই ইচ্ছে হচ্ছিল না। শেখর আমার শেষ আশ্রয়। একটা মেয়ের জন্য শেখর এমন চমৎকার দুপুরটা নষ্ট করছে। আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে? আমি বললুম —'শেখর।' শেখর মুখ তুলে বললো, 'কি।' আমি পুনরায় বললুম, 'শেখর—।' শেখর বললো, 'কি ন্যাকামি করছিস।' আমি বললুম, 'শেখর, সকাল থেকে খুব খারাপ লাগছে, মানে বিচ্ছিরি লাগছে, আর কি! 'খুব কবিতা পড়তে ইচ্ছে করছে, তাই তোর কাছে এলাম।'

শেখর এতেও গলৃলো না। বললো, 'কবিতা পড়ার ইচ্ছে? এই দুপুরবেলা? ন্যাকামির একটা সীমা আছে। তা তোর ইচ্ছে হয়েছে, তুই গঙ্গার পাড়ে বসে দখিন হাওয়া খেতে খেতে কবিতা পড় গিয়ে। আমার এখন সময় নেই, ভাই।'

'বিশ্বাস কর, আজ হঠাৎ খুব রিল্‌কের কবিতা পড়তে ইচ্ছে করছে। তোর রিল্‌কের কালেকশানটা দে। পার্কে বসে পড়বো।'

'কবিতা পড়বি, তাও আবার রিল্‌কের কবিতা? শখ কম নয় তো!'

'তুই তো জানিস, আমি রিল্‌কের কবিতা কত ভালোবাসি। আমি রিল্‌কের মূল্য বুঝি।'

'তুই কবিতা কিছুই বুঝিই বুঝিস না। বরং জেন জেনের 'আওয়ার লেডি অব দি ফ্লাওয়ার্স' পড়, তোর কাজে লাগবে।'

'না, আমি রিল্‌কে চাই।'

শেখর দাঁড়িয়ে রইলো খানিকটা চুপ করে। সিগারেট টানলো। বললো, 'আচ্ছা দাঁড়া, এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সন্ধ্যের পর দেখা করবো।' আমি বললুম, 'কাপড়টা ফেরতা দিয়ে পরে নে শেখর। জমিদারের মেয়ের সামনে অমনভাবে বসতে নেই।'

চামড়ায় বাঁধানো রিল্‌কের কালেকশানটা পেয়ে আমি বুকে চেপে ধরে রাস্তায় বেরিয়ে এলুম। যেন মহামূল্যবান সম্পদ আমার বুকে। এতক্ষণে আমার অনিশ্চিত নিঃসঙ্গতার বোঝা কাটবে নিশ্চিত। আ, রিল্‌কে, তোমাকে আমি কত ভালোবাসি। সারা পৃথিবীর লোক তোমার ভক্ত, এখনও তরুণরা তোমার লেখা কিনে পড়ে। কত সাধনায় তোমাকে পেয়েছি, অথচ এক মিনিটে।

আমি জানি, তুমি কত বড় কবি, যদিও জীবনে এক লাইনও পড়িনি। পৃথিবীময় তোমার ভক্ত, তাই তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা এত প্রগাঢ়। তুমি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড়, কারণ শতবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথের সুলভ গ্রন্থাবলী বেরিয়েছে কিন্তু তোমার কোনো পেপার ব্যাক এডিসান নেই। তুমি কি বাঙলা দেশের কথা জানতে —বাংলাদেশেও এখন তোমার প্রতি ভক্তির ঢেউ বইছে। তোমার গোলাপ কাঁটায় –বেঁধা বুকের রক্তের কবিতা। —বইটার একটা পাতা ওল্টাতেও আমার ভয় করলো, যেন আমার চোখ আটকে যাবে। আমি সোজা বাসে চেপে এলাম কলেজস্ট্রীটে ফুটপাতের পুরোনো বই–এর দোকানে। এসে বললাম, 'এই নাও, ভালো মাল এনেছি।'

লোকটা লুঙ্গি তুলে উরু চুলকোচ্ছিল। বইটা হাতে নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আড়চোখে আমার দিকে চেয়ে বললে, 'আজকাল তেমন চলে না এ বই।'

'ওসব ফিকির ছাড়ো মিঞা, রিল্‌কে চলে না তুমি আমাকে বোঝাবে?'

'না, একটু মারকেট পড়ে গেছে। সেদিন যে মারি স্টোপ্‌স এনেছিলেন—'

'ভাগ! সোনালী চশমা পরা মেয়েরা, লম্বা চুল বাবুরা কিংবা হাওয়াই কোর্তা–পরা ছোকরারা এ বই লুফে নেবে।'

'না, সত্যি বলছি, আজকাল —'

'যাঃ যাঃ, কালও আমি এখানে দাঁড়িয়ে শুনে গেছি এক জোড়া ছোকরা-ছুকরি খোঁজ করে গেল। ব্রাণ্ডনিউমাল,দেখো।'

লোকটা একটু হেসে বললো, লেকিন নাম লেখা আছে, তুলতে হবে।'

'ও তো একটু ক্লোরিন ঘষার মামলা। ঝুট-ঝামেলা করো না, কত দেবে বলো?'

অনেক দর-কষাকষির পর আট টাকা পাওয়া গেল। সারাদিন এইটাই সবচেয়ে বড় সাকশেস। আর কিছু চাই না। পরশু পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। এখন একটু কফি খাওয়া যেতে পারে। এখন কারুর দেখা না পেলেও আমার আর একা লাগবে না। পকেটে আট টাকা আছে সঙ্গী! চিরঞ্জীবের টাকাটা দিয়েই কফি-টফি খাওয়া যাবে। ঐ টাকায় এক প্যাকেট গোল্ডফ্লেক কিনলাম, কেননা উনি গোল্ডফ্লেকই কিনতে বলেছিলেন। প্রায় বছর পাঁচেক বাদে আমি নিজের হাতে নিজের টাকায় গোল্ডফ্লেক কিনলাম। এত দাম বেড়ে গেছে জানতুম না। কারা খায় এসব!

কফি হাউসের জানলার পাশের টেবিলে একা পরীক্ষিৎ বসেছিল। বিশাল লম্বা শরীরটা নিয়ে ঝুঁকে আছে পরীক্ষিৎ। একটা দু-বুক পকেটওয়ালা খাঁকির জামা পরেছে। পরীক্ষিৎ আমার চেয়ে প্রায় আধফুট লম্বা, স্পষ্ট, সত্যজিৎ রায়ের মতো চোয়াল, ওর শরীরটা আমি ঈর্ষা করি। আমি পাশে দাঁড়াতেই ও মুখ তুললো পরীক্ষিতের চোখদুটো অসম্ভব লাল। বললো, 'সারাদিন কোথায় ছিলি? তোর মেসে গিয়েছিলাম দুপুরে।'

আমি যে সারাদিন যে কোনো বন্ধুকে হন্যে হয়ে খুঁজেছি সেকথা ওকে জানালুম না। বললাম, 'অনিমেষ আর গায়ত্রী এসেছে, শুনেছিস?'

'শুনেছি।'

'দেখা হয়নি তোর সঙ্গে?'

'হু! ওরা ফিল্‌ম্ দেখতে গেল।'

'অবিনাশও?'

'না, অবিনাশ ওখানে নেই। ছিল, ছায়ার সঙ্গে কি যেন ঝগড়া করে চলে গেছে।'

'কিসেরঝগড়া?'

'কে জানে। ওর মতলব বোঝা আমার কম্ম নয়।'

'তোকে এরকম দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ?'

'কাল জ্বর হয়েছিল রাত্রে কুচ্ছিৎ স্বপ্ন দেখেছি। মাথার ঠিক মাঝখানে খুব ব্যথা হচ্ছে আজ। তোর কাছে টাকাকড়ি আছে কিছু?'

'কেন, ওষধ কিনবি?'

'হ্যাঁ! অনেকদিন, দিনসাতেক খাইনি একটা পয়সা নেই হাতে দিনসাতেক অফিস —টফিস যাচ্ছি না।'

'চল্ যাই। বাংলা-টাংলা হতে পারে, অল্প আছে। কিংবা কলাবাগানেও যেতে পারি। আমারও খুব ইচ্ছেকরছেসারাদিন।'

পরীক্ষিৎ হাত দিয়ে কপালটা টিপছিল। সত্যি খুব ব্যথা হচ্ছে বুঝতে পারলুম। ব্যথটা কি রকম রে? ডাক্তার দেখাবি নাকি?'

'একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, জানিস তাপস। বছরখানেক আগে যে অনিমেষের খানে ব্রীজ থেকে পড়ে মাথা ফেটেছিল, এতদিন পর আবার ঠিক সেইখানে ব্যথা হচ্ছে।

'সেলাই গণ্ডগোল হয়েছিল নাকি? অনেক সময় ও -থেকে বিচ্ছিরি জিনিস হয়।'

পরীক্ষিৎ আমার দিকে রক্তবর্ণ চোখ তুলে তাকিয়ে অসহায় গলায় বললো, 'আমি অবিনাশকে খুঁজছি। ওর কাছে একটা কথা জিজ্ঞেস না করলে, আমার ব্যথা কমবে না, আমি জানি।'

'অবিনাশ কি করবে?'

'এতদিন পর, জানিস, আমার মনে হচ্ছে, আমি কি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম, না অবিনাশ আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল?'

'যাস শালা, তোর কি মাথা খারাপ! তুই এক একবার এক এক রকম বলিস।'

'কিন্তু অ্যাদ্দিন বাদে, এ কথাটা আমার মনেই বা হলো কেন? আর, মনে হওয়ার পর থেকেই মাথায় যন্ত্রণাটা শুরু হয়েছে।'

'কিন্তু অবিনাশ যদি তোকে ফেলে দিয়ে থাকে, তবে অবিনাশই আবার বাঁচিয়েছে–এ কথাটাও জেনে রাখিস। আমি ছিলুম সেখানে।'

'একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস? অবিনাশ আমাকে কিরকম এড়িয়ে এড়িয়ে পালাচ্ছে? বহুদিন ওর সঙ্গে ভালো করে কথাই হয় না। দেখা হলেও ভিড়ের মধ্যে চালাকি করে অন্য কথায় চলেযায়।'

'অবিনাশ তো বলছে, ও সরল, স্বাভাবিক জীবন কাটাতে চায়। লেখাফেখার ইচ্ছে নেই। বিয়ে করে দীর্ঘ সুখী জীবন কাটাবে।'

'কিন্তু যে রকমভাবে দিন কাটাচ্ছে, সেটা কি?'

'ওটা একেবারে দাগী আসামী। সরলতা মানে যে ওর কাছে কি, তা বোঝা অসাধ্য। মায়াকে নিয়ে কি কাণ্ড করছে, কে জানে!'

'মায়াকেনিয়ে!'

'তুই জানিস না; মায়াকে নিয়ে পুরী বেড়াতে যাবে ঠিক করেছিল। মায়া হঠাৎ হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত গিয়েও ফিরে আসে। তার পরও অবশ্য মায়া ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মায়াকে নিয়ে সম্ভবতঃ ও একটা গভীর গণ্ডগোল পাকাবে।' (এ গল্পটা আমি সম্পূর্ণ বানিয়ে বললুম পরীক্ষিতের কাছে। কেন, বানালুম, কি জানি–সম্পূর্ণ অজান্তে অবিনাশ ও মায়া সম্বন্ধে এই কাহিনী আমার মুখ থেকে গড়গড় করে বেরিয়ে এলো।)

'না, গণ্ডগোল মায়াকে নিয়ে না, অন্য একজনের সঙ্গে।' পরীক্ষিৎ বললো।

'কে?'

'তোকে বলে লাভ নেই, তুই কোনো জিনিস ভালো করে ভেবে দেখতে চাস না। তোর কাছে—জীবন মানে এই মুহূর্তে বসে থাকা। কাল কিংবা ভবিষ্যতে কি করবি, তোর কোনো ধারণাইনেই।'

'চল, উঠি'–

'অবিনাশকে তুই–ই বেশি পাত্তা দিয়েছিস। ওকে হীরো বানিয়েছিস। ওর মধ্যে কি আছে? শুধুই স্টান্টবাজি। ওর সঙ্গে আমার আলাদা বোঝাপড়া আছে। কেন আমার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, জানতে হবে।'

জানতে হবে—এই কথাটা পরীক্ষিৎ সন্ত–পুরুষের মতো শান্ত গলায় বললো, যেন ওর মধ্যে দিব্যজ্ঞানের তৃষ্ণা। আমি বললুম, 'চল, কোনো ডাক্তারের কাছেই যাই। আমার কাছে গোটা আষ্টেক টাকা আছে।'

'থাক, কাল কি পরশু যাবো। আজ চল কিছু খাই। ভালো লাগছে না। তবে ঐ আট টাকাই খরচ করতে পারবি তো? আমার কাছে কিছু নেই কিন্তু।'

চল, অন্য কেউ আসবার আগেই উঠে পড়ি।'

পরীক্ষিৎ ক্ষেপে গিয়েছিল। ঘন্টখানেকের মধ্যেই সব টাকা চেটে পুটে শেষ করে দিলো খালাসীটোলা বন্ধ হয়ে যেতে পরীক্ষিৎ বললো, 'চল, টালিগঞ্জে শশাঙ্কর কাছে যাই।'

বেরিয়ে পরীক্ষিৎ তীরের মতো ছুটে রাস্তা পার হয়ে গেল, আবার লাফাতে লাফাতে ফিরে এসে বললো, 'আমার শরীর জ্বলছে, তাপস।'

পরীক্ষিতের মাথার চুল খাড়া হয়ে গেছে, চোখদুটি ছল ছল, সারা মুখে শুধু প্রহরীর তলোয়ারের মতো নাকটা জেগে আছে। ঝুললুম, ওকে শয়তান ভর করেছে। বললুম, 'শশাঙ্কর কাছে কেন?'

'শশাঙ্কর এক বন্ধুর দোকান আছে। মাঝে মাঝে ব্যবস্থা করে খাওয়ায়। চল না, আঃ, চল না, কেন দেরি করছিস?'

শশাঙ্ক নিরীহ চেহারার একটি বদমাইসীর ডিপো। কাতর মুখভঙ্গী করে দুনিয়ার যতো খারাপ খারাপ কথা বলে। ভালোই লেখে, কিন্তু ওর নবেল আজ পর্যন্ত পড়ে শেষ করতে পারিনি। পরীক্ষিৎ বিকট মোটা গলায় শশাঙ্ককে ডেকে নামালো। স্পষ্ট বোঝা গেল, শশাঙ্ক লিখছিলো। কারণ, ওর বিব্রত বোকামিভরা মুখখানা দেখেই মনে হলো ওর সমস্ত বুদ্ধি এই মুহূর্তে ওর গল্পের নায়ককে ধার দিয়েছে।

অত্যন্ত আন্তরিকভাবে শশাঙ্ককে জড়িয়ে ধরে পরীক্ষিৎ বললো, 'তুই কেমন আছিস, শশাঙ্ক, কতদিন তোকে দেখিনি, হঠাৎ বড় দেখতে ইচ্ছে করলো তোকে। এবং এইকথা বলার পর হুড় হুড় করে বমি করে দিলো ওর গায়। পরীক্ষিৎকে শশাঙ্কর হাতে সঁপে দিয়ে আমি একা বেরিয়ে এলুম।

যতদূর সম্ভব মনে করে করে তেরোই এপ্রিল ১৯৬১র কথা লিখছি। কিন্তু কি বাদ গেল? হ্যাঁ, ন্যাশনাল লাইব্রেরী থেকে চিরঞ্জীব রায়চৌধুরীর সঙ্গে বেরিয়ে আসবার সময় আমি অশোকের দিকে দিকে বিস্মিতভাবে আরেকবার তাকিয়েছিলাম। চোখাচোখি হলো, হঠাৎ মনে হলো, অশোক কাঁদছে। হা ঈশ্বর, আজ পর্যন্ত অশোকের রহস্য জানা হলো না। তারপর থেকে অশোকের সঙ্গে আজ পর্যন্ত আর দেখা হয়নি। অশোক যে মেয়েটিকে বিয়ে করেছে তাকে আমি কস্মিনকালেও চিনতাম না। সুতরাং সেদিক থেকেও কোনো গন্ডগোলের কারণ নেই। অশোক, তোর কাছে কবে কি অপরাধ করেছি, মনে পড়ে না, তবু, কোনো একদিন আমাকে ক্ষমা করিস।

তেরোই এপ্রিলের কথাই বা কেন বেছে নিলাম জানি না। কোনো নতুনত্ব নেই, তবু সেদিন বাড়ি ফেরার পথে যে অনুভব হয়েছিল---সেই জন্যই দিনটা মনে আছে। মনে আছে মন্থর পায়ে ফিরছিলাম মেসে কেন ফিরবো--এর কোনো উত্তর জানা ছিল না। যেমন মেস থেকে বেরুবার সময় কোথায় যাচ্ছি জানতুম না। যেন পাশাপাশি দুটো ট্রেন ভয়ংকর বেগে ছুটে চলেছে, যে কোনো একটার জানালা থেকে সম্পূর্ণ গতিহীনতা। কোটি কোটি মাইল দূরে যে নক্ষত্রের আলো এখনো পৃথিবীতে পৌঁছায়নি, বা যে নক্ষত্রের মৃত্যুসংবাদ এখনো পৃথিবীতে আসেনি--এখনো পরীর চোখোর মত জ্বলছে--যেন আমিও সেইরকম। আমি যে পৃথিবীতে আছি--কেউ জানেনা। আমার মৃত্যুর পর জানা যাবে, আমি পৃথিবীতে জন্মেছিলাম, এবং বেঁচে ছিলাম। আমি একদিন অল্প বাতাসের মধ্য দিয়ে অন্ধকার ময়দানের পাশ দিয়ে একা হেঁটে গিয়েছিলাম। আমি এক গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করার সময় সেই গাছটাকে প্রণাম করেছিলাম। আমি একা অন্ধকারে, কেউ শ্রোতা নেই জেনেও আপন মনে একটা গান গেয়েছিলাম। আমার চটি ছিঁড়ে যেতে আমি চটিজোড়া কোলে নিয়ে খালিপায়ে মাটির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলেছিলাম, আমি জানি, সব দৃশ্যই অদৃশ্য জগতের উল্টোপিঠ। মনে পড়েছিল, আমি প্রত্যেক দিন মাথার বালিশ ছাড়া বিছানায় শুই।

মেসে ফেরার কথা মনে পড়লেই রামসদয়ের কথা মনে পড়ে। আমার রুমমেট রামসদয়। বড় ভালো লোকটা, কিন্তু এমন অপমান করেছিল একদিন। একদিন অনেক রাত্রে ফিরেছি, রামসদয় জেগেছিল। আমাদের ঘরের পাশেই বাথরুম। বাথরুমে মুখ ধুতে গেছি। সেদিন আমার এমন কিছু নেশা ছিল না, শরীর সুস্থ ছিল, কিন্তু বাথরুমে ঢুমে আমি চিৎকার করে ভয়ে পিছন ফিরতে গিয়ে পড়ে গেলুম। আমি দেখলুম, বাথরুমে একটা মানুষের মুণ্ডু ঝোলানো রয়েছে, শরীরহীন একটা মুণ্ডু, অভিব্যক্তিহীন, ভাবলেশহীন চোখ। মুখখানা ওরকম নিস্পৃহ বলেই বীভৎসা। রামসদয় ছুটে এসে ঢোকার আগেই আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, ভয়ে আর মুখ ফেরাইনি, জিজ্ঞেস করলাম, 'ওখানে কি, কি, কিসের মুখ ওটা?' আমি এত স্পষ্ট দেখেছিলাম যে, সন্দেহ করিনি।

রামসদয় আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলেছিলেন, 'ওঃ এই চলুন, শোবেন চলুন।'

'কার মুখ?'

'কিছু না, আমার দোষেই–'

আমি ফিরে তাকালাম, তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে এমন লজ্জা হলো। রামসদয় দাড়ি কামাবার জন্য বড় আয়নাটা এনে ঝুলিয়েছিল, বদমাস টেকোটা আর আয়নাটা ঘরে নেয়নি। মাঝরাতে মাতালকে ভয় দেখাবার জন্য বাথরুমে ফাঁদ পেতেছে। রামসদয় আমার হাত ধরে নিয়ে এলো ঘরে, বিছানার চাদরটা ঝেড়ে আমাকে শুইয়ে দিলো। আমি সাহিত্যিক বলে লোকটা একটু খাতির করে। 'আলো নিভিয়ে দিই?' রামসদয় জিজ্ঞেস করলো, তারপর অল্প একটু হেসে বললো, 'শেষকালে নিজের মুখ দেখেই ভয় পেলেন?'

শেষ কথাটাই মারাত্মক। দু'গালে পাঁচটা থাপ্পড়ের মতো। লজ্জায় কিংবা বা ভয়ে অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারিনি। নিজের মুখ দেখে ভয় পেয়েছিলাম। আমার নিজের মুখ সবচেয়ে চেনা। উনিত্রিশ বছর ধরে যে মুখ দেখছি। দাড়ি কামাবার সময় বা কতবার পানের দোকানের আয়নার বা ট্যাক্সির কাচেঃ, গ্রুপ ফটোতে, লোকে যেমন বলে মেয়েদের চোখের মণিতে আমার এ মুখচ্ছবি আমি কতবার দেখছি। তবু চিনতে পারলুম না। ভয় পেলুম, যদিও চোখে এমন কিছু রঙ ছিল না। এইরকম ছেঁদো দার্শনিক হা–হুতাশ কিছুক্ষণ করে আমার ভয়–দেখানো মুখখানা বালিশে চেপে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর মাস দুয়েক কোনো স্বপ্ন দেখিনি পর্যন্ত।

নাঃ, এবার শেষ করা যাক। আর ভালো লাগছে না। তারপর কি হলো সেই রাতে, পরীক্ষিৎকে ছেড়ে আসার পর? ওঃ সেইরাত, সেই–। একা একা অনেকখানি হেঁটে এসেছিলাম–চৌরঙ্গিতে বড় রাস্তা ছেড়ে হেঁটে এলাম মাঠ দিয়ে। একবার পকেটে হাত দিলাম, সিগারেট নেই, কিছুই নেই–শুধু মাত্র একটি পাঁচ পয়সার ঢেলা পড়ে আছে। আবার সেই জঞ্জাল, কাল সকালে আবার ঐ নিয়ে দুশ্চিন্তা! হাসি পেল, বুড়ো আঙুল ও মধ্যমার ওপর পয়সাটা বসিয়ে জোরে একটা টুসকি মেরে বললুম, 'যাও সখা, বলো তারে, সে যেন ভোলে না মোরে।' পয়সাটা ডানা মেলে অন্ধকারে উড়ে গেল। পরক্ষণে নিজের বোকামিতে নিজের আঙুল কামড়ালুম পাঁচটা নয়া পয়সা ওড়াবো এমন অবস্থা আছে নাকি আমার? সেটাকে খুঁজতে লাগলুম। জ্বলাতে জ্বালতে এগোচ্ছি, খালি পা কাদায় বসে যাচ্ছে, কবে বৃষ্টি হলো কি জানি।

পয়সা খুঁজতে খুঁজতে অনেকদূর চলে এসেছিলাম। হঠাৎ একটা পুকুর। বেশ বড় জলাশয়, চারদিকে মেহেদি গাছের বেড়া দেওয়া। পরিষ্কার জায়গাটা, অল্প জোৎস্নায় ঝকঝক করছে পরিষ্কার জল। এখানে এরকম পুকুর ছিল, কোনদিন তা জানতুম না। চারদিক বাঁধানো, কোথাও একছিটে কাদা নেই, পুকুরের চার কোণে পাঁচটা গাছ, কোথা থেকে হাওয়া এসে ওদের পাতা দোলাচ্ছে। আহা, এমন সুন্দর জায়গা কলকাতায় আছে! কোনদিন জানতে পারিনি। এমন পরিচ্ছন্ন পুষ্করিণী যেন বহুবার স্বপ্নে দেখেছি। হাত পা এবং জামা–প্যান্ট, পয়সা খুঁজতে জলকাদায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল, ইচ্ছে হলো, এই পুকুরে ভালো করে ধুয়ে নেই। এমনকি, এই পুকুরে স্নানও করা যেতে পারে, একা একা অন্ধকারে সাঁতার কাটতে খুব ভালো লাগবে। এগুতে গিয়ে অদৃশ্য কোনো কিছুতে জোর ধাক্কা খেলাম। বেশ শক্ত কোনো কিছুতে মাথা ঠুকে গেল। কি? তাকিয়ে দেখলাম কিছু নেই। আশ্চর্য, তবে কি হাওয়ায় ধাক্কা লাগলো। ভয় হলো, মানুষের মৃত্যুকালে হাওয়া পর্যন্ত কঠিন হয়ে যায় শুনেছি। আবার সামনে হাত বাড়ালাম। দুই হাত কোনো কঠিন অদৃশ্য দেওয়ালে ধাক্কা লাগলো। সেরেছে কি চুর হয়ে আছি নাকি? মাথা ঠাণ্ডা করে দাঁড়ালুম। আবার হাত বাড়ালুম। সেই অদৃশ্য কঠিন বাধা। এবার বুঝতে পারলুম, কাচ বা মাইকা বা শক্ত প্লাস্টিক বা ট্রান্সপারেন্ট কঠিন কিছু দিয়ে জায়গাটা ঘেরা। কি অসম্ভব কাণ্ড। একটু পাশে সরে যেতেই একটা নোটিশ চোখে পড়লো।

রিজার্ভড পণ্ড

প্রোহফকিল্স ইনস্টিটিউট কর্তৃক সংরক্ষিত পুষ্করিণী

এই পুষ্করিণীর পাড়ে বা একশো গজের মধ্যে কাহারো বসা বা বিশ্রাম করা নিষেধ। বিষ প্রতিষেধক গবেষণার্থে এখানে জলজ সর্পের চাষ করা হয়। সাবধান! যদিচ এই সর্পগুলি বিষহীন, কিন্তু ইহাদের সন্ধানে দূর–দূরান্ত হইতে বিষধর সর্প আসিতে পারে। সম্ভব হইলে এই পথ পার হইবার সময় নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া যাইবেন। জনসাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। কোনো মাতাল বা গেঁজেলের দলবলের কাণ্ড এসব। বাঙলা দেশে কি সাপের অভাব, যে চাষ করতে হবে? এইরকম এতো বড়ো একটা পুকুর–সাইজের কাঁচের জার বসিয়ে রেখেছে এখানে। কলকাতা শহরে প্রত্যেকদিন কেন অসংখ্য লোক সাপের কামড়ে মরে যাচ্ছে এবার বুঝলাম। খবরের কাগজে প্রত্যেকদিনই কলকাতায় সর্পাঘাতে মৃতের খবর থাকে। তার মানে দূর দুরান্ত থেকে এখানে সাপ আসে।– কিংবা এমনও হতে পারে, পুরোটাই ধাপ্পা। পুকুরটাকে সুন্দর রাখবার জন্য এরকম একটা বাজে নোটিশ লটকেছে। আমি কাচের দেয়ালে দেয়ালে হাত দিয়ে পুকুরটার চারপাশে ঘুরে এলাম কোথা দিয়েও ভেতরে যাওয়া যায় না, বেহুলার বাসরঘরের চেয়েও শক্ত। চার কোণে পাঁচটা গাছ হাওয়ায় দুলছে। সমান করে ছাটা বুক–সমান মেগেদির বেড়া। মার্বেল পাথরে বাঁধানো পাড়। পরিষ্কার জল। ঢেউহীন। মেঘ ভেঙ্গে মাঝে মাঝে চাঁদের আলো। ওখানে সাপ ও সাপিনী খেলা করছে। ভেতরে ঠোকার অসম্ভব ইচ্ছে হতে লাগলো আমার। কাচের দেয়ালে গালটা ছোঁয়ালুম। সাপের গায়ের মতো ঠাণ্ডা। চুপ করে দাঁড়িয়ে আমি জ্যোৎস্না ও সাপের খেলা দেখতে লাগলুম। অজান্তেই একবার যেন বিড়বিড় করে বললুম, দূর দূরান্ত থকে আর তো কেউ আসে নি। শুধু আমি একাই এসেছি। কাল অন্য সবাইকে ডেকে এনে দেখাতে হবে, একথাও মনে পড়লো।

হেমকান্তি

প্রিয় বিমলেন্দুবাবু,

আপনাকে এই লিখছি অনেক ভেবে, ভাবনার পর ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত, কারণ, আর হয়তো আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে না। আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। দেরাদুনে আমার এক আত্মীয় আছেন প্রথম কিছুদিন তাঁর ওখানে থাকবো, তারপর আরও দূরে সরে গিয়ে, ইচ্ছে আছে পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে কোথাও বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবো। কাটিয়ে দেবো। না, আমার ঈশ্বর–দর্শন হয়নি, ঈশ্বরকে জানার তৃষ্ণা জাগেনি, সাধু–সন্ন্যাসী হতে চাইনা, তবু কোথাও আত্মপরিচয়হীন হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে হলো। এ ছাড়া আমার অন্য কোনো উপায় নেই। চেনা লোকদের থেকে দূরে, একটা অন্যরকমের, সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে থাকা যায় কিনা দেখি। আমার যদি বেশি অর্থ বা কিছু উদ্দীপনা থাকতো তাহলে আমি হয়তো ইতালি কিংবা কোনো স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিতে চলে যেতুম, সেখানেও হয়তো অন্য মানুষ হওয়া যেতো, কিন্তু তার চেয়ে হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চল সহজ মনে হলো। এখানে আমার বেঁচে থাকায় কোনো স্বাদ পাচ্ছি না, আমার মৃত্যুও খুব মূল্যবান নয়।

জানিনা, আপনি আমার এ চিঠি পড়ে বিরক্ত হবেন কিনা, কিন্তু এ চিঠি আমাকে লিখতে হবে, কারণ, আপনাদের বিরুদ্ধে আমার কতগুলি অভিযোগ এই প্রথম আমি জানাতে চাই। আমি আপনাদের মধ্যে গিয়েছিলাম বেঁচে ওঠার জন্য, আপনারা লেখক, আপনারা জীবন সৃষ্টি করছেন, আমি ভেবেছিলুম আপনারা আমার মধ্যেও জীবন এনে দিতে পারবেন–বেঁচে থাকার জন্য আমার খুব বেশি দাবী ছিল না, আমার দরকার ছিল, শুধু খানিকটা বিদ্যুতের মতো ঝলক, ঘুমন্ত মানুষের কানের কাছে 'ডাকাত ডাকাত' বলে চেঁচিয়ে উঠলে সে যেমন আচমকা ছিটকে ওঠে, আমিও সেরকম চেয়েছিলুম, আমি আপনাদের মুখের কাছে কান পেতে রাখথাম, কিন্তু আমি জেগে উঠতে পারলুম না তবুও। আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারবো কিনা জানিনা, কিন্তু আমার একটা নতুন মানুষ হওয়া বিষম দরকার, খুবই দরকার ছিল, নইলে সাধারণ সুস্থ মানুষের মধ্যে আমার আর থাকা চলেনা।

আমি একবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম, তখন আমার বয়েস উনিশ, আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ের আগে, তখন যদি মৃত্যু হতো, তাহলেই বোধহয় ছিল ভালো, আমার মনে হয় তা হলে দ্বিতীয়বার বেঁচে থাকা আমার পক্ষে এতটা সমস্যা হতো না। আত্মহত্যার কথা শুনলেই তার

কারণটা শুনতে ইচ্ছে হয়, জানিনা আপনারও হয় কিনা, অবশ্য সে কারণ শুনলে আপনারা এখন হাসবেন, আপনারা আধুনিক লেখক। আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসতুম, মনে হতো তাকে না পেলে আমি বাঁচবো না, আমি রাত্রে জ্যোৎস্নায় বসে তাকে চিঠি লিখতুম। অনেকদিন, মনে আছে, মেয়েটি পাশে বসে আছে–আর আমি তাকে চিঠি লিখছি। তার জন্মদিনে, এক শিশি আতর কিনে দিয়েছিলাম। মেয়েটির সঙ্গে দেখা হতো প্রত্যেক দু'বেলা, যাত না কথা বলতুম, তার চেয়ে চিঠি লিখতুম বেশি, চিঠি লিখে ওর ব্লাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতুম, বলতুম তোমাকে ও চিঠি পড়তে হবে না, বুকের সঙ্গে লেখা থাক, আমার চিঠির ভাষা তাহলেই তোমার হৃদয়ে পৌঁছে যাবে। আঠেরো উনিশ বছরের কোন ছেলে না বিশ্বাস করে যে বুক মানেই হৃদয়। আর হৃদয়ে পৌঁছে যাওয়া মানেই হৃদয়ে গেঁথে যাওয়া! আমি কখনও মেয়েটিকে শরীর দিয়ে ছুঁতে চাইনি, আমি ভাবতুম, আঙুল ছোঁয়ালেই বুঝি ফুলের পরাগের মতো ও গা থেকে রঙ উঠে আসবে। শুধু, কদিন ওর দু'পা জড়িয়ে ধরেছিলাম, ওকি, ওকি, ওকি, বলে বালিকাটি চেঁচিয়ে উঠলেও ছাড়িনি, ওর পায়ে আমার মুখ ঘষেছি, বারবার ইচ্ছে হয়েছে—আমার চোখে যদি অনেক জল থাকতো আমি চোখের জল দিয়ে ওর পা ধুয়ে দিতাম। আপনি ভয় পাবেন না, বিমলেন্দুবাবু, আপনাকে মারি করেলির লেখার মতন কোনো প্রেমের কাহিনী শোনাতে বসিনি। কারণ আজ আমি মেয়েটির নামই ভুলে গেছি, রেণু, রীণা বা রাণী যে কোনো একটা হতে পারে। চোখ বুজলে মেয়েটির মুখও মনে পড়ে না। সে ছিল আমার সমবয়সী, হঠাৎ ওর বিয়ে ঠিক হলো, মেয়েটি আপত্তি করলো না।—। ছেলেটি ওদের বাড়ি আসতো, বেশ ভালো ছেলেটি, আমারও ওকে খুব ভালো লাগতো, – মেয়েটিকে খুব খুশি মনে হলো। আমাকে শেষ চিঠিতে লিখেছিল, 'তুমি মন খারাপ করো না ভালো করে পড়াশুনো করো—তুমি এখনও কত ছেলেমানুষ, আমাকে মনে রাখবে তো?'

এইসব—ভেবে দেখুন, এরই জন্য আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম। এ তো প্রতিদিন পৃথিবীতে দু'বেলা ঘটছে। আসলে সাঁতার না জেনেও আমি বন্ধুদের সঙ্গে একবার পুরীর সমুদ্রে নেমে অনেকদূর গিয়েছিলাম। আমার আত্মহত্যার চেষ্টাও অনেকটা সেইরকম। জানিনা আপনারও ছেলেবেলায় এরকম কোনো অভিজ্ঞতা আছে কিনা?। মেয়েটার বিয়ে হবার পর কিছুদিন আমার কিছু মানে হয়নি, একটু ছোট দুঃখ ছাড়া। তারপর একটা পূর্ণিমা কেটে গেল, একটা অমাবস্যা, আবার পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় চিঠি লেখার কথাও মনে পড়েনি। হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা আমার সারা শরীরে যেন আগুন জ্বলে উঠলো, যেন প্রত্যেকটি লোমকূপ দিয়ে তাপ বেরুতে লাগলো, আমার স্নায়ুমণ্ডলী ও শিরাগুলি দপ্‌দপ্‌ করতে লাগলো অসম্ভব অভিমানে। জীবনে সেই প্রথম ও মাত্র একবার বুঝতে পারলুম কাকে বলে প্যাশান। ইচ্ছে হলো একটা ছুরি হাতে নিয়ে খোলা রাস্তা দিয়ে তখুনি ছুটে যাই। প্রেমের ব্যর্থতা মানুষকে বড় অহংকারী করে, তখন কেউ কেউ বিরাট শিল্প সৃষ্টি করতে পারে–বা শিল্পকে ভাঙতে, অর্থাৎ মানুষ খুন, বা নিজেকে ভাঙে। আমি শেষেরটা বেছে নিলাম। দুপুরবেলা বাড়িতে শুধু মা আর আমি, আমার দিদি তখন হাসপাতালে। ছাদের ঘরে আমি পা–জামাটার নিচের দিকটা কেরোসিনে ভিজিয়ে আগুন জ্বেলে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, একটা শুকনো গাছের মতো আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ে যাবো। কিন্তু সত্যিকারের অবস্থা তেমন সহজ নয়। সেই থেকেই আমি রিয়েলিটি অত্যন্ত ঘৃণা করি।

প্রথম আগুনের আঁচ গায়ে লাগতেই আমার মনে হলো, না, না, না, অসম্ভব অসম্ভব। কিন্তু আগুন নেভানো সহজ নয়। দশলাই এর কাঠির খোঁচায় আগুন যে কেউ জ্বালতে পারে আজ, প্রমিথিয়ুশের আত্মদানে, কিন্তু নেভানো শিখতে হয়। আমি হাতচাপা দিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করলুম, হাত ঝলসে গেল, আমি ছুটতে লাগলুম, উদ্‌ভ্রান্ত, মনে হলো দু এক মিনিটের মধ্যেই আমার জীবন মৃত্যু নির্ভর করছে—কিন্তু আমার বেছে নেবার সময় নেই, —আমি ছুটে নিচে নেমে এলুম। আগুন আমাকে তাড়া করে এলো, বস্তুতঃ আগুন আমার সঙ্গেই ছিল। দোতালার বারান্দায়—

থাক্‌, ওসব আর লিখতে বা মনে করতে আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া আমি লেখকও নই। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমি বেঁচে গেলুম খুবই আশ্চর্য ভাবে, —সেই বেঁচে ওঠার মতো

বিস্ময় আর কিছু নেই আমার কাছে। সেই বেঁচে ওঠা আমাকে চিরকালের মতো হতভম্ব করে দিলো।

আকস্মিকভাবে বেঁচে ওঠার প্রচণ্ড ধাক্কা আমাকে কিছুদিন ভালো রেখেছিল। মন দিয়েছিলাম পড়াশুনোয়। বেশ ছিলাম সাধারণত মানুষ। হাসির কথায় হাসতুম, কখনো ক্রুদ্ধ হয়েছি, কত সময় সাধারণ দুঃখ পেয়েছি। তারপর চার পাঁচ বছর বাদে আমার প্রেত আমার কাছে ফিরে এলো। এসে কৈফিয়ৎ দাবী করলো। আমি বুঝতে পারলুম, এ জীবনটা আমার অতিরিক্ত, এটা ঠিক আমার নয়। মানুষ একটাই জীবন পায়, যেমন ইচ্ছে সেটাকে খরচ করে, কিন্তু আমি পেয়েছি দু'টো একটা আমি নিজের হাতে নষ্ট করতে গিয়েছিলাম। নিশ্চিত নষ্ট হয়েছিল, ও দোতলার বারান্দা থেকে যখন আমি লাফ দিয়েছিলাম—তখন তো নিশ্চিত মৃত্যুর দিকেই গিয়েছিলাম। আমাকে কখনো খালি গায়ে দেখেন নি। দেখলে শিউরে উঠতেন। আমার দু'পা, বুক-পিঠ জুড়ে কালো কালো দাগ। ওরকম ভাবে পুড়লে বাঁচে না। আমি কি করে বেঁচে উঠলুম কে জানে। তা ছাড়া আমার মুখে আঁচ লাগেনি বলে আমাকে দেখেও কিছু বোঝা যায় না। অর্থাৎ আমি একবার মরে গেছি। পরে যেটা পেলাম, আমার বাকি জীবন, এটার ওপর আমার আর কোনো অধিকার নেই, এমনকি আমি একে নষ্টও করতেও পারি না। যেন আমাকে অন্য লোকের জীবন ধার দেওয়া হয়েছে। এই জীবন নিয়ে আমি কি করে বাঁচবো যদি এর ওপর নিজের মতো করে মায়া না পড়ে যদি পরের জামা পরার পরের জামা পরার মতো সর্ব সময় সাবধানে থাকতে হয়। বেঁচে থাকার মায়া পাবার জন্য আমি চারদিকে ছুটে গিয়েছিলাম। আমি রাজনীতিতে গিয়েছিলাম-ফিরে আসতে হলো। রাজনৈতিক নেতাদের হওয়া উচিত কবিদের মতো-তার বদলে কবিরাই আমাদের দেশে পলিটিক্স শিখছে! আমি খেলাধুলায় গিয়েছিলাম-ভেবেছিলাম, খেলাধুলার মধ্যে তো শরীর ছাড়া কোনো কথা নেই, ওরা অমরত্ব জানে না, ওরা জানে শুধু শারীরিক বেঁচে থাকা। আমি সাঁতার, এমনকি ঘুঁষোঘুষি শিখতেও গিয়েছিলাম-আমার হলো না, কেননা, আমার শরীর কেটে রক্তপাত হলেও আমার ব্যথা লাগতো না, মনে পড়ে যেতো, এ শরীর আমার নয়, আমার শরীরের সমস্ত ব্যথা আমি আগুন লাগিয়ে একদিন ভোগ করেছি। গান-বাজনা করতে গিয়েও মন বসাতে পারিনি। শেস পর্যন্ত এলাম সাহিত্যে। নিজে কিছু লিখতে শুরু করার আগেই আপনাদের মতো লেখকদের মধ্যে এসে পড়লুম। ভেবেছিলাম, শেষ পর্যন্ত বোধ হয় আপনাদের মধ্যে এসে আমি বেঁচে যাবো, আমার নতুন জীবনের প্রতি মমতা আসবে।

কিন্তু আপনারাও আমাকে নিরাশ করলেন বিমলেন্দুবাবু, আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। আপনাদের প্রত্যেকের জীবন বিষম স্বার্থপর, জীবনের যে কোনো সুযোগ-সুবিধে সম্পর্কেই আপনারা অত্যন্ত সজাগ, কিন্তু আপনাদের রচনা মিথ্যাভাষী। আপনাদের লেখার মধে ঔদাসীন্য, নির্জনতা এসব ছাড়া আর কিছু নেই—কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে আপনারা কেউ সেরকম নন। আপনারা কে কতক্ষণ একা থাকেন, জানিনা, সব সময় দেখি হৈ হল্লোড়, বান্ধবসভা, আপনারা প্রত্যেকে নিজের নিজের ব্যক্তিগত উপলব্ধির কখন সময় পান? নাকি সেইজন্যই সব অনুভবের কথা বানানো?

মৃত্যু, ধ্বংস নীতিহীনতা-এই হয়ে উঠেছে আপনাদের বিষয়। তাপসাবুকে দেখেছি, কপালে একটা ব্রনো উঠলে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে সাতবার ডাক্তারের কাছে ছুটে যান-অথচ উপন্যাসের নায়করা উদাসীন, ক্যান্সার বা সিফিলিসের রোগী। আপনিও বিমলবাবু, আপনার কবিতায় মেয়ে-পুরুষরা অত আত্মহত্যা করে কেন? অথচ, আপনি জীবনে হয়তো সামান্য আত্মত্যাগও করেননি কখনো। আমি মৃত্যুর শেষ পর্যন্ত ঘুরে এসেছি, আমি জানি মৃত্যু কিরকম, তাই আমি জীবন্ত মানুষ দেখতে চাই-আপনি মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুই না জেনে মানুষকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছেন। কবিতা হলো একধরনের প্রার্থনা, আপনার কবিতায় কিসের প্রার্থনা? মৃত্যুর মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য নেই, অনেকটা একঘেয়ে।

মৃত্যু—তিন রকম, ভেবে দেখতে গেলে। আত্মহত্যা; দুর্ঘটনা বা আততায়ী; অথবা বিছানায় শওয়ে নানা জনের চোখের জল, দীর্ঘশ্বাসের নীচে। যাবার সময় কেউ কেউ বলে, 'মা, চললুম।' এমন নিশ্চিত সেই বলা যে শেষতম যাত্রার আগে যেন সে কিছুই নিতে ভুলে যায়নি, চন্দনের টিপ পর্যন্ত না। আবার কেউ কেউ বাক্‌রুদ্ধ চোখে প্রবলভাবে চেয়ে থাকে, চোখ দিয়ে দু'হাত

বাড়াতো চায়, যেন তার শেষ অস্তিত্ব চিৎকার করে, –"যেতে দিওনা, আমাকে বাঁচাও–আমি এই মাটির ঘরে বা রাজপ্রাসাদে, করমচার ঝোপের পাশে, জ্যোৎস্নায় আরও কিছুদিন থেকে যেতে চাই, যেতে দিওনা, কোথায় যাবো জানিনা, এখানে চেনা জিনিসগুলো কিছুই চেনা হয়নি, যেতে দিওনা। এই। কিন্তু জীবন বহুরকম, অসংখ্য, আপনি কখনো বলতে পারবেন না, মানুষ এইভাবে বাঁচে। কেননা, প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত বেঁচে থাকা সম্পূর্ণরকম তার নিজের। মাস্তুলের মাথায় বালক ঘুমোয়, সম্রাট অনিদ্ররোগী, খনির নিচে মাটি চাপা পড়ার তেরদিন পর বেঁচে ফিরে এলো মানুষ, প্রবল পিতৃশোকের মধ্যেও সিগারেট না পেলে মন চঞ্চল হয় কারুর, জানিনা মহাশূন্যের রকেটে মানুষগুলো সত্যিই কিভাবে। আমি এসেছিলাম বাঁচতে বিমলেন্দুবাবু, আপনাদের কাছে জীবনের একটা নতুন মুখচ্ছবি পেতে, দেখলুম, আপনারাও ভ্রষ্ট এবং জীর্ণ, পোকায় ধরা মৃত্যুবিলাসী। পরীক্ষিৎ লোভী, তাপস নিজেকে ঠকায়, অবিনাশ নিজেকে চেনে না, আপনিও মিথ্যে আত্মবিশ্বাসী।

ক্রমে আমার বুকের ভিতরের মৃত্যু আবার জেগে উঠলো। এইভাবে মায়া–মমতাহীন ভাবে, পরের জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার মতন কেউ বাঁচতে পারে? আমি আমার শরীরে মড়ার গন্ধ পেতে লাগলুম। লোকজনের মধ্যে বসতে আমার ভয়, আমি সবার আড়ালে নিজের হাতটা তুলে নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকি। কেউ টের পায় না, কিন্তু আমি গন্ধ পাই, পচা গন্ধ, বুঝতে পারি আমার শরীর পচে যাচ্ছে। একটা আত্মহীন, মায়াহীন, ভালোবাসাহীন শরীর কখনো বেঁচে থাকতে পারেনা।

কয়েকদিন আগে একটা জিনিস লক্ষ্য করে আমি শিউরে উঠলুম,–সম্প্রতি আমার শরীরে কয়েকটা নতুন তিল উঠেছিল, ঠিক কালো নয়, লালচে বাদামী রঙের। জায়গাগুলো একটু একটু উসখুস করতো–একটা তিল একদিন খুঁটতে একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করলাম। তিলটা জীবন্ত। বুঝতে পারলেন, তিলটা জীবন্ত? একটু খুঁটতেই সরে গেল। অবাক হয়ে আর একবার আঙুল ছোঁয়াতে সেটা আর একটু সরে গেল। লক্ষ্য করলাম, ওটা তিল নয়, একটা পোকা, আমার শরীর থেকে জন্মেছে, ক্ষুদে অক্টোপাসের মতো, প্রবলভাবে চামড়া আঁকড়ে আছে—সবগুলো তিলই এই। আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম। বুঝতে পারলুম, আর নয়। আমার শাস্তি শেষ হয়েছে। জানি, আপনি কি বলবেন বা ডাক্তার কি বলতে পারে এ ব্যাপারটা শুনে, ও কিছু নয়, এক ধরনের চর্মরোগ, কোনো একটা পাউডার লাগালেই সেরে যাবে। জানি সেরে যায়, অন্য লোকের সারে, কিন্তু আমার নয়। আমার এগুলো, পচা মাংসে যে পোকা পড়ে—তাই। আর এখানে নয়, আমি বুঝতে পারলুম। আমি বাঁচতে এসেছিলাম, আপনারা আমাকে দূরে ঠেলে দিলেন। জানিনা আমার কোথায় স্থান হবে।

আপনাদের
হেমকান্তি

মায়া,

তোমাকে চিঠি লিখতে আমার হাত কাঁপছে, জানিনা, এ চিঠি তোমাকে কোনোরকম আঘাত দেবে কিনা–কারণ, আমি এটুকু অন্ততঃ জানি নিশ্চিত যে আমি নিজেকে কিছুতেই সম্পূর্ণ বোঝাতে পারবো না। তোমাকে কোনো আঘাত দিতে চাই না, মায়া, আমি তোমাকে ভালোবাসতে চাই–অন্য কোন কথা মাথায় এসে জটিল হবার আগেই তোমাকে একথা জানালুম।

তোমাকে বাড়িতে যাবার তৃতীয় দিনে তুমি আমার সামনে এসে বলেছিলে, 'আপনার ওটা কিসের বোতাম, চন্দনের?'–বলে তুমি আমার বুকে হাত দিয়ে বোতাম দেখছিলে। সে প্রায় এক বছর আগে, তখনও তুমি অনেকটা শিশু ছিলে, এমন পূর্ণ যুবতী হওনি, তাই ঐ অকপট হাত রেখেছিলে আমার বুকে, আমার বুকের মধ্যে যে হৃৎস্পন্দনের কোনে শব্দ নেই, তাও তুমি টের পাওনি। আমি মাথা নিচু করে নিঃশব্দ ছিলুম। তুমি বললে, 'আপনি বাইরে কার ওপর রাগ করে এসে এখানে গম্ভীর?' একটু পরে তুমি দিদিকে বলেছিলে, 'ঐ ফর্সা লোকটা খুব অহংকারী।' আসলে আমি মাথা নিচু করে তোমার পায়ের দিকে দেখছিলুম, কি সুন্দর ঝকঝকে দুটি পা, যেন

তুমি আমার স্মৃতির ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলে, রঙ লাগাওনি অথচ প্রত্যেকটি নখে রাল আভা, গোড়ালি একটুও ফাটা নয়, একছিটে ময়লা নেই কোথায়।—কতদিন পর আমার বুকে একটি মেয়ের হাত, একথাও মনে পড়েনি। তখন কোনো কথার উত্তর দেবার আমার সময় ছিল না। সেই পায়ের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল, এই মেয়েটিকে যদি আমি ভালোবাসতে পারি, তবে হয়তো আমি বেঁচে উঠতে পারি আর একবার। কিন্তু তবু যে কেন আমি শেষ পর্যন্ত মাথা নিচু করেই রইলুম জানিনা। ভালোবাসার অনিচ্ছা না বেঁচে থাকার অনিচ্ছা, কী জানি।

একদিন হঠাৎ তোমাদের ঘরে ঢুকে দেখেছিলুম, অবিনাশ তোমার হাত ধরে টানছেন, আর তুমি বলছো, 'ছাড়ুন, ছাড়ুন!' আমাকে দেখেই অবিনাশবাবুর হাত ছেড়ে দিয়ে যেন কি একটা হাসির কথা বললেন। তোমরা দু'জনে হো হো করে হেসে উঠলে। এমন হতে পারে তোমার হাতের মুঠোয় কোনো জিনিস লুকোনো ছিল, অবিনাশবাবু কেড়ে নেবার চেষ্টা করছিলেন, বা হাত ধরে তোমাকে টেনে নিতে চাইছিলেন ওর বুকে আমাকে দেখে থেমে গেলেন এবং একটু বিব্রত বা দুঃখিত না হয়ে পরবর্তী হাসির কথাগুলি বলেছিলেন। আসলে দুঃখিত হয়েছিলাম আমি, মৃত্যুর চেয়ে বড় দুঃখ। আমার খুব ভাল লেগেছিল, ঐরকম প্রবলভাবে টানাটানি ও হাস্য। আমাকে দেখে থেমে যেতেই আমি বিমূঢ় ও লজ্জিত হয়েছিলাম, ফিরে যাবার জন্য এক পা তুলেও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, আবার শুরু হোক, না হয় আমিই তোমার হাত ধরে টানি, প্রবলভাবে বুকের ওপর নিয়ে আমি, তোমার হালকা শরীরটা শূন্যে তুলে লুফে নিই, তোমার ঠোঁট থেকে হাসি চলে আসুক আমার ঠোঁটে, কিংবা অবিনাশের, হাওয়ার হুড়োহুড়ির মধ্যে আমরা তিনজন—অনেকক্ষণ বাদে লক্ষ্য করলুম, আমি আমার হাত দুটো পকেট থেকেই বার করিনি, ঘরের মাঝখানে বিকট ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছি চুপ করে। ইচ্ছে হলো, তখুনি ছুটে পালিয়ে যাই, তার বদলে তোমার দিদির হাত ধরে সরবতের গ্লাস নিলুম।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে, দোলের দিন। দল বেঁধে সবাই তোমাদের বাড়ি গিয়েছিল, গগনবাবু আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিনও অবিনাশবাবুকে দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম। সবাই ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি করছে, রঙের স্রোত আর আবীরের ধুলো চারদিকে, কিন্তু আমি যোগ দিতে পারিনি, এক কোণে দাঁড়িয়েছিলাম অস্পৃশ্যের মতো, সবাই সেদিন আমাকে গঞ্জনা দিয়েছিল, আমাকে জোর করে ফেলে দিয়েছিল মাটিতে। তবু পারিনি, তবু পারিনি ওদের মতো খোলা হতে, লাল রঙকে ব্যবহার করতে। আমি এক ফোঁটা আবীর বুঝি দিয়েছিলাম সকলকে, সেই প্রথম আমি তোমার কপাল ছুঁয়েছিলাম। কত ব্যর্থ সেই ছোঁয়া। অবিনাশবাবু তোমার সারা মুখ ভরিয়ে অবলীলায় তোমার ব্লাউজের মধ্যে দিয়ে পিঠে হাত ঢুকিয়ে দিলেন, সকলের সামনে তোমার জামার মধ্যে পিঠে অবিনাশের হাত ঘুরতে লাগল, কোনো দ্বিধা নেই। আড়ষ্টতা নেই। আ, আমার এত আনন্দ হয়েছিলো। মানুষকে বেপরোয়া, স্বাধীন গ্লানিমুক্ত দেখলে আমি তার আত্মা থেকে ফুলের মতন গোপন সৌরভ পাই। আমারও ওরকম হতে ইচ্ছে হয়, মনে মনে বলি, 'ঈশ্বর , আমাকে আর একবার বাঁচার সুযোগ দাও, আমাকে ওরকম স্বাভাবিক, জীবন্ত করো।' হয় না, আমি পরিনা। কেন পারিনা। কেন পারিনা, মায়া, তা তোমাকে আর এখন বলা যাবে না।

কিছুদিন আগে তোমাদের বাড়িতে সিনেমার টিকিট নিয়ে একটা লটারি হয়েছিল—তোমাদের সঙ্গে কে যাবে তাই নিয়ে। আমার সেদিন খুব মাথা ধরেছিল, খুব মন খারাপও লাগছিল, হঠাৎ আমার ইচ্ছে হলো আমি যাই তোমার সঙ্গে। তাহলে আমার সব রোগ সেরে যাবে, আমি অন্ধকারে তোমার পাশে বসে তোমার যোগ্য হয়ে উঠবো। কে যেন একবার আমার নামও বললো, আমি ব্যগ্রভাবে মুখ তুলে তাকালুম, নিঃশব্দে 'যেতে চাই, যেতে চাই' যেতে চাই' বললুম।—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সবাই চলে গেল অন্য নামে, আমার প্রার্থীপদ বাতিল হলে গেল। যেন আমি উপস্থিত নেই, শুধু একটা নাম মাত্র, একজন উত্থাপন করলো, অপরে বাতিল করে দিল। মায়া, সেদিন রাত্রেই আমার মা মারা গিয়েছিলেন। আজও আমি জানিনা, তোমার সঙ্গে সিনেমা দেখে, তোমাকে আমার সব কথা বলার পর বাড়ি ফিরে যদি দেখতুম মা মারা গেছেন, তাহলে সেইটাই ভালো হতো কিনা। তোমার সঙ্গে যেতে না পারার দুঃখ, মায়ের মৃত্যুর আঘাতও অনেকটা ম্লান করে দিয়েছিল সেদিন রাত্রের জন্য। আমার মধ্যে শোক বা অনুতাপও জেগে উঠতে পারলো না।

তোমাকে আজ এ চিঠি লিখছি, কারণ আজ আমি এ শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আর কোনোদিন ফিরবো না, এই জেনে। আমার পক্ষে আর স্বাভাবিক মানুষ হওয়া সম্ভব নয়, যেন বুঝতে পারছি। এতদিনেও যখন পারলুম না। কোথাও দাঁড়াতে পারলুম না, কোথাও দাগ রইলো না, ভালোবাসার কথা জানাতে পারিনি, এক লাইন কবিতা লেখা হলো না, কিছুই হলো না, একটি ব্যর্থতা তোমার ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তোমাকে ভালোবাসতে চেয়েছিলাম একথা তোমাকে আজ জানাবার মধ্যে আমার কোনো আকাঙ্খা লুকিয়ে নেই। আমার জানাবার উদ্দেশ্য, তোমাকে আমি ভালোবাসতে পারিনি। বড় লুকিয়ে নেই। আমার জানাবার উদ্দেশ্য, তোমাকে আমি ভালোবাসতে পারিনি। বড় অদ্ভুত এই ব্যর্থতা। আমাকে কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি ভালোবাসতে। আমারই নিজের প্রবল ইচ্ছে হয়েছিল, তোমাকে ভালোবাসার –ভালোবাসার ইচ্ছে জেগেছিল শুধু, ভালোবাসা জাগেনি। মনে মনে হাজার কথা বলেছি তোমাকে লক্ষ্য করে, এমনকি ভেবেছি, তোমাকে মুখে বলার সুযোগ না পেলেও একটা চিঠি লেখা অনায়াসেই চলতো, আজ যেমন লিখছি, তুমি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে, সেই হতো আমার পরম প্রাপ্তি– সেই আঘাত যদি আমাকে কোনো উত্তেজনা দিতো! কিন্তু আমি মিথ্যে কথা লিখতে পরিনা, 'তোমাকে আমি ভালোবাসি' একথা লেখা অসম্ভব আমার পক্ষে, আসলে, তোমাকে আমি ভালোবাসতে চেয়েছি–এইটাই সত্যি এবং তার চেয়েও মর্মান্তিক সত্যি, তোমাকে আমি ভালোবাসতে পারিনি। একথা কি কাউকে জানানো যায়? কিন্তু আজ লিখতে হলো, কারণ আজ চলে যাচ্ছি আমি, জীবনে আর হয়তো দেখা হবে না, কারুকে কারুকে কোনে কোনো কথা জানাবার ইচ্ছে আজ সত্যিই হলো। যদি এ চিঠি তোমাকে কোনো আঘাত দেয় বা অপমান করে, তবে আমার ওপর ক্রুদ্ধ হওয়াই উচিত তোমার। তুমি আমাকে মনে রেখো বা সামান্য ভালোবেসো–এ দাবি আমার নেই। তবু তোমার কাছ থেকে কিছু একটা সামান্য পেতে যেন ইচ্ছে করছে। অন্ততঃ রাগ বা ঘৃণা।

দিদিকে আমার নমস্কার জানিও।

হেমকান্তি রায়চৌধুরী

পরীক্ষিৎ

সাতমাইল রাস্তা হেঁটে এলাম এই রাত্রে। লাস্ট বাস চলে গিয়েছিল, পকেটে পয়সা ছিল না। ফিরে এসেই লিখতে ইচ্ছে হলো। একটা কথাও হারাতে ইচ্ছে করে না। এতক্ষণ যা–যা মনে পড়লো, সবই টুকে রাখতে চাই। নইলে হারিয়ে যাবে। অতিকষ্টে শেখরকে কাটানো গেছে। গড়িয়াহাটার মোড়ের আগে আর কিছুতে যেতে চায়না–সাহিত্য আন্দোলন, কবিতার ফর্ম এইসব নিয়ে বক্‌বক্ শুরু করেছে– রাতদুপুর—অশ্লীল—ফলানো। তারপর বলে যে আমার বাড়িতে আসবে। আমি গেলুম ওর বাড়িতে থাকতে, তার বদলে ও চায় আমার বাড়ি। একদিন ওর বাড়ি আমি থেকেছি, একদিন আমার বাড়িতে ও থাকবেই। একি কম্যুনিজ্‌ম নাকি? আমি ওর বাড়ি থাকবো বেশ করবো–বাপের টাকা আছে, একা টাকা ওড়াচ্ছে, খানিকটা মাল খেয়ে আগড়ম বাগড়ম করে–আমি ওর বাড়িতে থাকি, ধন্য হয়ে যায়, পরে জীবনীতে লিখবে কিন্তু–। আমার বাড়িতে জায়গা নেই।

আজ ভবকেষ্ট মিত্তিরের কাগজের অফিসে গিয়েছিলাম–শুনলাম আমার নাটকটা এমাস থেকে ধরবে না, আগে শেখরের উপন্যাস। শুনে গা জ্বলে গেল–শেখরের কি টাকার অভাব? ওর কি দরকার উপন্যাস লেখার–তা ছাড়া যখন শুনেছে আমি ওখানে লেখা দেবো। একশোটা টাকা পেলে আমার কত কাজে লাগতো। ভবকেষ্টর চ্যালা রামকেষ্ট আবার বলে, 'আপনি বিমলেন্দুবাবুর উপন্যাস একটা জোগাড় করে দিতে পারেন?' যেন বিমলেন্দু একটা বিরাট কেষ্ট বিষ্টু। ট্যাস লেখে! রাগে আমার মুখে থুতু এসে গিয়েছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল থুতু লোকটার মুখে মাখিয়ে দিই। তার বদলে হাসি এনে বললাম, 'ঠিক আছে, আমি এনে দেবো, আপনাদের আর যেতে হবে না ওর কাছে।' বিমলেন্দুকে একদিন কথায় কথায় বলে দিলেই হবে যে, 'ভবকেষ্ট তোর খুব নিন্দে করছিল, বলছিল, তোর 'কাচের মেঘ' গল্পটা কাফ্‌কা থেকে টোকা।' হারামজাদা, শুয়ারকা বাচ্চারা

ফোকটে নাম কিনছে। শিল্পের জন্য সর্বস্ব পর করলুম আমি–আর ওরা মজা লুটলো। আমি দিন রাত মানিনি, ভয়–ভাবনা মায়া–মমতা মানিনি, জীবনটাকে ছুঁড়ে দিয়েছি শুন্যে। আর ছাপার অযোগ্যরা রাত্রে বাড়ি ফেরা ঠিক রেখে, পরের দিনের গাড়িভাড়া বাঁচিয়ে, মা বোনের কাছে মান ঠিক রেখে, থানা–পুলিশ সামলে শিল্পী সেজেছে। শালারা আমার সঙ্গে ঘুরে–

নাঃ, বড় বেশি রাগ এসে যাচ্ছে। আ নেশাটা পুরো হয়নি, আর হাফ নেশা হলেই শরীরে বিষম রাগ এসে যায়, হয় সব অশ্লীলকে ডুবিয়ে ছাড়ি। ওদের নিয়ম, সাবধানের বারোটা বাজাই। সেদিন অবিনাশ হঠাৎ ছুটে রাস্তা পার হতে গেল—দুদিক থেকে দুটো গাড়ি, প্রচণ্ড ব্রেক কষার শব্দ, আমি মনে মনে চোখ বুঁজে খুশি হলুম। নিশ্চয়ই ওটা গেছে। ঈশ্বর, তুমি ধন্যবাদার্হ, ওর একটা কিছু শাস্তি পাওনা ছিল, প্রাণে যেন না মরে, হাত–পা খোঁড়া হয়ে যাক্। ভিড় ঠেলে গেলাম, হা হরি, একটা নিরীহ কুকুর চাপা পড়েছে, অবিনাশ অক্ষত। কুকুরটার জন্য এমন আন্তরিক দুঃখ হলো আমার যে অবিনাশকে চাপা দিতে পারেনি বলে গাড়ির ড্রাইভারের নাকে ঘুষি মালুম। বেঁচে থাকর আশ্চর্য ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে ওটা। তবে ওকে আমি শিক্ষা দিয়ে দেবো। বুঝিয়ে দেবো শিল্পের সঙ্গে শত্রুতা কি সাংঘাতিক জিনিস। অনিমেষের সঙ্গেও। সুযোগ পাচ্ছি না।

সেদিন হাসপাতালে গিয়েছিলাম–বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তাপস, শেখর, অম্লান, বিশ্বদেব, অনিমেষ, ছায়া, মায়া সব। অবিনাশের চোখ জ্বলজ্বল করছিল। পেচ্ছাখখানার পাশে এসে ওকে বললুম, 'কিরে কার মুখ দেখতে এসেছিস?' জবাব দিল না। একপাটি দাঁতের ওপর আর এক পাটি দাঁত ঘসে গেল–চোয়াল নড়া দেখে বুঝলুম। আবার বললাম, 'অমন ছটফট করছিস কেন?' উত্তর নেই। কাঁধে হাত দিয়ে বললুম, 'অবিনাশ–'। অত্যন্ত বিনীত গলায় ও বলল, 'পরীক্ষিৎ, তুই এখন অন্য কারুর সঙ্গে কথা বল্।' কোনো কারণে রাগ হলে আমি চুপ করে থাকতে চাই—আমি চেয়েছিলাম ওকে রাগিয়ে দিতে। রেগে গেলেই ও দু' একটা বোকামি করে, নইলে এমনিতে ভয়ানক সাহেন্‌শা ছেলে। মুখখানা টকটক করছিল অবিনাশের। অনিমেষ একপাশে দাঁড়িয়ে নখ খুঁটছিল, নার্স এসে বললো, 'কংগ্রাচুলেশান। আপনার ছেলে হয়েছে।'

'ছেলে!' অনিমেষের চেয়ে বেশি চেঁচিয়ে উঠলো শেখর আর ছায়া। যেন বাপের জন্মে কোনো ছেলে হওয়ার কথা শোনেনি। অনিমেষ সামনে এসে বললো, 'ওরা ভালো আছে তো? দুজনেই'–

'দুজন না, তিনজন!' নার্সটা মুচকি হাসলো। বেশ গোলগাল চেহারা, লেবুর মতো দুটো গাল, তবু মনে হলো পেছনে পড বেঁধেছে। নইলে অতটা উঁচু আর শেপলি! ইচ্ছে হলো, একটা টোকা মেরে—

'তিনজন? তার মানে?'

'হ্যাঁ, তিনজন।' সারামুখে নীলকালি মাখার মতো হাসলো নার্স। এবার লক্ষ্য করলুম, ওর বেশ গোঁফ আছে। একটু না, বেশ নীলের চেকনাই। পা দুটো যখন অত সাদা, তখন নিশ্চয়ই পায়ের লোম কামায়, সেই সময় কি গোঁফও চেঁছে নেয় নাকি মাঝে মাঝে অধিকাংশ মহিলা সাহিত্যিক গোঁফ কামায় শুনেছি। নিজে যাচাই করে দেখিনি অবশ্য।

'তিনজন কে?' অনিমেষ ক্যাবিনের দিকে যেতে গেল। নার্স মিষ্টি হেসে বলা, ঠিক যেন কোনো অশ্লীল কথা শেখাচ্ছে, 'আপনার যমজ হয়েছে। খুব ভালো ওয়েট, সাড়ে পাঁচ পাউণ্ড করে, সবাই ভালো আছে। আসুন আমার সঙ্গে, বেশি কথা বলবেন না। আমাদের সবাইকে মিষ্টি খাওয়াতে হবেকিন্তু।'

যমজ? শুনে আমরা সবাই সশব্দে বিস্মিত হয়ে গেলুম। সত্যিকারের যমজ? বহুদিন বাদে একটা খাঁটি আশ্চর্য ঘটনা শুনলুম। আমাদের চেনাশুনো কারুর কখনো যমজ সন্তান হয়েছে শুনিনি। ইস্কুলে আমাদের ক্লাশে প্রশান্ত আর সুশান্ত নামে দুই ভাই পড়তো। অনিমেষ একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছে। মুখখানা ফ্যাকাশে–নার্সের হাতটা খপ্ করে চেপে ধরে বললো, 'আপনি ঠিক বলছেন; আমারই–? ক্যাবিন নাম্বার থ্রি? কখন?'

নার্সটা যেন ভারী মজা পেয়েছে। কচি খুকির মতন চোখ ঘুরিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনারই, আপনার স্ত্রীর নাম গায়ত্রী তো? আপনাদের আগে বলা হয়নি, প্রথম বেবি হবার ঠিক এগারো মিনিট পরেই আরেকটি। কী ভাগ্য আপনার! দুটিই ছেলে, মেয়ে নয়!'

অনিমেষ তখনো নার্সের হাত ধরে আছে, জিজ্ঞেস করলো, 'দুজনেই–'

'হ্যাঁ, বলছি তো দুটিই ছেলে।'

'না, তা নয়, দুজনেই–'

'হ্যাঁ, বলছি তো দুটিই দুজনেই–'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দুজনেই বেঁচে আছে। খুব নর্মাল ডেলিভারি।'

অবিনাশ জিজ্ঞেস করলো, 'আর ছেলে দুটির মা কেমন আছে? গায়ত্রী?'

'খুব ভালো। জ্ঞানও ফিরে এসেছে। গিয়ে দেখুন না–হাসছে!' অবিনাশ অনিমেষের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'কংগ্রাচুলেসান!' করিডোর দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে বললো, 'তোমরা খবর শুনেছো? যমজ হয়েছে–'

শিশুর মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না, দুটো রক্ত–মাংসের পুতুল। ওদের চোখ, নাক, কান ও লিঙ্গ আছে, হাসি ও কান্না আছে, পেশীর শক্তিতে হাত ও পা ছুঁড়তে পারে। দুঃখ আছে–অর্থাৎ ক্ষিদে পেলে বা পিঁপড়েয় কামড়ালে কাঁদতে জানে–সুখবোধও আছে অর্থাৎ মায়ের বুক পাওয়া। শুধু নেই স্বাতন্ত্র্য। ওরা আলাদা নয় দুটোকেই আমার একরকম মনে হয়েছিল, হয়তো যমজ বলে ওরা এক রকম দেখতেই হবে–কিন্তু ওরা অন্য শিশুর চেয়েও আলাদা নয়, বস্তুতঃ দুনিয়ার সমস্ত সদ্যোজাত বাচ্চাই আমার কাছে এক। ওরা একই রকমভাবে চেয়ে থাকে। চৈতন্যের কোন প্রদেশ থেকে আসে ওরা, কি সরল ও দূরভেদ্য চেয়ে থাকা। কোথাকার এক বেঁচে থাকার প্রবল দাবী নিয়ে এসেছে, দুজনের বুকের ওপর আড়াআড়ি রাখা গায়ত্রীর হাত, দুটো মায়ার পিণ্ড। ওঃ, বিপুল প্রতীক্ষা ও দৈর্ঘ্য নিয়ে আসতে হয় পৃথিবীতে–কত কি শিখতে হবে–হাঁটা চলা শব্দব্রহ্ম থেকে বাক্যবন্ধ, খাবার চুরি, স্বর ও ব্যঞ্জন, পোশাক পরা, আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে এই অভিমানী জ্ঞান, ঘুড়ি বা লাট্টু, ছোঁকছোঁক, ফ্রক ও হাফপ্যান্টের নিচের রহস্য, নিজেকে লুকোবার জন্য শূন্যতা বোধ, রক্তের ডাক ও কর্মবন্ধন, তারপর আরেকজনকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে এইরকম আর একটা মাংসের পুতুল তৈরি করা। পরা–বিদ্যা বুঝি বলে একেই। অথবা চক্র দিয়ে আরম্ভ কি যেন একটা সংস্কৃত শ্লোক, পরে দেখে নেবো। অথবা সূক্ষ্মতা বুঝি এই। নাঃ, জীবচক্র জিনিসটা আমার পছন্দ হয় না। আমার পৃথিবীতে আমি কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাবো না।

আমি নবজাতকদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে—গায়ত্রীর ক্লান্ত খুশি ছুঁয়ে অনিমেষকে দেখলুম। যেন ওর ঈশ্বরদর্শন হয়েছে, এমন মুখ। খুব ইচ্ছে হলো ওকে একটা ধাক্কা দিই। ওকে বলি, 'অনিমেষ'–। মানুষের অতটা খুশি আমার সহ্য হয় না। না হয় যমজ ছেলেই হয়েছে! এমন কি দৃশ্য আছে পৃথিবীতে যা মানুষকে সত্যিকারের খুশি করতে পারে? গো না বুঁজলে মুখ জাগে না। আমি বলতে চাইছিলাম, 'অনিমেষ, চোখ বুঁজে নিজের মুখ দ্যাখ। ঐ সন্তান তোর কেউ নয়।'

···বন্ধুবান্ধব–ফান্ধব আমার মোটেই ভালো লাগে না। অর্থাৎ আমার কোনো বন্ধু নেই। যে আমাকে খাওয়াবে সে আমার বন্ধু। যে আমাকে রাত্রে থাকতে দেবে সে আমার বন্ধু। কোনো কাগজের জন্য যদি কেউ লেখা চেয়ে টাকা দেয়, বা যখন তখন সিগারেট পাওয়া যাবে বা ট্রামে–বাসে ভাড়া দেবে–তা হলে বন্ধু বলা যায়। আর কিছু আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনা এক–একটা আছে, ভিখিরির মতো বসে থাকে আর সাহিত্য–ফাহিত্য নিয়ে কথা বলতে চায়। আমিও তো ভিখিরি। ভিখিরির সঙ্গে ভিখিরির বন্ধুত্ব করে কি লাভ। মোটেই পছন্দ করিনা। অনেকে আমার বন্ধুত্ব করে ধরে শোধ চায়, যেমন আজ শেখর। কিন্তু সবচেয়ে বড় বদমাস অবিনাশ, কারণ ও আর আমার বন্ধুত্ব চায় না। ওর কথা ভাবলেই গা জ্বলে যায়।

—অতক্ষণ অন্ধকার দিয়ে হেঁটে এলাম, ওঃ কি অন্ধকার, হেঁটে এলাম না সাঁতরে এলাম। শরীর ডুবে গেল, গা–হাত–পা দেখা যায় না। চোখে–নাকে–কানে অন্ধকার ঢুকে যাচ্ছিল, খানিকটা অন্ধকার হড়াৎ করে খেয়ে ফেললাম ভুলে। কিছুক্ষণ পরে দাঁড়িয়ে একজায়গায় বমি করার মতো অন্ধকার বার করে দিলুম পেট থেকে, নাক ঝেড়ে সিকনির মতো অন্ধকার পরিষ্কার করলুম। তাও শালারা যেতে চায় না। খানিকটা বাদে রাস্তা ভুল হয়ে গেল। কাদার মত থকথকে অন্ধকার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘেন্নায় শরীর গুলোচ্ছিল।

একদিন কল্যাণের সঙ্গে এমন ঘোর অমাবস্যায় হেঁটেছিলুম, বহরমপুরে। কল্যাণ একটা চুরুট খাচ্ছিল। মাঝে মাঝে সেই চুরুটের ম্লান লাল আলো। সেদিন আর কি হয়েছিল মনে নেই, শুধু মনে পড়ে আমাদের দু'জনের বহুক্ষণ পাশাপাশি অন্ধকারে হাঁটা। ও, সেদিন আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। আহা, এতদিন মনে পড়েনি কেন? আমরা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার পাড়ে চলে এলাম গীর্জার পাশ দিয়ে। আমরা দু'জনে কোনো কথা বলিনি, এমনভাবে হাঁটছিলুম যেন বহুক্ষণ আরও ঐরকমভাবে হাঁটাতে থাকবো। কিছুক্ষণ আগে কল্যাণ গান গাইছিল চেঁচিয়ে–জোরালো ও সুরেলা গলা ওর অমন সিড়িঙ্গে চেহারায়। গান অসম্ভব ভালো লাগছিল, সেইসঙ্গে বিরক্ত হয়েছিলামও। কারণ, ও গান গাইছিল, আপন মনে, আমাকে গানের সঙ্গী করেনি। তারপর হঠাৎ চুপ করে উৎকটভাবে গম্ভীর হয়ে গেল। নদীর পাড়ে এসেও আমরা হাঁটা থামাইনি। মনে হলো আমরা নদীর ওপর দিয়েও যাবো। ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে জলের কাছে এলাম, আমার দেখতে ইচ্ছে হলো কল্যাণ কি করে। ও আস্তে আস্তে জলে নেমে যাচ্ছে, আমি দেখতে লাগলুম, প্যান্ট ভিজিয়ে ফেললো, যখন বুক জলে, তখন ফিস্‌ফিস্ করে আমি ডাকলুম, 'কল্যাণ!' কল্যাণ পিছন ফিরে তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলো, এসেও কোনো কথা বললো, না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। হঠাৎ বললো, 'শ্যামা কথাটার মনে কিরে?' কালো? তন্বী শ্যামা শিখরীদশনা · · · কালিদাসের নায়িকা কি কালো ছিল?'

আমি বললুম, 'না। শ্যামা মানে যে স্ত্রীলোকের শরীর শীতকালে গরম এবং গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা থাকে। হঠাৎ—'

'কিছুনা', ও বললো। আবার খানিকক্ষণ চুপ। পরে বললো, 'ওপারে একটা লোক দেখতে পাচ্ছিস?'

'ঐ যে দ্যাখ, লাল আলোর একটা ছিটে। হারিকেন হাতে মাঠের মধ্য দিয়ে একটা লোক হাঁটছে, আমার কি মনে হলো জানিস, আমিই এইমাত্র নদীটা পেরিয়ে গিয়ে ওপারে মাঠে হাঁটছি। তোকে বললুম, একটু দাঁড়া। কি রকম যেন স্বপ্নের মত এক মুহূর্তে দেখতে পেলুম।'

'ওপারে তো কবরখানা, তোর ওখানে রাতে যেতে ইচ্ছে করছে?'

'না। শুধু নদীর ওপারে যে–কোনো জায়গায়।'

হঠাৎ আমার মনে হলো, কল্যাণ কি রাখদুপুরে আমাকে একা পেয়ে কবিত্বে টেক্কা দিচ্ছে? ওর কথায় খানিকটা যেন সত্যিই গভীরতর সুর। বললাম, 'কি করে পার হবি? আমার তো মনে হচ্ছে এটা অন্ধকার, কাদায় থিকথিকে নরকের নদীর মত বিশ্রী।'

কল্যাণ আমার দিকে গূঢ় সন্দেহের চোখে তাকিয়ে রইলো, তারপর বললো, 'যাঃ, এতো গঙ্গা। পূণ্যসলিলা।'

'কিন্তু যাই হোক, তোর কি মনে হয় না এটা একটা অদ্ভুত জীবন্ত জিনিস যা কোনোদিন পার হওয়া যাবে না?' (কল্যাণ কোনিদনি পারবে এ রকম কথা বলতে?)

'আমি ঠিক পার হতে চাইনা। আমি ডুবে থাকতে চাই।'

'কিসে ডুবে থাকতে? নদীতে?'

'হ্যাঁ, সব নদীতে নয়, এখন, এইমাত্র মনে হচ্ছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছে ডুবে মরি। মরবো? তুই সাক্ষী থাকবি?'

'থাকবো। তার আগে তোর নীল স্যুটটা আমাকে দিয়ে যা। তোর ওটা আমার খুব পছন্দ মাইরি।'

'তুই জানিস্ না, পরীক্ষিৎ,—কল্যাণ কোট খুলতে খুলতে বললো, 'শরীরে বড় মৃত্যুভয় ঢুকেছে আমার। মনে হচ্ছে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। খুবই লজ্জা লাগে। কিছুই হলো না–জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা লেখা–লেখা খেরা করে কাটালুম। যখন চুল পাকবে, দাঁত থাকবে না, চোখের ছানি কাটাতে হবে–তখন হয়তো লেখার জন্য কিছু টাকাকড়ি পাবো–খবরের কাগজের লোকেরা যাকে বলে–সম্মান দক্ষিণা, তোর লজ্জা করেনা? এই কি জীবন নাকি? এর চেয়ে নিজের হাতে– তুই দাঁড়া, পরীক্ষিৎ, আমি যাই—'

'কোথায়?'

'জলে। নদীর বিছানায় ঘুমোই। কোনো ক্ষোভ থাকবে না–'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। সেইজন্যই তো আমিও গিয়েছিলাম আত্মহত্যা করতে–'

'কবে? তুই আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলি? তোর মতো–'

'কেন, জব্বলপুরে? ব্রীজ থেকে নদীতে লাফিয়ে পড়েছিলাম তোর মনে নেই?'

'তুই লাফিয়েছিলি? তুই তো হঠাৎ পড়ে গেলি'–

'নাঃ। এক মুহূর্তে আমার মৃত্যু মৃত্যু খেলে গিয়েছিল, হার্ট ফ্রেনের মতো। নীচে নদীতে অন্ধকার স্রোত দেখে মনে হয়েছিল, 'যাই' বলে সাড়া দিই। স্রোত, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। মাঝখান থেকে অবিনাশ এসে–'

দেখলুম কল্যাণ পেছন ফিরে উঠতে শুরু করেছে, আমার পুরো কথা না শুনে। সিঁড়ির ওপরে গিয়ে মূর্তিটার নিচে দাঁড়ালো–বিশাল মর্মর মূর্তিটা ঝুঁকে আছে, কোনো ইংরেজ রাজপুরুষের বোধহয়, যেন মূর্তিটা– যেন মূর্তিকা কোনো তুলনা মনে আসছে না, শুধু মূর্তিটাই চোখে ভাসছে– বিশেষতঃ ঐ অন্ধকারে তলোয়ারের উপর হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়ানো, – মনে পড়ছে মূর্তিটার নীচে কল্যাণকে কি সাধারণ ও অকিঞ্চিৎকর লেগেছিল, ভেবেছিলাম, মানুষ কি একটা মূর্তির চেয়ে নগণ্য বা কম জীবন্ত? পরে ভাবনাটা সংশোধন করে নিয়েছি। মানুষ না, শুধু কল্যাণ। ঐ বাস্টার্ড। ওকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। খালি বড় বড় কথা।

শনিবার,২৯শেএপ্রিল।

কাল সারারাত মাথায় ব্যথা হয়েছে। মাথার যন্ত্রণা কিংবা মাথাধরা নয়। মাথার পিছনে চার ইঞ্চি জায়গা জুড়ে সমতল ধরনের ব্যথা। শুয়েছিলাম, হঠাৎ মাঝ রাত্রে মনে হলো ভূমিকম্প। হচ্ছে, খাট ও ঝোলানো আলোটা দুলছে– শুনতে পেলাম দূর থেকে শত শত শাঁখের আওয়াজ, প্রবল ভয়ে উঠে দাঁড়ালুম, মেঝেতে পা রাখতে পারছিলাম না, 'মা মা' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম, মা যে বাড়িতে নেই মনে পড়েনি, শুধু মনে হয়েছে মাকে ডেকে বাইরে কোনো খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে বাঁচতে হবে, বাড়ির সামনে খোলা জায়গা নেই,–পুরো গলিটা পেরিয়ে রাস্তার ওপারে ঘুঁটে দেবার মাঠ, গলিটা পেরুবো কি করে? 'মা মা' বলে ডেকে দেয়াল ধরে ধরে পাশের ঘরে এলাম, দিদি ওর বাচ্চাদের নিয়ে সুখে ঘুমোচ্ছে, এখনও টের পায়নি, ডাকতে গিয়েও মনে হলো, থাক না, ওরা নিশ্চিন্তে ঘুমোক, দেয়াল চাপা পড়ে মরে তো মরুক, বিধবা হয়ে দিদি বেশিদিন বেঁচে কি করবে– পরক্ষণেই মনে পড়লো, একবার আমার ডান হাত ভেঙে যেতে দিদি আমাকে অনেকদিন নিজের হাত খাইয়ে দিয়েছে, তৎক্ষণাৎ দিদিকে ডেকে বাঁচাবার কথা মনে হলো। সেই সময়–শিয়রের কাছে জানলাটা খোলা, ছায়া দুলছে না, আলো দুলছে না, বুঝতে পারলুম, দিদির ঘরে ভূমিকম্প নেই। থেমে গেছে, না ভূমিকম্প আরম্ভই হয়নি? আমি স্বপ্নে ভয় পেয়েছিলাম? নাকি, পৃথিবীতে এইমাত্র কয়েক সেকেণ্ডের একটা বিষম ভূমিকম্প হয়ে গেল যা শুধু একা আমার শরীর কাঁপিয়েছে! আবার মাথার যন্ত্রণা শুরু হলো।

সেই সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, রাত দুটো কি সাড়ে তিনটে, বাবাকে দেখতে পেলাম। কোর্ট থেকে ফেরার সময় যে রকম পোশাক পরতেন, ঠিক সেই পোশাকে, কালো সিল্কের কোট, কালো টাই, ধবধবে সাদা স্টিফকলার ও জামার হাতা। চোখে প্যাসান। জিজ্ঞেস করলুম, 'বাবা আপনি হঠাৎ? কি মনে করে'–

'তোমাদের দেখতে এলাম। তা ছাড়া আমার নস্যির কৌটোটা ফেলে গিয়েছিলাম।' বাবা খুব ধীরে ও পরিষ্কার গলায় বললেন।

'আপনাকে আবার দেখবো আশাই করিনি, আপনি তো–'

'তুমি কেমন আছো, পরীক্ষিৎ, একটু রোগা হয়ে গেছো।'

'কিন্তু আপনার চেহারা একই রকম আছে। কি করে ফিরলেন?'

'আমার সোনার হাতঘড়িটা বিক্রী করে দিয়েছো শুনলাম।'

'আপনি কি করে ফিরলেন? মরে যাবার সাত বছর পরে—'

'ঘড়িটা আমার খুব প্রিয় ছিল, আমার বাবা ওটা দিয়েছিলেন আমাকে। তিনি বলেছিলেন, এই ঘড়ি তোমাকে দিলাম। এটা কখনও বন্ধ হয় না। এটা তুমি তোমার সন্তানকে দিও। কিন্তু সেই সময়কে তুমি রাখলে না, পরীক্ষিৎ।'

'মৃত্যুর পরও কি ফিরে আসা যায়? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে–'

'আমার মেডেলগুলো সব অশ্বিনীর কাছে বন্ধক দিয়েছো। ওগুলো কি ছাড়াবে?'

'ছাড়াতাম। কিন্তু স্যাকরা বেচে দিয়েছে বললো।'

'মিথ্যা কথা বলো না আর এখন। আসলে তোমার–'

'আপনি মৃত্যুর কথা বলুন।'

'ছাড়াবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। তুমি নিজে লেখাপড়া করলে না। এমন কিছুই করতে পারবে না যাতে ওরকম মেডেল পাবে–সেইজন্য তোমার বাবার মেডেল তোমার সত্য হচ্ছিল না। কিন্তু তোমার মা ওগুলো খুব ভালোবাসতেন। তাঁকে এখনও বলোনি–'

'সাত বছর আগে আপনাকে আমি পুড়িয়ে এসেছি শ্মশানে। সেদিন খুব বৃষ্টি ছিল। আপনাকে বয়ে নিয়ে যেতে অনেক লোক এসেছিল, কিন্তু আমার এমন কাঁধে ব্যথা হয়েছিল যে একসপ্তাহ ব্যথা ছিল। আপনি জানেন না, জেনে রাখুন, আপনার প্রিয়বন্ধু সতীশবাবু শ্মশানে যাননি। বুলিমাসীর বর আপনার টাকা ফেরৎ দেননি। কিন্তু আপনি কি করে মৃত্যুর পর আবার ফিরলেন, সেই কথা বলুন।'

'আমার ফটোর কাচটা ফেটে গেছে। ওটাকে সারিয়ে অন্য কোথাও রাখাই তোমার উচিত'–

'মৃত্যুর দেশ থেকে যদি ফিরে আসা যায়, তবে আমিও আপনার সঙ্গে যাবো। ফিরে এসে আমি সেই অ্যাডভেঞ্চারের কথা লিখলে পৃথিবীতে হৈ হৈ পড়ে যাবে।'

'ওরকম জানলার পাশে মাথা দিয়ে শুয়ো না। ওতে বুকে সর্দি বসে যায়।'

'আপনি মৃত্যুর কথা বলুন! মরার পর আপনি একটুও বদলাননি তো! কেমন করে–'

'আমার বড় শীত করে রে খোকন, আমাকে একটা কম্বল দিতে পারিস?'

'না। আমাদের আর একটা কম্বল নেই। আপনারটা দিদির ছেলে গায়ে দিচ্ছে–'

'কিন্তু আমার যে বড় শীত করে। চিতায় যাবার পর আর আগুন দেখিনি। আমার প্রথমবার বাৎসরিক কাজটাও করিসনি!'

'তখন জামাই বাবুর অসুখ ছিল। ভেবেছিলাম, জামাইবাবুর শ্রাদ্ধ আর আপনার বাৎসরিক এক সঙ্গে করবো।'

'মরার আগের দিন তোকে–'

'আপনি মরার পরের–'

'একটা কথা–'

'কথা–'

'বলতে চেয়েছিলাম। তুই আসিসনি, আমার–'

'বলুন, আমি তাই শুনতে চাই–'

'আমার ওখানে বড় শীত করে পরীক্ষিৎ। তোর কথা ভেবেও আমার শীত করে।'

শেখর

সকালবেলা সারা শরীর ব্যথা করে প্রত্যেকদিন। অধিকাংশ দিনই রাত্রে আলো নেভাতে মনে থাকে না। দিনের বেলা আলোটা নেভাতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে তাকাই। কি করুণ মূর্তি ঐ আলোর। আমাদের তিন-পুরুষের বাড়িতে —এখনও কিছুকিছু ঝাড়লণ্ঠন আছে —সেগুলো নষ্ট করিনি,

BANGLAPDF.NET

ভেতরে বাল্‌ব বসিয়ে জ্বালি। রাত্তিরবেলা খুব জমজমাট দেখায়। প্রাচীন রাজপুরুষের মতো। কিন্তু দিনের বেলা কি মলিন রুগ্‌ণ চেহারা আলোটার —আমি দিনের বেলাতেই এটাকে দেখতে ভালবাসি। রাত্তিরের অত প্রখরতা সহ্য হয় না। সুইচ টিপে আলোটা একবর নেভাই ও জ্বালি আলোটা নেভালেই রোদ্দুর চোখে পড়ে বিশেষভাবে– রোদ্দুর দেখলেই মনে হয় দূরে চলে গেছি, ধানবাদের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি অথবা কুচবিহারে অথবা ছেলেবেলায় খুলনায় যেমন হাঁটতুম শশাঙ্কর সঙ্গে। সকালে উঠলেই শরীর ব্যথা করে। এ বেশ মজা, রাত্তিরে কোনোদিন ঘুম আসতে চায় না, প্রতিদিন স্লিপিং পিল খেতে হয়, তবু ঘুম আসে না, দেয়ালে ছবি দেখি, ছবি তৈরি করি, ছবি নষ্ট করি। শেষরাত্রে ঘুমের মতো আচ্ছন্নতা। সকালে গা ব্যথা। সেই ব্যথা সারাবার জন্য আবার ট্যাবলেট খাই। শুনেছি, বেশি ট্যাবলেট খেলে রাত্রে ঘুম হয় না। ঘুম হয় না বলে রাত্রে ট্যাবলেট খাই, সেইজন্য সকালে গা ব্যথা। আবার গা—ব্যথা সারাবার জন্য ট্যাবলেট খাই, সেইজন্য আবার রাত্রে ঘুম হয় না। সকালে যার সঙ্গে দেখা হয়, আবার বিরস মুখ দেখে শারীরিক ব্যাপারে প্রশ্ন করে। আমার সেই গা ব্যথার কারণ বলি। 'ঐ ট্যাবলেটটা খাসনা কেন? খুব ভালো দেয়–শরীর একেবারে ঝরঝরে করে দেবে' –এই বলে একটা ট্যাবলেটের নাম করে। রাত্রে যার সঙ্গেই দেখা হয়, কথায় বিল, 'রাত্রে একদম ঘুম হচ্ছে না ভাই।' সঙ্গে সঙ্গে কেউ না কেউ বলে – 'অমুক ওষুধটা খেয়ে দ্যাখ। মন্ত্রের মতো অ্যাকসান, দশটা ভেড়া গোনার আগেই গুমিয়ে পড়বি।' প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ওষুধ জানে। সবগুলিই কার্যকরী। কিন্তু সবগুলোই আংশিক। সকলেই আংশিক ওষুধ নিয়ে আছে।

তিনফর্মা প্রুফ জমে গেছে–কখন দেখবো জানি না। একেবারে সময় পাই না। মাথার মধ্যে অনেকগুলো সরু সরু রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। সেই সবকটা রাস্তার ট্র্যাফিক আমাকে একা সামলাতে হয়। সবুজ, লাল, হলুদ আলো জ্বলে আমি টের পাই। মাথার মধ্যে একটা জাঁদরেল পুলিশ অফিসার সব সময় ব্যাটন হাতে রাগে ঘুরে বেড়াচ্ছে– তারই আশেপাশে আর একটা রোগা উদ্‌ভ্রান্ত লোক, ছেঁড়া জামা, তিনদিন দাড়ি কামায়নি–সেই লোকটা বলছে, 'ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন,।' এই ক্ষমাপ্রার্থী নিরীহ লোকটি ও ক্রুদ্ধ পুলিশ অফিসার ঘুরছে আমার মাথার মধ্যে, নানান রাস্তার দিয়ে ছুটছে, কখনো হাঁটুমুড়ে বসছে, লুকোচ্ছে –এরা কি নাটক তৈরি করছে জানি না। এরা আমারই মাথার মধ্যে, তবু এদের চিনি না আমি। কখনো বা পুলিশ অফিসারের মতো লোকটা গর্জন করে বলেছে, 'না, ক্ষমা করবো না, ক্ষমা নেই'–এই বলে পাছে ক্ষমা করে ফেলে এজন্য ছুটে পালাচ্ছে–আর নিরীহ করুণ লোকটা 'ক্ষমা করুন, ক্ষমা করতেই হবে' বলে তাড়া করছে তাকে। সেই অদ্ভুত দৌড়—প্রতিযোগিতা মাথায় নিয়ে আমি বসে থাকি টেবিলের সামনে, গায়ে ব্যথা, প্রুফ যেমন তেমন পড়ে থাকে, ডানাভাঙা পাখির মতো উল্টানো আদ্ধেক শেষ-করা বই, ড্রয়ারে আদ্ধেক শেষ-করা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। ঐ পাগলাটে দৌড়ের জন্য মাথাও ব্যথা হয়।

এ ছাড়া আছে মাধবী। সপ্তাহে তিনদিন মাধাবী আসে আমার বাড়িতে দুপুরবেলা। এখন কলেজ বন্ধ বলে সন্ধেবেলাটা শুধু শুধু ছাত্রী পড়িয়ে নষ্ট করতে চাই না। তাই ওকে দুপুরেই আসতে বলেছি. শুধু দুপুরবেলাটুকু ও থাকে–কিন্তু আমাকে ব্যাপৃত রাখে সারাদিন। যেদিন দেখা হয় – সমস্ত দিনটা মাধবীর কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। অতিকষ্টে তবু বন্ধুবান্ধবদের কাছে থেকে দুপুরবেলাটা ছিনিয়ে নিয়েছি। আমার বাড়িতে যে যখন ইচ্ছে আসে, আমি থাকি বা না থাকি আমার ঘরের এসে আড্ডা মারে। মাকে ডেকে চায়ের হুকুম করে। বন্ধুরা বসে থাকবে বলে আমাকে সবসময় তাড়াতাড়ি ফিরতে হয় বাড়িতে। বলতে গলে আমার স্বাধীন সময় কিছুই নেই। প্রত্যেকে অনায়াসভাবে আড্ডা মারতে আসে আমার সঙ্গে—কিন্তু আমার কোনো নির্বাচনের অধিকার নেই। কারণ আড্ডার জায়গা আমার বাড়ি। অনেকে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসে

বাড়িতে। কেউ হয়তো এসে বললো, 'ওমুক এসেছে?' বললুম 'না।' সে বসে রইলো, বইএর পাতা ওল্টাতে লাগলো। খানিকটা বাদে ওমুক এসে বললো, 'আরো তুই কতক্ষণ এসেছিস?' আমি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। খানিকটা বাদে তারা নিজেদের কথা সেরে–তারপর আমর সঙ্গে দু'–একটা মুখরাখা কথা বলে 'আচ্ছা চলি,' –বিদায় নেয়। অতিকষ্টে সবাইকে নোটিশ দিয়ে বলেছি, 'দুপুরবেলা কেউ আসবে না। দুপুরবেলা আমি একা থাকতে চাই।' দুপুরবেলা মাধাবী আসে ইতিহাস পড়তে।

টেবিলের ওপাশে বসে যখন আমি ওকে মিউজিয়ামের পাথর বিষয়ে বই–পড়া বক্তৃতা শোনাই, তখন চুপ করে বসে থাকে মাধবী, একটাও শব্দ করে না– খানিকটা বাদে লক্ষ্য করি–ও একটাও কতা শুনছে না আমার, শুধুই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি থেমে যাই, জিজ্ঞেস করি, 'কি দেখছো?'

'ওটা কার ছবি?'

তখন বুঝতে পারি–ও আমাকে দেখছে না, দেখছে আমার পিছনের দেয়াল। বলি, 'সালভাদোর দালি, ছবিটার নাম – জলন্ত জিরাফ।'

'ওঃ। আচ্ছা, তারপর বলুন।'

কখনো কখনো শুধুই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তখনো জিজ্ঞেস করি, 'কি দেখেছো?'

'আপনাকে।'

এরকম পরিষ্কার ভাবে কোনো মেয়ে কথা বলে না। অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে কোনো ছাত্রী বলে না, আমি আপনাকে দেখছি। শুনে আমি একটু থতমতো খেয়ে যাই। কিন্তু ছাত্রীদের এসব ব্যবহারের প্রশ্রয় দিতে নেই। তা হলে চাকরি রাখা যায় না। সেইজন্য আমি খানিকটা নির্বিকার ভাবেই বলি, 'আমাকে কি দেখার আছে? এমন কিছু দর্শনীয় নই। নিয়নডার্থাল স্কাল আমার, লক্ষ্য করছো?'

'তা নয়। আপনাকে আমার একজন চেনা লোকের মতন দেখতে। খুব মিল আছে। সত্যি আপনি অনেকটা অবনীভূষণের মতো দেখতে।'

একথা মাধবী আরও কয়েকবার বলেছে। কে অবনীভূষণ আমি জিজ্ঞেস করিনি কখনো। মাধবীর সঙ্গে তার কী সম্পর্ক, সে কোথায় এখন, বেঁচে আছে কিনা কিছুই জানিনা। মাধবী কখনো বলেনি। যেন ওর সঙ্গে আমার একটা লুকোচুরি খেলা চলছে এই নিয়ে। আমিও কিছুতে জিজ্ঞেস করবো না, মাধবীও জিজ্ঞেস না করলে বলবে না। দুজন মানুষ কখনো একরকম দেখতে হয় না। অবনীভূষণকে আমার মতো দেখতে – অর্থাৎ তার মুখ বা চোয়াল আমার মতো, অথবা তার চোখ, অথবা আমার মতো কোনো ভঙ্গী। কোথাও আমার মতো আর একজন লোক আছে— এই দুশ্চিন্তা আমাকে বিষম বিব্রত করে। লোকটি সম্বন্ধে খুবই কৌতূহল হয়, ঈর্ষা নয়, সে যদি মাধবীর প্রেমিকও হয়, তবুও না। আমি নিজের চিন্তা ভুলে গিয়ে আমারই মতো অন্য একটা লোক, অবনীভূষণ, তার চিন্তায় বিভোর হয়ে যাই। ক্রমশঃ, এই ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, অবণীভূষণ নিমিতই মাধবীর প্রেমিক–মাধবী যেভাবে নামটা উচ্চারণ করে। লোকটা হয় এদেশে নেই এখন, বা মারা গেছে। মাধবীর মতো ধনীর দুহিতার সঙ্গে যখন প্রেম—তখন সেও নিশ্চয়ই খুব উঁচু বংশের ছেলে। মাধবীর সঙ্গে টেনিশ খেলতে খেলতে কিংবা গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে ষাট মাইল স্পীডে গাড়ী চালাতে চালাতে কি করে আমারই মতন চেহারার একজন লোক মাধাবীকে প্রণয় জানাতো, কি ভাষা ব্যবহার করতো—ভাবতে ভাবতে আমিও একদিন মাধবীর প্রেমিক হয়ে পড়ি। এর আগে, কত মেয়ের সঙ্গেই তো চেনাশুনো, জানা আরও অনেক কিছু হলো, কিন্তু কখনো কোনো মেয়ের সম্পর্কে আমি এত বেশী ভাবিনি, বিশেষত ছাত্রীদের সম্পর্কে তো নয়ই।

ছাত্রীদের ব্যাপারে আমি কখনো মাথা ঘামাই নি, আগে অনেক সুযোগ এসেছিল, মাধবীর চেয়ে অনেক সুন্দরী মেয়ে–তবুও না, কিন্তু হঠাৎ মাধবী আমার হৃদয়ের তিন ভাগের এক ভাগ দখল করে ফেলেছে। সত্যি, আমি এ–কদিনে অনেক বদলে গেছি। আমার চিন্তা ও স্বভাবের অনেক বদল হয়েছে। আর, চিন্তার দিক দিয়ে বদলে গেছি বলেই কি আমার চেহারাও বদলে গেছে? কোথাকার কোন্ এক অবনীভূষণের মতন দেখতে হয়েছে আমাকে? রাত্তির বেলা, বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি অবনীভূষণ হয়ে যাই, হয়ে গিয়ে মাধবীর কথা ভাবি। মাধাবীর জন্য বিষম মন কেমন করে, নিজেকে অবনীভূষণ ভেবে।

মাধবীর ধরন—ধারণ ঠিক ছাত্রীর মতো নয়, অনেকটা প্রভূপত্নীর মতন। বড়লোকের মেয়ে বলেই বোধহয় একটু দেমাকি স্বভাব। আগে এ জন্য ওকে খুব পছন্দ করতুম না। এখন ওর এই অভিজাত ভঙ্গীও আমার খুব ভালো লাগে। আমার সিগারেটের ছাইঝাড়ার ধরন থেকে একদিন মাধবী বললো, 'অবনীভূষণও ঠিক এই রকমভাবে ছাই ঝাড়তো।' বস্তুতঃ, আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। কারণ আঙুলে টুসকি মেরে আমিও আগে কখনো ছাই ঝাড়িনি, আজকেই প্রথম। কি করে এ স্বভাব আমার হলো–তবে কি আমি সত্যিই ক্রমশঃ অবনীভূষণ হয়ে যাচ্ছি? প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য আমি বানিয়ে বললুম, 'আমি এ রকম টুসকি মারার কায়দা শিখেছি আমার বন্ধু পরীক্ষিতের কাছে থেকে। তুমি তাকে চেন?'

'নাম শুনেছি। লেখেন তো? আপনার বন্ধুদের মধ্যে আমি শুধু অবিনাশ মিত্রকে চিনি, একদিন আলাপ হয়েছিল। খুব চমৎকার লোক।'

অবিনাশ কি বিশ্বশুদ্দু সব মেয়েকে চেনে? অবিনাশের সঙ্গে কবে কোথায় আলাপ হয়েছিল জিজ্ঞেস করতেও ভয় হলো। কি জানি অবিনাশ এর হৃদয়ও রক্তাক্ত করেছে কিনা। না করেনি। যেরকম আলতোভাবে মাধবী চায়ের কাপে চামচ নাড়ছে–তাতে বুঝতে পারা যায়। এরকম কোমলাতা কেনো আহত নারীর থাকে না। আগে মাধবীকে খুব একটা রূপসী মনে হতো না, কিছুটা স্থূল, শরীর থেকে অন্ততঃ দশ পাউণ্ড ওজন কমালে ফিগার সুন্দর হবে ভাবতুম, নাকটাও একটু চাপা। ক্রমশঃ মনে হচ্ছে – ওরকম গ্রীবার লাবণ্য আমি আগে কোনো মেয়ের দেখিনি, ওরকম স্নিগ্ধ অথচ চুম্বকের হাসি। অর্থাৎ মাধবীর প্রতি আমি মায়ায় আবদ্ধ হয়ে গেছি, যাকে বলে ভালোবাসা। মনে হয়, মাধবীর দুই বাহু পেলে এ–জীবনে উদ্ধার পেয়ে যাবো। হঠাৎ আজকাল এরকম উদ্ধার পাবার ইচ্ছেই বা কেন মনে জাগছে?

এ ছাড়া আর একটা দৃশ্যও আমাকে খুব বিরক্ত করছে আজ কয়েকদিন। ঢালু অন্ধকার রাস্তা, দু'পাশে গাছের সারি, একটা মোটরগাড়ি হেডলাইট জ্বেলে স্পীডে নেমে আসছে। কোনো কিছু লিখতে গেলেই প্রথেমে এ দৃশ্যটা চোখে ভাসে। অথচ, এমনকি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য এটা—কোথায় দেখেছি তাও মনে পড়ে না। অন্ধকার ঢালু রাস্তায় মোটরগাড়ি দু'পাশের গাছের সারির মধ্যে দিয়ে তীব্র আলো জ্বেলে নেবে আসছে। কোথাকার অন্ধকার, কোন ঢালু রাস্তা, কে গাড়ির চালক কিছুই জানিনা। অথচ দৃশ্যটা তাড়িয়ে দিতেও ইচ্ছে করে না—আপনা থেকে কেন এলো জানতে ইচ্ছে হয়।

সামনে একতাড়া প্রুফ ছড়ানো –আমি মাথার মধ্যে পুলিশ ও ক্ষমাপ্রার্থী, মাধবী, অবনীভূষণ, অন্ধকার ঢালুপথে গাড়ির দৃশ্য নিয়ে চুপ করে বসে আছি। এই সময় পরীক্ষিৎ ও অনিমেষ এলো। অনিমেষ কাল ফিরে যাবে এক ছেলে ও গায়ত্রীকে নিয়ে। আর একটা ছেলে বাঁচেনি। সিগারেটের ছাই–এর সঙ্গে প্রচুর কথা উড়ে গেল। অনিমেষ শান্ত গলায় থেমে থেমে পুরোনো দিনের কথা বললো। বললো, 'ছেলেটাকে শ্মশানে পোড়াতে গিয়ে পুরোনো কথা সব মনে পড়লো আবার। বোধহয় বছর চারেক পর শ্মশানে গেলুম।'

'আগে তো প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা ওখানেই আমাদের আড্ডা ছিল।' এতদিন পর শ্মশানে গিয়ে অনিমেষের মনটা একটু ভারী হয়ে গেছে মনে হলো। ছেলে মরার জন্য ওর কি খুব দুঃখ হয়েছে! ছেলে মরার পর দুঃখ হওয়াই তো স্বাভাবিক। কিন্তু যমজ ছেলের এক ছেলে বেঁচে আছে, একজন মরেছে, সুতরাং একজনের জন্য আনন্দ, আরেক জনের জন্য দুঃখ, কিন্তু কোনটা বেশী? যাইহোক, অনিমেষকে কিছুটা অন্য কথা বলে ভোলানো দরকার। আমি বললুম, 'তোমার মনে পড়ে অনিমেষ, শ্মশানের পাশে আমাদের রাত্রে শুয়ে থাকা? বগলে ব্র্যান্ডির বোতল, ইট বাঁধানো ঢালু গঙ্গার পাড়ে? কে যেন গান গাইতে গাইতে গড়িয়ে পড়ে গেল—পরীক্ষিৎ না অরুণাংশু? ওঃ গগন, মনে আছে।'

'কেন, সেবার সেই দুর্গাপুজোর সময়ে মনে নেই?'

মনে পড়তেই হাসি পেয়ে গেল। অরুণাংশু দুটো হুইস্কির পাঁইট পকেটে নিয়ে ঘুরছে—কোথাও বসে খাবার জায়গা নেই। আমি বললুম, 'চল, গঙ্গার পাড়ে যাই।' দুর্গাপূজোর অষ্টমীর দিন—কিন্তু গঙ্গার পাড় ভিড়ে ভর্তি। অন্ধকারে জোড়ায় জোড়ায় ছেলে —মেয়ে বসে আছে। আমরা কোথাও আর জায়গা পাইনা—ওদের বিরক্ত করতেও ইচ্ছে করে না। শেষ পর্যন্ত বটগাছের নীচে এক সাধুর আশ্রমের কাছে আমরাও সাধু সেজে বসে গেলুম গোল হয়ে। দু' এক চুমুক দেবার পর মনে হলো খানিকটা জল দরকার। সাধুটাকে বললাম। সে বললো, 'গঙ্গাজীমে ইতনা পানি হায়, পি লেও।' তাই নিতাম, কিন্তু তাপসটা খানিকটা পৌঁছিন—ও কিছুতে গঙ্গার জল মেশাবে না। তখন অরুণাংশু একটা চাঅলাকে ডেকে চা না কিনে খালি ছটা ভাঁড় কিনলো। শুধু ভাঁড় দিয়ে কি করবো দেখার জন্য কৌতূহলী চাঅলা খানিকটা দাঁড়িয়ে ছিল—হঠাৎ অরুণাংশু জমিদারী কায়দায় তাকে হুকুম করলো, 'এই চাঅলা, তোমার কলসীটা রেখে এক বালতি পরিষ্কার জল নিয়ে এসো তো।' লোকটা ইতস্তত ঃ করতে—অরুণাংশু বিষম ধমক দিলো, 'যা—ও! দেখছে কি হাঁ করে?' পরীক্ষিৎ গাঁজার খোঁজে সাধুর ঝুলিতে হাত দিয়ে—

'কিরে পরীক্ষিৎ, তোর মনে পড়ে?'

পরীক্ষিৎ চুপ করে বসে ছিল। শুকনো হাসি হেসে বললো, 'হুঁ।'

আমি বললুম, 'কি রে, তোর শরীর খারাপ নাকি?'

'না, কিছুটা। ভাবছি অনিমেষের সঙ্গেই বাইরে চলে যাবো। কয়েক দিন ঘুরে এলে ভালো লাগবে। তোর এখানে অবিনাশ আসে?'

'না, অনেকদিন আসেনি।'

'আমার সঙ্গে কাল দেখা হয়েছিল,' অনিমেষ বললো, 'কাল রাইটার্স বিল্ডিং—এ ওর অফিসে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে বেরিয়ে এলো। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে বহুদূর গিয়েছিলাম—প্রায় খিদিরপুর পর্যন্ত। অনেক কথা বললো অবিনাশ—'

'নিশ্চয়ই ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা?' পরীক্ষিৎ বললো।

'না। খুবই আন্তরিক। অনেক বদলে গেছে অবিনাশ। অনেক সরল হয়েছে।'

'না, সরল না, সরলতার ভান!'

'তাতেই বা ক্ষতি কি? ভান করতে করতে কেউ যদি সত্যিই সরল হয়—তাও কম নয়। নিষ্ঠুরতার ভান করার চেয়ে তা অনেক ভালো।'

'ওকি বুঝেছে যে, ও সারাজীবন যত পাপ করেছে তার ফল ভোগ করতে হবে?'

'পাপ কথাটা অত সহজে উচ্চারণ করিস্ না পরীক্ষিৎ। কোনো মানুষ যদি নিজেদের সত্যিকারের পাপী মনে করে, তবে তার পক্ষে আর বেঁচে থাকাই মুস্কিল।'

BANGLAINTERNET.COM

'হঠাৎ অবিনাশকে নিয়ে এত কথা কেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমার অবিনাশকে দরকার, পরীক্ষিৎ বললো, 'ওর সঙ্গে আমার কয়েকটা অ্যাকাউন্ট মেটাতে হবে।'

অনিমেষ পরীক্ষিতের দিকে তেরছা ভাবে তাকায়। তারপর আচমকা প্রশ্ন করে, 'তুই কেমন আছিস্‌রে পরীক্ষিৎ?'

পরীক্ষিৎ প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারে না। চোখ ছোট করে জিজ্ঞেস করে, 'কেন হঠাৎ একথা?

'কী রকম যেন মনে হচ্ছে, তুই কিছুদিন ধরে মনের মধ্যে কোনো কষ্ট নিয়ে আছিস্।'

'কষ্ট? না, মনের মধ্যে কোনো কষ্ট নেই। তবে মাথায় যন্ত্রণা হয় মাঝে মাঝে। সেই যে তোর ওখানে মাথায় লেগেছিল।'

'ওঃ, সেই অ্যাকসিডেন্টের কথা ভাবলেও এখন ভয় হয়! ওরকমভাবে ব্রীজ থেকে পড়ে গেলে কেউ—'

'ও মোটেই অ্যাকসিডেন্ট নয়! আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম।'

'আত্মহত্যা? যাঃ! বেশ তো রেলিং-এর ওপর বসে বসে গান গাইছিলি, যাঃ ও ভাবে কেউ আত্মহত্যা করে? কেন, আত্মহত্যা করবি কেন?'

'এখন তো করতে চাই না। সেদিন চেয়েছিলাম।'

'কেন?'

'আজ আর কারণটা মনে নেই। তবে, সেদিন মনে হয়েছিল, আর এক মুহূর্তও আমি বাঁচতে চাইনা।'

আমি চুপ করে অনিমেষ আর পরীক্ষিতের কথা শুনছিলাম। পরীক্ষিতের কথা শুনে আমার হাসি পেল। বললুম, 'তুই আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলি? কিন্তু, অবিনাশ যে অন্যকথা বলে।'

'কি বলে অবিনাশ?'

'অবিনাশ তো বলে, ও-ই নাকি হঠাৎ ঠেলে ফেলে দিয়েছিল তোকে?'

অনিমেষ চমকে উঠে বললো, 'অবিনাশ ঠেলে ফেলে দেবে? যাঃ, আমি বিশ্বাস করি না। তা ছাড়া অবিনাশ তো তখন কাছাকাছি ছিলই না। ও তো সিগারেট কিনতে গিয়েছিল।'

' তোমার মনে নেই। সিগারেট তো কিনেত গিয়েছিল তাপস! অবিনাশ নাকি—'

পরীক্ষিৎ গম্ভীর ভাবে বললো, 'অবিনাশ বলে নাকি এই কথা? অবিনাশ আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল? কেন? সে এ কথা বলেছে?'

'জানি না। তোর আর অবিনাশের মধ্যে কি যে ব্যাপার আছে। যাক্ গে, তোর মাথায় এখনো ব্যথা করে, তুই ডাক্তারের কাছে যা না।'

'যাবো। কিছু টাকা ধার দিবি?'

'ঐ —তো! কিছু একটা ভালো কথা বললেই অমনি টাকা! দরকার নেই তোর ডাক্তারের কাছে যাবার।'

'দে না। কটা টাকা ধার দে না। বড়লোকের মেয়েকে পড়াচ্ছিস, তোর অনেক টাকা।'

'ধার বলিস কেন? কোনোদিন টাকা নিয়ে ফেরৎ দিয়েছিস? ভিক্ষে চাইতে পারিস না?'

ঠিক এই সময় অবিনাশ ঢুকলো আমার ঘরে। শান্ত মুখমন্ডল। অবিনাশকে দেখে প্রথমেই আমার মনে হলো— ওর কাছে অবনীভুষনের কথাটা জিজ্ঞেস করতে হবে ও যখন মাধবীকে চেনে তখন হয়তো অবনীভূষণকেও।

অবিনাশকে দেখেই পরীক্ষিৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললো, 'তোকে আমি এক মাস ধরে খুঁজছি।'

BANGLAPDF.NET

অবিনাশ ওর বিশাল চেহারাটা নিয়ে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলো। পরিষ্কার দাড়ি কামানো, ওর কপালের কাছে কাটা দাগটা জ্বলজ্বল করছে। অবিনাশকে আমি পছন্দ করি ওর স্পষ্ট চোখদুটোর জন্য, কতরকম বদমাইসী করে অবিনাশ, কিন্তু ওর চোখে কোনো গ্লানি থাকেনা। চৌরঙ্গীতে চারটে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানের সঙ্গে যখন মারামারি করেছিল—তখনও ওর চোখ যে-রকম, কোনো মেয়ের সঙ্গে যখন সর্বনাশের ভূমিকা করে তখনও চোখ একরকম।

পরীক্ষিৎ ও অবিনাশ দরজার আড়ালে গিয়ে কিছু বলাবলি করতে লাগলো। আমি ও অনিমেষ চুপ। পরীক্ষিৎ আস্তে আস্তে কি বললো, শোনা গেল্ না। অবিনাশ শান্তভাবে বললো, 'না!' পরীক্ষিৎ আবার অস্ফুট গলায় কিছু বললো, অবিনাশ পুনরায় শান্ত গলায়, 'না।' পরীক্ষিৎ ক্রুদ্ধভাবে চেঁচিয়ে বললো, 'আমি তোর সর্বনাশ করে দেবো।' অবিনাশ বললো, 'আমি তো সর্বস্বান্ত, আমার আবার সর্বনাশ কি হবে?'

অনিমেষের সঙ্গে চোখাচোখি করে আমি বললুম, 'ওদুটো কি করছে?' অনিমেষ উত্তর না দিয়ে শুধু হাসলো। আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই দুর্বোধ্য লাগছে। মনে পড়লো, কয়েকদিন আগে হেমকান্তির অসুখ দেখতে গিয়েছিলাম। হেমকান্তি হয়তো আর বাঁচবে না। সেদিনও, ঘরের মধ্যে গায়ত্রী হঠাৎ অবিনাশকে দেখে থমকে গেল। কঠিন গলায় বললো, 'আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল।' অবিনাশ আলতোভাবে ওর দিকে তাকিয়ে বললো, 'বলো, কিন্তু যত ভয়ংকর কথাই হোক, রাগ করে বলতে পারবেনা, হাসতে হাসতে বলো'। গায়ত্রী আমার দিকে তাকালো। কী অস্বাভাবিক জ্বলজ্বলে তখন গায়ত্রীর চোখ। কোনো কারণে ও খুবই রেগে আছে। অবিনাশ আমাকে বলেছিল, 'তুই একটু বাইরে যা।'

ওদের কি এমন কথা ছিল, যা আমার সামনে বলা যায় না? বন্ধুরা সবাই ক্রমশঃ দূরে চলে যাচ্ছে। এখন সবারই আপন কথা বাড়ছে।

খানিকটা বাদে অনিমেষ উঠে গেল ওদের কাছে। একটু পরে তিনজনেই ফিরে এলো ঘরে। অবিনাশের চোখ আগের মতোই অবিচলিত, পরীক্ষিতের মুখ ও চোখ লাল, অনিমেষের চোখ হলুদ। 'হলুদ চোখ'—এ কথার কি মানে হয় জানিনা—কিন্তু পরীক্ষিতের চোখ লাল দেখার পর অনিমেষের চোখ স্বাভাবিকভাবেই হলুদ মনে হলো। দুর্বোধ্যতার রঙ হলুদ। ফুলের মধ্যে যেগুলির রঙ হলুদ, সেগুলোই অপদার্থ। দুর্বোধ্যতা ফুলে মানায় না।

অবিনাশ ঠাণ্ডাভাবে পরীক্ষিতের কাঁধে হাত দিয়ে ডাকলো, 'পরীক্ষিৎ—।' সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষিৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চটাং করে এক থাপ্পড় কষালো অবিনাশের গালে। অনিমেষ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো—আমি হাততালি দেবার জন্য তৈরি হলাম। দুজনেই বেশ তেজী—মারামারি হলে জমবে ভালো। থাপ্পড় খেয়ে অবিনাশের মুখ নীল হয়ে গেল। তারপর অবিনাশ একটু হাসলো। বললো, 'এটা হয়তো আমার পাওনা ছিল। কিন্তু তোর জন্য আমার দুঃখ হয় পরীক্ষিৎ।'

'বা—তোরশান্তি,'—ইত্যাদি কিছু বলে পরীক্ষিৎ আর একটা থাপ্পর মারার জন্য রেডি হতেই আমি ওকে ধরলাম। 'কি পাগলামি করছিস? তোদের ব্যাপারটা কি?'

'কিছু না। তুই এর মধ্যে থাকিস না শেখর।'

'কেন আমি থাকবো না?'

'বলছি, তুই এর মধ্যে থাকিস না, তুই সব ব্যাপার জানিস না।'

'আচ্ছা থাকবো না, কিন্তু উল্টে অবিনাশ একখানা ঝাড়লে তোর দাঁত ক'খানা আস্ত থাকবে?'

'ওকে ছেড়ে দে, শেখর,'—অবিনাশ বললো—'যদি মারত চায় মারুক। সব আঘাতেরই যে প্রতি—আঘাত দিতে নেই, আমি এখন এইকথা শিখছি। রাগ আর ঈর্ষাই হলো পরীক্ষিতের ধর্ম। রাগ আর ঈর্ষা থেকেই পরীক্ষিৎ ওর বিখ্যাত লেখাগুলো লেখে। তা ছাড়া ও বাঁচতে পারে না। ওকে থামিয়ে লাভ কি?'

BANGLA PDF

পরীক্ষিৎকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। রেগে গেলেই পরীক্ষিৎকে সুন্দর দেখায়—তখন ওকে মনে হয় অসহায়। ওর দর্প ও অহঙ্কার কোথায় লুকোয়—করুণ মুখখানি ফুটে ওঠে। কি নিয়ে রাগারাগি তা আমি বুঝতে না পারলেও পরীক্ষিতের জন্য আমার দুঃখ হলো। যে পরীক্ষিৎ সব সময় বন্ধুত্ব কিংবা সঙ্ঘবদ্ধতার কথা বলে, হঠাৎ অবিনাশের ওপর ওর এত ক্রোধ কেন, কি জানি।

'কাল তোর সঙ্গে যখন আবার দেখা হবে পরীক্ষিৎ, আমি সব ভুলে যাবো।'—অবিনাশ আবার বললো, 'তুই সব কাজ করিস অত্যন্ত ভেবে-চিন্তে, আগে থেকে পরিকল্পনা করে। কিন্তু আমার সব ব্যবহারউদ্দেশ্যহীন,সেইজন্যেইঅনুতাপহীন।'

'এইভাবেই জীবনটা চালাবি?'

'জীবন মানে তো পঞ্চাশ কি ষাট—সত্তর বছর এই পৃথিবীতে কাটিয়ে যাওয়া? যার যে রকম ইচ্ছে, সেই সেইরকম কাটিয়ে যাবে। যতই চেষ্টা করিস্—সত্তর, আশি, বড়জোর একশো বছর বাদে চলে যেতেই হবে—আর ফেরা হবে না। পাপপুণ্য যাই হোক—চামড়া শিথিল হবেই, চোখে ছানি পড়বেই, যৌনশক্তিও হরণ করে নেবে সময়। সুতরাং এই কটা বছর আমি প্রতি মুহূর্তের ইচ্চা অনুযায়ী চলতে চাই। কেউ জুয়া খেলে সময় কাটায় কেউ কবিতা লিখে-কোনটা ভালো বা বড় কেউ জানে না—যার যেটাতে নিঃশ্বাস নেওয়ার সুবিধে। কিন্তু সাহিত্য কিংবা শিল্পের জন্য আত্মত্যাগ কিংবা নিজেকে কষ্ট দেওয়া সম্পূর্ণ বোকাদের কাণ্ড। জীবনটা নষ্ট করে অমরত্বের লোভ—মাইরি, ভাবলে হাসি চাপতে পারি না। তিরিশ বছর কেটে গেছে-আর তিরিশ কি চল্লিশ বছরের ভিসা আছে এখানে থাকার। তারপর চলে যেতেই হবে—আর ফেরা যাবে না। কিছুতেই আর এখানে ফেরা যাবে না—মৃত্যুর পর তোর বইএর আর ক'টা এডিসান হলো, কিংবা ইউনিভার্সিটিতে কি থীসিস লেখা হলো—আর ফিরে এসে দেখতে পারবি না। একটাই জীবন সেটাতে আমি প্রতি মুহূর্তে বাঁচতে চাই।'

পরীক্ষিৎ স্তম্ভিতভাবে তাকিয়ে ছিল অবিনাশের দিকে। এই দীর্ঘ বক্তৃতা ও এতক্ষণ ধরে কী করতে শুনলো। কে জানে, অবিনাশও এরকম ঠাণ্ডাভাবে তো কোনো কথা বলে না। ওদের কিছু হয়েছে। কে জানে, অবিনাশও এরকম ঠাণ্ডাভাবে তো কোনো কথা বলে না। ওদের কিছু হয়েছে বোধ হয়। অনিমেষ খুব আস্তে আস্তে বললো, 'কথাটা আপনি এমনভাবে বললেন যেন খুবই নতুন এবং নিজস্ব। তা কিন্তুনয়।'

'কিন্তু আমার জীবনটা আমার নিজস্ব। সেটা আমার মত অনুযায়ীই চলবে আশা করি। অবশ্য, যদি না হঠাৎ জেলে আটকে রাখে। আমি স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই।'

অনিমেষ একটু হাসলো। তারপর বললো, 'জেলে আটকে রাখবে কেন? অবিনাশবাবু, আপনাকে আমার খুব ভালো লাগে। আমি যদি আপনার মতন হতে পারতাম।'

'আমার মতন মানে? আমার মতন কি? আমি তো কিছুই হইনি। লেখা—ফেখা ছেড়ে দিয়েছি। বিশেষ কোনো কাজকর্মও করিনা। আমার মতন আবার হাবার কি আছে?

'তবু, আপনার এই যে হাল্কাভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা, আমার বড় ভালো লাগে। যখন যা ইচ্ছে তাই করা, জীবন সম্পর্কে আপনার কোনো ভয় নেই, ভয় নেই বলেই আপনার মুখখানা খুব সুন্দর। যখন যে কোনো মেয়েকে দেখলেই আপনার ছুঁতে ইচ্ছে করে, ভোগ করতে ইচ্ছে করে, আপনি চেষ্টাও করেন তৎক্ষণাৎ কিছু না ভেবে—জানেন, আমি এগুলো একদম পারি না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমারও এ রকম ইচ্ছে। কিন্তু পারি না।'

..শের

অবিনাশ হাসতে হাসতে বললো, 'আসুন, আপনার সঙ্গে আমার জীবনটা বদলা—বদলি করি।' ওদের

অনিমেষ ব্যগ্রভাবে বললো, 'করবেন? সত্যি যদি করা যেতো। আমি হঠাৎ বিয়ে করে জড়িয়ে গেলাম—মফঃস্বলে চাকরি। একদম ভাল লাগে না। ইচ্ছে করে কলকাতায় থেকে আপনার কাছে টেনিং নিই।'

পরীক্ষিৎ বললো, 'মেয়ে পটানো ছাড়া ও আর কি বিষয়ে টেনিং দিতে পারবে?'

অনিমেষ বললো, 'সেটাই বা মন্দ কি। একটা কিছু পাবার চেষ্টা তো বটে। আচ্ছা অবিনাশবাবু, কোনো মেয়েকে পাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলে কেমন লাগে? আমার এ অভিজ্ঞতাও নেই। আমার প্রথম যে মেয়েটির সঙ্গে পরিচয়, তাকেই বিয়ে করেছি। ও ব্যাপারটা বুঝতেই পারলুম না।'

কিছু একটা যেন বলা দরকার, এই জন্যেই আমি বললাম, 'এখনো সময় যায় নি। আফশোসের কিছু নেই।' কথাটা বলার পরই আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লুম আবার।

অনিমেষ আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কিসের সময় যায় নি?'

আমি অনিমেষের দিকে তাকিয়ে রইলুম। ও কী প্রশ্ন করছে বুঝতে পারলুম না। অনিমেষ রোগা তীক্ষ্ম মুখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখের চাহনিতে প্রশ্ন। 'কিসের সময় যায় নি?' আমিও ওকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কিসের সময় যায় নি?'

—বাঃ তুমিই তো আমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করলে?

—আমি জিজ্ঞেস করলুম, সময় গেছে কি যায়নি? তোমায়? কেন? কি মুস্কিল—অবিনাশ হা-হা করে হেসে উঠলো। বললো, 'কি রে শেখর, তুই ঘুমোচ্ছিস নাকি?'

—কেন, ঘুমোবো কেন?

—তুই আগের কথা কিছু শুনিস্ নি বুঝি?

—আগের কথা তো তোরা কিছুই বলিস নি আমাকে। যেটুকু বলেছিস, সেটুকু শুনবো না কেন? কিন্তু ও আমাকে জিজ্ঞেস করছে কেন, কিসের সময় যায় নি? সময় আবার কিসের কি? সময় কি তোর কিংবা আমার, আলুপটলের কিংবা মানুষের —এরকম হয় নাকি? আমি বলেছি, এখনো সময় যায় নি, তার আবার কিসের কি? সময় যায়নি, সময় যায়নি, ব্যাস ফুরিয়ে গেল! আমার কি চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে? সুতরাং সময় যায় নি—

অবিনাশ উদাসভাবে বললো, 'শেখরের মেজাজটা আজ খারাপ হয়েছে। চল্ কেটে পড়ি—'

সত্যিই হয়তো আমি ওদের কথা মন দিয়ে শুনছিলাম না। চোখের সামনে প্রুফ, মাথার মধ্যে ক্ষমপ্রার্থী আর পুলিশের লুকোচুরি, ঘরের মধ্যে তিনবন্ধুর বকবকানি—এসব কিছুতেই আমার মন লাগছে না, এক একবার বিদ্যুতের মতন মনে ছায়া ফেলে যাচ্ছি—একমাথা কোঁকড়া চুল শুদ্ধ মাধবীর মুখ —সেই মুখও বেশীক্ষণ থাকছে না, তারপরই মনে হচ্ছে, আমি যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, কি সুন্দর ভাবে আমার চুল আঁচড়ানো, বোধহয় ক্রিম মেখেছি—আমার মুখের চামড়া এমন চকচকে, আমার গায়ে একটু হাল্কা সিল্কের সার্ট আমি জামার হাতায় বোতাম পরাচ্ছি। এ কে? আমি, না অবনীভূষণ। 'আপনাকে অবনীভূষণের মতন দেখতে?' ওঃ! ড্যাম ইট! হ দা হেল ওয়াজ অবনীভূষণ? আমি কেন অবনীভূষণের মতন দেখতে হবো? অথবা, আমাকে দেখে কেন অবনীভূষণের কথা মনে পড়বে? আমার নিজেরই বারবার মনে পড়ছে অবনীভূষণের কথা। নিজের কথা ভাবতে পারছি না, অবনীভূষণের কথা মনে পড়ছে আমার। ড্যাম ইট! আমাকে ভুলতে হবে এসব। আমার রাত্রে ঘুম চাই। আমাকে ভুলতে হবেই এসব কথা, অর্থাৎ আমার নিজের মুখও আমায় ভুলতে হবে—মাধবী—ফাধবী সকলের কথা আমায় ভুলতে হবে। গগনেন্দ্র একটা নেশার কথা বলছিল, কালো রঙের সন্দেশ—সন্দেশের মধ্যে কি যেন মেশানো থাকে—দুটো সন্দেশ খেলেই পাঁচ ছ'ঘন্টার মত আর কিছু মনে থাকে

না। গগন খেয়ে দেখেছে—একবার গেলে হয় গগনের কাছে। পরীক্ষিৎ অবিনাশরা এখন বিদায় হলেই বাঁচি।

ওরা এখনো সেই প্রেম—ফ্রেম নিয়েই কথা বলে যাচ্ছে। এখনো বড্ড ছেলেমানুষ রয়ে গেল! যার যা ইচ্ছে কর না গিয়ে—তাই নিয়ে অত আলোচনা করার কি আছে? অনিমেষটা মহা ন্যাকার মতন তখনও অবিনাশকে জিজ্ঞেস করছে, 'বলুন না, কোনো মেয়ে প্রত্যাখ্যান করলে বুকের মধ্যে কি রকম লাগে?'

পরীক্ষিৎ বললো, 'অবিনাশ এ পর্যন্ত মেয়ের কাছে হার মানে নি। একবার যার ওপর চোখ ফেলেছে—তার আর নিস্তার নেই, শালা এমন শয়তান—'

অনিমেষ বললো, 'যাঃ, তা কখনো হতে পারে না। এত মেয়ের সঙ্গে কাণ্ড কারখানা চললে—একবার না একবার আঘাত পেতেই হবে। সব মেয়েই কি অমনি রাজী হয়ে যায়।'

পরীক্ষিৎ বললো, 'তুই অবিনাশকে চিনিস না। ওকে কোনো ভদ্দরলোকের বাড়িতে ঢুকতেই দেওয়া উচিত নয়। ও যে বাড়িতেই যাবে, সে বাড়িতে যে কোনো মেয়ে থাকলেই — সম্পর্ক যাই হোকনা।'

অনিমেষ মাথায় চুলের মধ্যে আঙুলগুলো ঢুকিয়ে চিরুনির মতো চালিয়ে বললো, 'আমি কিন্তু জানি, অন্ততঃ একটি জায়গায় অবিনাশ হেরে গিয়েছিল। একটি মেয়ে অবিনাশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজী হয় নি।'

অবিনাশ চুপ করে সিগারেট টানছিল, এবার মুখ তুলে তাকালো। আমার অধৈর্য লাগছিল, এরা গেলে বাঁচি! তবু আমি অনিমেষকে বললুম, 'অবিনাশ কোথায় ব্যর্থ হয়েছে, তা তুমি জানলে কি করে?'

অনিমেষ বললো, 'হ্যাঁ, জানি। অন্ততঃ একটি মেয়ের কাছেও যে অবিনাশ ব্যর্থ হয়েছে, আমি সে কথাজানি।'

অবিনাশ এবার বললো, 'এসব কি হচ্ছে কি? একটা কেন, আমি বহু মেয়ের কাছেই ব্যর্থ হয়েছি। বলতে গেলে আমি সব মেয়ের কাছেই ব্যর্থ হয়েছি। কারুর কাছেই আমি কিছু পাইনি। মেয়েদের দেবার কিছুনেই। সব গুজব।'

আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম, 'অবিনাশ, তুই মেয়েদের কাছে কী চেয়েছিস রে? যে ব্যর্থ হয়েছিস?'

অবিনাশ বললো, 'কী চেয়েছি, তা জানি না। তবে প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে, চেয়েছিলাম নাক, পেলাম তার বদলে নরুণ।'

—তার মানে? ঠিক ঠিক মেয়ের সঙ্গে তোর এখনো দেখা হয় নি।

—তুই যদি তেমন মেয়ের দেখা পেয়ে থাকিস্, তাহলেই ভালো। যাকগে ওসব কথা, অনিমেষবাবু, আপনি যা জানতে চাইছিলেন, তার উত্তরে শুনে রাখুন, অনেক অনেক মেয়ের কাছেই—নেহাৎ শারীরিক সম্পর্ক পাতাতে গিয়েই আমি ব্যর্থ হয়েছি। পরীক্ষিৎ যা বলছে তা বাজে কথা—আসলে, বেশীর ভাগ মেয়েই আমাকে পছন্দ করে না। কেউ কেউ একবারের বেশী দু'বার পছন্দ করে না।'

পরীক্ষিৎ ওঠে দাঁড়ালো, সোজা এগিয়ে এলো অবিনাশের সামনে, তারপর রুক্ষ গলায় বললো, 'হারামজাদা—' সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষিৎ অবিনাশের ঠিক মুখের ওপর একটা প্রবল ঘুঁষি চালালো, অবিনাশের নাকের পাশ দিয়ে গড়িয়ে এলো রক্ত, অবিনাশ উঠে দাঁড়াবার আগেই আমি আর অনিমেষ ওদের মাঝখানেদাঁড়ালুম।

BANGLADESH.NET

অবিনাশ রুমাল দিয়ে মুখ মুছলো, আমাকে বললো, 'আমার হাত ছেড়ে দে। আমি পরীক্ষিৎকে কিছু বলবো না। ওর ওপর আমার রাগ হচ্ছে না। রাস্তার একটা লোকও এ রকম করলে এতক্ষণে তার মাথা ফাটিয়ে দিতুম, কিন্তু পরীক্ষিৎটা নেহাৎ বোকা বলেই ওর ওপর আমার রাগ হচ্ছে না।'

পরীক্ষিৎ তখনো গজরাচ্ছিল—আমার খুবই অস্বাভাবিক রাগছিল পরীক্ষিতের ব্যবহার। এ রকম শিশুর মতন রাগ দেখাচ্ছে কেন? কী করেছে ওর অবিনাশ? আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'পরীক্ষিৎ, তু এমন পাগলের মতন রাগ করছিস কেন?'

পরীক্ষিৎ গর্জন করে উঠলো, 'জোচ্চোর মিথ্যুকটাকে একদিন আমি শেষ করে দেবো বলে দিচ্ছি।'

—কি মিথ্যে কথা বলেছে অবিনাশ?

—ও কেন বলেছে, ও আমাকে ব্রীজ থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল! কী ওর মতলব?

—সত্যি ও ধাক্কা দিয়ে ফেলেনি? কী রে অবিনাশ?

অবিনাশ তখনো মুখ মুছছিল, কোনো উত্তর না দিয়ে হাসলো। পরীক্ষিৎ বললো, 'মোটেই ও ধাক্কা দেয়নি, ও আমার কাছেই ছিল না। আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম!'

অনিমেষ বললো, 'আত্মহত্যার ব্যাপারটা খুব রোমান্টিক, না? আমার কিন্তু স্পষ্ট ধারণা ওটা একটাদুর্ঘটনা।'

আমি অবাক ও বিরক্ত হয়ে বললুম, 'এসব কি হচ্ছে কি গাড়লের কাণ্ড? আত্মহত্যা, ঠেলে ফেলা, দুর্ঘটনা—যাই হোক না—ব্যাপারটা তো হয়ে গেছে একবছর আগে— তাই নিয়ে এখন মারামারি করার কি আছে? পরীক্ষিৎ, তোকে যখন অবিনাশ ঠেলে ফেলে দেয়নি জানিস, তবু তুই কেন অবিনাশের ওপর রাগ করছিস? তাহলে তো ওর কোনো দোষই নেই।'

—ও বলছে কেন, ও আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে? ও মিথ্যে কথা বলছে কেন? ওর কিছু একটু মতলব আছে এ ব্যাপারে। আমি সেটা জানতে চাই।

অনিমেষ বললো, 'দু' একটা মিথ্যে কথা বলার অধিকার সবারই আছে। অবিনাশই বা কেন মাঝে মাঝে দু' একটা মিথ্যে কথা বলবে না? এতে রাগের কি আছে?'

অবিনাশ আবার হাসলো। এবার সরাসরি পরীক্ষিৎকে বললো, 'পরীক্ষিৎ, আমি কি দুটো একটা মিথ্যে কথাও বলতে পারবো না—এমন প্রতিজ্ঞা করেছিলুম নাকি তোর কাছে? তুই মাঝে দু' একটা মাত্র সত্যি কথা বলতে পারিস্, আমিই বা তাহলে ঠেলে ফেলার মিথ্যে কথাটা বলতে পারবো না কেন? মুস্কিল হচ্ছে, তোর সত্যি কথাও সবাই মিথ্যে বলে মনে করে। আসলে তুই কি বলতে চাইছিস, আমি জানি। বলেই ফেল্ না! তুই তো বলতে চাইছিস্, অনিমেষের ওখানে গিয়ে আমি ওর বউ গায়ত্রীর সঙ্গেও কিছু একটা করেছি।'

আমি চমকে উঠলুম। অবিনাশের মুখ ভাবলেশহীন। এই কথাটা আমি অন্য কোথাও শুনলে হেসে উঠতুম কিংবা একটা অশ্লীল ইয়ার্কি করতুম, কিন্তু যেহেতু আমি নিজের বাড়িতে বসে আছি এবং নিজের বাড়িতে সকলেই কিছু না কিছু সংরক্ষণশীল তাই আমি বললুম, 'ছি ছি, এসব কি বলছিস অবিনাশ? তোর মুখে কিছুই আটকায় না?'

অবিনাশ অবিচলিতভাবে বললো, 'কেন, এতে দোষের কি আছে? মুখের কথা তো। গায়ত্রী তো আর শুনছে না?'

অনিমেষও বিচলিত হয়নি। সে বললো, 'আপনি কি করে জানলেন, পরীক্ষিৎ এ কথাটাই বলতে চাইছে?'

BANGLADE.NET

অবিনাশ বললো, 'পরীক্ষিতের ব্যবহারে তাই তো স্পষ্ট বোঝায়। অনেকদিন থেকেই ও এরকম একটা কথা বলতে চাইছে।'

অনিমেষ বেশ সহাস্য মুখে বললো, 'এসব কথা নিয়ে বন্ধুবান্ধবেরা আলোচনা করে নাকি? মনে করুন, যদি ব্যাপারটা সত্যিও হয়, তাহলেই বা পরীক্ষিৎ সেটা বলার জন্য ব্যাকুল হবে কেন? আমি বুঝতে পারছি না—আপনারই বা এত মিথ্যে কথা বলার চেষ্টা কেন, আর পরীক্ষিতেরই বা সত্য প্রকাশ করার এত ব্যাকুলতা কিসের?'

অবিনাশ বললো, 'সেইটাই তো আমিও বুঝতে পারছি না। আমি মিথ্যে কথা বলি এমনিই, সখ করে, কিন্তু পরীক্ষিতের তো সত্য কথা বলার সখ কোনোদিন ছিল না।'

পরীক্ষিৎ এবার গম্ভীরভাবে বললো, 'না, ও কথা আমি বলতে চাইনি মোটেই। এসব কথা আমি কখনো ভাবিই নি। এইটাও অবিনাশের আর একটা ধাপ্পা। হঠাৎ কেন একথা বললো, কে জানে।'

আমি আর থাকতে পারলুম না। আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'গেট আউট, সববাই এক্ষুনি গেট আউট। আমার আর সহ্য হচ্ছে না। আমার মাথা ধরেছে তখন থেকে—আর তোরা এখানে বসে ইয়ার্কি মারছিস। বিদায় হ এখন, ওফ্!'

অবিনাশ বললো, 'দাঁড়া না, পরীক্ষিতের সমস্যাটার একটা মীমাংসা হয়ে যাক্। পরীক্ষিৎ কি চায় সেটা দেখাই যাক্ না। আমি যতই সরলভাবে বাঁচতে চাইছি, পরীক্ষিৎ ততই আমায় জড়াতে চাইছে কেন, কেজানে।'

আমি বললুম, 'মীমাংসা করতে হয়, ময়দানে যাও। আমার ঘরে বসে ওসব ধাঁধা—মার্কা কথাবার্তা চলবে না। আমি মরছি নিজের জ্বালায়।'

ওরা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ওদের কথা ভুলে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এলো মাধবী এবং অবনীভূষণের ব্যাপার। এগুলোও ভুলতে হবে। আমি উঠে জামাটা গায় দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম গগনেন্দ্রর খোঁজ করতে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা খুব বৃষ্টি, অনেকদিন পর বৃষ্টিতে ভিজে বেশ ভালো লাগছে, মাথার মধ্যটা পরিষ্কার, মনে হচ্ছে মাথা ধরাটাও সেরে গেছে। আর, এমন ঝরঝরে লাগছে শরীর, এই শরীর নিয়ে সন্ধ্যেবেলা আমি কী করবো? একটা কিছু করার দরকার। আর যাই করি, কোনো বন্ধু—বান্ধবেরা ছায়াও মাড়াতে চাইনা আজ। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ দু' একদিন ধরে অসহ্য লাগছে। ছায়াদির বাড়িতেও যাওয়া যাবে না, ওখানে গেলেও কারুর না কারুর সঙ্গে তো দেখা হবেই। বারীনদার ওখানে গিয়ে তাশ খেলারও সেই অসুবিধে-ওখানে তো অবিনাশ থাকবেই।

শরীরটা ছটফট করছে। কিছুক্ষণ বৃষ্টির মধ্যেই ছপছপ করে হাঁটলাম। চৌরঙ্গির রাস্তাটা কি সুন্দর দেখাচ্ছে—ঘন্টাখানেক ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, তাই পথে একজনও পথচারী নেই, আমি ছাড়া গাড়িগুলো ছুটে যাচ্ছে শুধু, আর কালো পিচঢালা রাস্তা, এই রাস্তায় আমি একা, আমার সর্বাঙ্গ ভিজে, আমি চুপচাপ করে হাঁটছি। আঃ এত ভালো লাগছে, একাকীত্ব এত সুন্দর, এমন উপভোগ্য-আগে কখনো ভাবিনি। মিথ্যে মিথ্যে কি বিশ্রী হুল্লোড়ে সময় কাটিয়েছি। এক একটা রাত অবিনাশ, তাপস, গগনেন্দ্র, পরীক্ষিতের সঙ্গে-মল্লিকা কিংবা রমলার ঘরে—ওসব কথা আর ভাবতেও ভালো লাগে না।

মাধবীকে একটা টেলিফোন করা যেতে পারে না? মাধবীকে কোনোদিন টেলিফোন করিনি, সন্ধ্যেবেলায় মাধবীকে কেমন দেখতে লাগে-তাও তো দেখিনি। ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে শুধু দুপুরবেলা। মাধবীর সঙ্গে অরুণা আর চিত্রলেখা নামে আরও দুটি মেয়ে পড়তে আসতো আমার কাছে—যতদিন ওরা তিনজন ছিল—ততদিন ওরা শুধু ছাত্রীই ছিল, কোনোদিন ওদের মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়েও দেখিনি, এমনকি কোনো মাসে টাকা দিতে দেরী করলে ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছি

পর্যন্ত। তারপর চিত্রলেখার হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেলে, অরুণার বাবা বদলি হলেন দিল্লীতে, তখন মাধবী একা, সেই একা মাধবীর দিকেই আমি প্রথম চোখ তুলে তাকালাম। মাধবী একা একা আমার কাছে আসেই বা কেন? অমন বড়লোকের মেয়ে, ইচ্ছে করলে বাড়িতেই তিনটে প্রফেসার রাখতে পারে, তবু দুপুরবেরা, একা, আমার মতো ছোকরা মাস্টারের কাছে আসে কেন? তার কারণ কি, আমাকে অবনীভূষণের মতন দেখতে সেইজন্য?

আঃ আবার অবনীভূষণ! না, আমি অবনীভূষণের কথা কিছুতেই ভাবতে চাই না।

পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে সোজা কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'একটা টেলিফোন করতে দেবেন?'

ম্যানেজারটা চিৎকার করে বললো, 'করছেন কি, করছেন কি! সারা গা দিয়ে জল পড়ছে, আমার কার্পেটটা ভিজিয়ে দিলেন যে।'

দোকানে বেশী ভিড় নেই, সত্যি কার্পেটটা অনেকখানি ভিজে গেছে, আমি একটু অপ্রতিভভাবে বললুম, 'হ্যাঁ, খুব ভিজে গেছি। একটা জরুরি টেলিফোন—'

—টেলিফোন পরে করবেন। আগে গা মুছে ফেলুন। বেয়ারা, সাব্‌কো একঠো টাওয়েল দো—।

বেয়ারা একটা ধপধপে টাওয়েল নিয়ে এলো। আমি কৃতজ্ঞতায় একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লুম। পার্কস্ট্রিটের রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার বাংলা কথা বলবে তাই—ই আশা করিনি, তার ওপর এমন সহৃদয়তা। অনায়াসে আমাকে বার করে দিতে পারতো। কিছুদিন আগে এই দোকানেই তো অবিনাশ একদিন মাড়োয়াড়ী দলের সঙ্গে হাতাহাতি করেছিল। আমিও দলে ছিলাম। ম্যানেজার আমাকে চিনতে পারে নি। আমি ওকে প্রকৃত ধন্যবাদ জানিয়ে এককাপ কফির অর্ডার দিয়ে টেলিফোন ডিরেকটারিটা নিরাম। যাঃ চলে, মাধবীর তো বাবা মারা গেছেন জানি, তা হলে টেলিফোনটা কার নামে? মাধবীর নামে নিশ্চয়ই নয়। ওর মা কিংবা বাবার নামে যদি হয়—জানার উপায় নেই। তবে ওদের বাড়ির ঠিকানা জানি। ইনফরমেশনের ডায়াল ঘুরিয়ে মাধবীদের বাড়ির ঠিকানা বলে টেলিফোন নম্বর জানতে খুব অসুবিধে হলো না।

মাধবীদের নম্বর ঘোরালাম। ওদিকে একজন পুরুষ কণ্ঠ। —বলুন?

আমি কোনো দ্বিধা না করে বললুম, 'মাধবীকে ডেকে দিন।'

লোকটি যদি জানতে চাইতো কে টেলিফোন করছে—তাহলে কি বলবো আমি ভেবেই রেখেছিলাম। কিন্তু তা জিজ্ঞেস করলো না, বললো, 'ধরুন।' তারপর ধরেই রইলাম। বহুক্ষণ, কেউ আর আসে না। কোনো সাড়া শব্দ নেই। ছেড়ে দেবো কিনা ভাবছিলাম, তখন মাধবীর গলা পেলাম, 'হ্যালো? কে?'

—মাধবী, আমি মাস্টারমশাই কথা বলছি।

মাধবী একটুক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর আচমকা জিজ্ঞেস করলো, 'কোন মাস্টারমশাই?'

তোমার ক'জন মাস্টারমশাই আছেন?

—উপস্থিত তিনজন, ছেলেবেলা থেকে হিসেব করলে দশ–বারোজন হবেন নিশ্চয়ই।

—তুমি আমাকে চিনতে পারছো না?

—উঁহু।

—আমি তো গলার আওয়াজ শুনেই তোমায় চিনতি পেরেছি।

—কিন্তু আপনার সঙ্গে তো আমি কখনো টেলিফোন কথা বলিনি, তাই চিনতে পারছি না।

—মাধবী তুমি কি করছিলে?

—সাজগোজ করছিলাম। এক্ষুনি সিনেমা দেখতে বেরুবো।

—কার সঙ্গে?

—তা আপনাকে বলবো কেন?

—ও—

আমি একটুক্ষণ চুপ করে রইলুম। আর কোনো কথা কি বলার আছে? মাধবীই প্রশ্ন করলো, 'কোনো দরকারী কাজের কথা ছিল?'

—হ্যাঁ। মাধবী, অবনীভূষণ কে?

—এইজন্য আপনি ফোন করছেন? আচ্ছা পাগল তো!

মাধবী হাসলো। জলের মধ্যে কুলকরচো করার মতন টেলিফোনে সেই হাসির আওয়াজ। আমি তবু বললুম, 'হ্যাঁ, এ কথাটা জানা আমার খুবই দরকার। অবনীভূষণকে আমি একবার চোখে দেখতে চাই। সে কোথায় আছে?'

—এক্ষুনি তা শুনতে হবে? কেন? কাল দুপুরে যাবো, তখন বলবো। এখন ছেড়ে দিচ্ছি, অ্যাঁ?

—কেন, ছেড়ে দেবে কেন? আরও কথা আছে—

—টেলিফোনে আপনি মোটেই কথা বলতে পারেন না ভালো করে। আপনার গলা কী রকম যেন অন্যরকম শোনাচ্ছে। বরং আপনি যখন চুপ করে চেয়ে বসে থাকেন,

তখন—

—তখন কি?

—কিছু না।

মাধবী লাইন কেটে দিল। আমার দীর্ঘশ্বাস পড়লো না, আঘাত পেলুম না কোনো। খানিকটা অবাক লাগলো—আমি যখন চুপ করে বসে থাকি—তখন কী হয়। তখন কী আমাকে অবনীভূষণের মতন দেখায়? সেই জন্যই কি আমার চুপ করে বসে থাকতেই আজকাল বেশী ভালো লাগে? আঃ অবিনাশের কাছে অবনীভূষণের কথাটা জিজ্ঞেস করা হলো না। আজও।

কফিটা খেয়ে বেরুলাম। তখনও বৃষ্টি পড়ছে। গাড়ি বারান্দার নীচে একটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে দাঁড়িয়ে। মেয়েটা চোখের পাতায় বোধহয় সবুজ রং মেখেছে। তাই ওর চোখের দিকে আমি দু'বার তাকালাম। মেয়েটিও আমার চোখের দিকে সোজা তাকালো। আমি তো আর চোখে রং মাখিনি, তবে আমার দিকে ও তাকাচ্ছে কেন? সেইটাই জানার জন্য, আমি ওর দিকে আবার তাকালাম। মেয়েটি এবার আমার দিকে একটু এগিয়ে এলো, একটা ঝলমলে সোনালি রঙের গাউন পরেছে। চুলের রং ও কিছুটা সোনালি ওর, কিন্তু চেহারা রোগাটে। মেয়েটা বললো, 'হ্যালো, মিস্টার!'

আমি বললুম, 'কী?'

—স্যাডার স্ট্রীটটা কোনদিকে বলতে পারো?

আমি একটু হাসলুম। উত্তর দিলুম, 'এই বৃষ্টিতে পার্ক স্ট্রীটে এসে একা দাঁড়িয়ে আছো, আর স্যাডার স্ট্রীট চেনো না?'

মেয়েটি আমার সঙ্গে হাঁটছিল, সেও হেসে বললো, 'আমি চিনি। দেখছিলুম তুমি চেনো কিনা।'

—স্যাডার স্ট্রীটে তোমার ঘর আছে?

—না, হোটেল রুম, দশটাকা প্রতি ঘন্টা।

—আর তোমার?

BANGLADE.NET

—তিরিশ টাকা, যদি একঘন্টা থাকো।

—তিরিশ আর দশ চল্লিশ, একঘন্টা তোমার সাহচর্যের জন্য? বড় বেশী নয় কি?

—ডোন্ট বী মীন।

—তোমার শরীরের জন্য চল্লিশ টাকা, আর আমারও তো শরীর আছে, তার কোনো দাম নেই? তার জন্য তোমারও কিছু দেয়া উচিত। তুমি আমাকে কত দেবে, বলো?

—আই উইস, আই কুড। কিন্তু তুমি তো জানো—

—শুধু শুধু সময় নষ্ট করলে। আমার কাছে তোমার কোনো সুবিধে হবে না।

—কেন? তোমার কাছে টাকা কম আছে? কত আছে?

—টাকার জন্য নয়। আমার ভালো লাগেনা।

—ইয়ংম্যান, আজ এই রকম লাভলি ওয়েদার, ডোঞ্চয়ু নীড আ কমপ্যানিয়ন?

—কিন্তু তোমার কমপ্যানি আমার ভালো লাগবে না।

—কেন, আমি কি দেখতে খারাপ?

—না, তা নয়। তোমাদের আর আমার ভালো লাগে না। আই অ্যাম ইন লাভ।

—ইন লাভ? উইথ আ বেঙ্গলি গার্ল? ডাজ সি লাভ য়ু টু?

—ঠিক জানি না। আচ্ছা, আমার কি করা উচিত বলো তো? আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসি, কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসে কিনা জানি না। এখন আমি কি করবো?

মেয়েটি হাঁটতে হাঁটতে আমার সঙ্গে চৌরঙ্গির মোড় পর্যন্ত এসেছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে খুবই চিন্তিত ভঙ্গি করে বললো, 'দেযার আর সেভরাল ওয়েজ। আচ্ছা, মেয়েটি তোমাকে চেনে তো? তার বাড়ি কি খুব কনজারভেটিব?

—না। মেয়েটি আমাকে চেনে।

—মেয়েটিকে খুব সুন্দর দেখতে ? খুব সুইট লুকিং?

—প্রায়!

—আচ্ছা, ওকে একদিন আলাদা তোমার সঙ্গে ডিনারের নেমন্তন্ন করো না—

আমি হঠাৎ হাসতে লাগলাম। বেশ জোরে হাসি বেরিয়ে গেল। মেয়েটি একটু আহতভাবে বললো, 'হোয়াটস্ ফানি ইন ইট?—তোমার সঙ্গে আমার ভালোবাসার কথা আলোচনা করছি। এটা ফানি নয়?

—কেন, আমরা স্ট্রীট গার্ল বলে কি আমরা ভালোবাসা সম্পর্কে কিছু জানি না? জানো আমিও—

—প্লীজ, আমাকে ওসব গল্প শুনিও না। আমি ওগুলো সব জানি।

—তুমি আমাকে বিশ্বাস করছো না? আমিও—

—বিশ্বাস করছি, কিন্তু গল্পটা শুনতে চাই না। ওসব গল্প একরকম।

মেয়েটি আহত, অপমানিত মুখে চুপ করে যায়। আমার সঙ্গে একটু বৃষ্টিতে ভিজে ওর মুখের চেহারা আরও করুণ হয়ে এসেছে। তখন আর কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হবার আশা নেই। মেয়েটি শেষ চেষ্টা হিসেবে বলে, 'চলো না, কাছেই তো আমার হোটেল—একটুক্ষণ গিয়ে বসবে, আর কিছু না, জাস্ট লাইক ফ্রেন্ডস, সেখানে আমরা তোমার প্রব্লেম নিয়ে আলোচনা করবো? প্লীজ—'

—আমার কোনো প্রব্লেম নেই। তোমাকে মিথ্যে কথা বলছিলুম। আসলে আমি জানি, আমি যে মেয়েটিকে ভালোবাসি, সে অন্য একটি ছেলেকে ভালোবাসে।

—স্যাড। কিন্তু, এ নিয়ে তোমার বেশীদিন দুঃখ করার কোনো মানে হয় না।

—নাঃ বেশীদিন করবো না।

—তোমার নাম জানতে পারি? আমার নাম মার্থা হে, এম সি হোটেলে থাকি।

—আমার নাম অবনীভূষণ রায়। আমার দুঃখ কেটে গেলে তোমার সঙ্গে এসে দেখা করবো।

পরদিন দুপুরে মাধবী এলো না, এরপর এক সপ্তাহের মধ্যে আর এলো না, কোনো খবরও পাঠালো না। মাধবী না আসায় এক হিসেবে আমি খুশীই হয়েছি। হঠাৎ বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম কাল সন্ধ্যে থেকে, মাধবীর সামনেও হয়তো উত্তেজনা প্রকাশ করে ফেলতুম। হয়তো মাধবীকে বলে ফেলতুম, তোমাকে আমি ভালোবাসি। ও কথা বললে খুবই খারাপ হতো, ও কথা বলা যায় না, মাধবীকে এখনো বলা যায় না। আসলে মাধবীকে আমি ভলোবাসি কিনা সত্যিই তো জানি না। মাধবীর সামনে শুধু একা বসে থাকতে ইচ্ছে হয়–এর নাম কি ভালোবাসা? না, এখনই ভালোবাসার কথা বলা যায় না। তার আগে, অবনীভূষণের সমস্যা আমাকে দূর করতে হবে।

মাধবী আসেনি, কিন্তু আমি জানি মাধবীর সঙ্গে আমার আবর দেখা হবেই। আমি যা চাই, তা চিরকালই পেয়ে থাকি। যা পাবো না কখনো–তা আমি আগে থেকেই জানতে পারি, তা পেতেও চাইনা আমি। চেয়ে ব্যর্থ হওয়া আমার স্বভাব নয়। সূর্যকে যে আমার ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখিনি, তার কারণ, আমি কখনো তা চাইনি বলে। যেদিন আমি চাইবো—সেদিন শালা সূর্যকেও আমার ঘরে আসতে হবে। আপাততঃ, আমি মাধবীকে চাই কিনা ভাবিনি, ওর ভালোবাসা চাই কিনা ভাবিনি, আমি ওকে দেখতে চাই—জানি ওর সঙ্গে দেখা হবেই। অবনীভূষণকেও ঠিক আমি দেখতে চাই কিনা জানি না, হঠাৎ অবনীভূষণকে দেখলে আমার কি অবস্থা হবে তাও বুঝতে পারছি না। আমার মুখোমুখি যদি ঠিক আমারই মতো দেখতে আরেকজন মানুষ দাঁড়ায়, তবে সে দৃশ্য তো ভয়াবহ। হয়তো ওকে আমার মতো দেখতে নয়, কোনো একটা ভঙ্গি বা মুখের রেখা, কিংবা অভ্যেসের মিল আছে—আর কিছু না। অবনীভূষণ বেঁচে আছে কিনা, তাও জানতে হবে। অবিনাশের কাছে কিছুই জানা গেল না। এর মধ্যে অবিনাশের সঙ্গে একদিন দেখা হল। কী ভয়ংকর চেহারা সেদিন অবিনাশের। কোথাকার কোন্ পার্টি থেকে ফিরছিল, সঙ্গে দু'জন অচেনা লোক–ওর দু'হাত ধরে আছে, ধর্মতলায় অবিনাশের সঙ্গে আমার রাত সাড়ে দশটায় দেখা–অবিনাশ তখনও বদ্ধ মাতাল। চোখ দুটো টকটকে লাল, মাথার চুল হাতের মুঠোয়, অসম্ভব করুণ মুখখানা। যেন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর, অবিনাশ 'আঃ আঃ' করে আওয়াজ করছিল, আর্তনাদের মতন, অথচ তখন ওর বেশ জ্ঞান আছে। আমাকে দেখে অবিনাশ জড়িয়ে ধরলো, বললো, 'শেখর, আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে রে—'

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'বেশী খেয়ে ফেলেছিস?'

ও বললো, 'না, না, বেশী খাইনি! আমার বুকের মধ্যে কষ্ট হচ্ছে।'

—কিসের কষ্ট?

–তা জানিনা। আঃ, আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে রে। বেশী মদ খেয়েছি তো, তাই কষ্টের কথা বলতে পারছি, অন্য সময় তো বলতে পারি না!

—কেন, কষ্ট হচ্ছে কেন?

—তাই তো জানি না। দ্যাখ শেখর, আমি বারবার সরল জীবনে ফিরে যাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না। সেইজন্যই কি আমার কষ্ট হচ্ছে? কী জানি! চল্, তুই একটু খাবি!

—না!

—তুই আজকাল আর খেতে চাস না কেন রে?

—আমার আর ভালো লাগে না।

BANGLA PDF.NET

—তোর তো কোনো কষ্ট নেই, তুই আর খাবি না কেন?

—তুই কি কষ্টের জন্য মদ খাস্ নাকি? দেবদাস হচ্ছিস?

—উঁ হুঁ, ওসব মেয়েছেলের জন্য কষ্ট নয়, অন্যরকম, ওঃ"

অবিনাশকে এ রকম কাতর কখনো দেখিনি। অবিনাশ আরও মদ খাবার জন্য পেড়াপিড়ি করে। আমি ওর হাত ছাড়িয়ে চলে যাবো করেই, হঠাৎ সেই কথাটা মনে পড়লো। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই মাধবী সান্যালকে চিনিস? অবিনাশ বললো, 'কে মাধবী? তোর কাছে যে মেয়েটা পড়তে আসে। হ্যাঁ, খুব ফাইন মেয়ে, একটু মোটার ধাঁচ, কিন্তু বুক দুটো কি চমৎকার।'

—ওসব বাজে কথা রাখ্। তুই ওর বন্ধু অবনীভূষণ বলে কারুকে চিনিস্?

—অবনীভূষণ? টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতে আবার এ রকম নাম হয় নাকি? কেন? তাকে চিনে কি হবে?

—না, এমনিই। মাধবী প্রায়ই বলে, আমাকে নাকি অবনীভূষণের মতন দেখতে—

—তাই বলে নাকি? আশ্চর্য তো! সত্যিই তো, তোকে অবিকল অবনীভূষণের মতনই তো দেখতে! মাইরী শেখর, বিশ্বাস কর, অবিকল, হুবহু অবনীভূষণের মতনই তোকে —হ্যাঁ–হ্যাঁ—হ্যাঁ—

মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে অবিনাশ গলা ফাটিয়ে মাতালের হাসি হাসতে থাকে। আমি ওর হাত ছাড়িয়ে সোজা চলে এসেছিলাম সেদিন।

কদিন থেকেই ছায়াদির অসুখ শুনছিলাম–অকেকদিন ওদের বাড়িতে যাইনি। কলেজের ছুটিও ফুরিয়ে এলো, আর ছুটি নেওয়া যাবে না। কলেজটা ছাড়তে হবে এবার, সকালবেলা গিয়ে পড়ানো, আমার দ্বারা আর সম্ভব হবে না। কোনোদিন রাত্রে ভালো ঘুম হয় না, সকালবেলা দশটার মধ্যেই ঘুম থেকে উঠে তাড়াহুড়ো করে কলেজে ছুটতে একেবারেই ইচ্ছে করে না।

সকালে চা খেয়েই একবার ছায়াদির বাড়িতে ঘুরে এলাম। গায়ত্রী বারান্দায় রোদ্দুরে বসে ছেলেকে অলিভ অয়েল মাখাচ্ছিল। অনিমেষরা তা হলে এখনো যায়নি। একটা হলদে রঙের শাড়ী পরে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে গায়ত্রী ছেলেকে তেল মাখাচ্ছে–বেশ দেখাচ্ছে ওকে—মহিমাময়ী মাতৃমূর্তি। গায়ত্রী আমাকে দেখে বললো, 'অনেকদিন আপনাকে দেখিনি। একটু রোগা হয়ে গেছেন!'

আমি বললুম, 'আপনিও তো অনেক রোগা হয়ে গেছেন!' গায়ত্রী লজ্জিত ভাবে হাসলো। অয়েল ক্লথের ওপর শুয়ে ছেলেটা খলখল্ করে হাসছিল। সেদিকে তাকিয়ে আমি আলগা ভাবে বললুম, 'ভারী সুন্দর দেখতে হয়েছে আপনার ছেলেকে!' গায়ত্রী এবারও হেসে ছেলেকে বুকে তুলে নিল। কথাটা আমি এমনিই বলতে হয় বলেই বলেছি। ঐটুকু একটা বাচ্চা, নাক–চোখ কিছুই ভালো করে ফোটেনি–ওকে আবার দেখতে সুন্দর আর কুৎসিত কি? যখন বড় হবে–পৃথিবীতে নিজের জায়গা করে নিতে পারবে–তখনই বুঝবো, বাছা মুখের ওপর সুন্দরকে রাখতে পারে, না মুখখানা ভূতের মতন বানিয়ে তুলবে। ছেলেকে বুকে তোলার পর গায়ত্রীকে একেবারে ছবির মাতৃমূর্তির মতন সুন্দর দেখাচ্ছে—হঠাৎ মনে হলো, মা হবার পরেও সেই মেয়ের সঙ্গে পুরুষরা এক বিছানায় শোয় কি করে? দেখলেই তো ভক্তি আসে—তখন আর ওসব ব্যাপার, যাক্‌গে, এ তো আর আমার সমস্যা নয়। গায়ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'অনিমেষ কোথায়?' ও বললো, 'অনিমেষ একটু বেরিয়েছে।'

সাদা চাদর ঢাকা দিয়ে ছায়াদি শুয়েছিল। ছায়াদির মুখের ভাব এমন–যেন কোনো গুরুতর অসুখ হয়েছে। আসলে ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়তো—। শীর্ণ হেসে হাত বাড়িয়ে ছায়াদি বললো, 'এসো শেখর, বসো। না না, বিছানায় বসো না–ঐ চেয়ার টা টেনে নাও।'

'কেন, বিছানায় বসবো না কেন?'

'এসব অসুখ বড় ছোঁয়াচে—'

আমি একটু হেসে বিছানাতেই ছায়াদির পায়ের দিকে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছো, ছায়াদি?'

অপ্রত্যাশিত ভাবে ছায়াদি উত্তর দিল, 'ভালো আছি। খুব ভালো আছি এখন। খুব ভালো লাগছে।'

'জ্বর ছেড়ে গেছে?'

'না সকালেই আবার জ্বর এসেছে। সেইজন্যেই ভালো লাগছে। অসুখ হলেই আমার ভালো লাগে। অন্য সময় কী রকম যেন ঠিক বুঝতে পারিনা—।'

চাদরের বাইরে ছায়াদির পা বেরিয়েছিল। আমি একটা হাত ছায়াদির পায়ে বোলাতে লাগলাম। বরফের মতন ঠাণ্ডা পা। জ্বর—টর কিছু নেই। তবু ছায়াদি কেন বললো, একটু আগেই ওর জ্বর এসেছে? কেন যে লোকে অকারণে মিথ্যে কথা বলে! আমি হাতটা সরিয়ে নিলাম। ছায়াদি হঠাৎ হাসতে লাগলো। বললো, 'চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যাকে খুঁজছো, সে নেই!'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কে নেই? কাকে খুঁজছি আমি।'

ছায়াদি সেই রকমই মুখ টিপে হেসে বললো, 'মায়া পরশুদিন মামার বাড়িতে গেছে।'

'আমি মায়াকে খুঁজবো কেন?'

'সবাই তো আজকাল এ বাড়িতে এসে মায়াকেই খোঁজে। আমি বুড়ি হয়ে গেছি, আমাকে দেখতে বিচ্ছিরি—আমার সঙ্গে আর কে কথা বলতে চায় বলো! মায়া কিন্তু তোমাদের কাউকে পাত্তা দিতে চায় না। লেখক—টেখকদের সে একদম পছন্দ করে না।'

'শুনে সত্যিই খুব দু'ঃখিত হলুম।'

'আমার অসুখ শুনেই তবু যা হোক এলে। তাই তো বললুম, অসুখ হলেই আমি ভালো থাকি। তাপস তো অসুখ শুনেও একদিনও এলো না।'

'কি ব্যাপার, তাপসের নামে যেন গলাটা ছলছল করে উঠলো?'

'মোটেই না। তাপসকে আমি মোটেই গ্রাহ্য করি না। সেও অবশ্য আমার কথা কখনো ভাবে না।'

'বিমলেন্দু আসে?'

'রোজ। সে তোমাদের মতন অমন দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলে নয়—'

ছায়াদির মুখে তাপসের নাম শুনেই মনে পড়লো, অনেকদিন আমারও তাপসের সঙ্গে দেখা হয়নি। আজ দেখা করলে মন্দ হয় না। উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, 'ছায়াদি আমি তাপসের কাছেই যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে দেখা করতে বলবো নাকি?'

'না না।'

তাপসের মেসে দেখি, তাপস জামা কাপড় নিয়ে হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়েছে। ওর রুমমেট রামহরিবাবুর একটা প্যান্ট গলিয়ে ও কিছুতেই সেটা ম্যানেজ করতে পারছে না। রামহরিবাবুর কোমর বিষম মোটা, আর তাপসের কোমর—না খেয়ে খেয়ে —মেয়েদের মতন সরু। রামহরিবাবুর প্যান্ট ওর লাগে কখনো? যে জামাটা তাপস গায় দিয়েছে, সেটারও পুট নেমে এসেছে প্রায় কোমর পর্যন্ত। তাপসের বিব্রত মুখের দিকে তাকিয়ে আমি হেসে ফেললুম। বললুম 'কী ব্যাপার? কোথায় জয়যাত্রায় যাচ্ছিস?'

BANGLADE.NET

বিরক্তমুখে তাপস বললো, 'রেডিওতে একটা চাকরির ইন্টারভিউ পেয়েছি। চিঠিটা আজই সকালবেলা এসেছে, আজই সাড়ে বারোটার সময় ইন্টারভিউ এর কোনো মানে হয়? একটাও ফর্সা জামা কাপড় নেই আমার।'

রামহরিবাবু এমন কাচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছেন যেন ওঁরজামাপ্যান্ট তাপসের না—লাগলে তাঁরই দোষ। আহা, লোকটি বড় ভালো। আমি তাপসকে বললুম ' যাঃ ঐরকম হাস্যকর পোশাক পরে কেউ ইন্টারভিউতে যায়? নিজের যা আছে, তাই—ই পরে যা।'

'নিজের কি আছে? কচু আছে? এক পেয়ার লন্ড্রিতে দিয়েছি—আর ঐ তো যেটা কাল পরেছিলাম।'

সেটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম খাটের পাশে ওর প্যান্টটা তালগোল পাকানো অবস্থায় পড়ে আছে, সেটা ভর্তি যে দাগ, তা মাংসের ঝোলের কিংবা বমির। বললুম, 'জামা কাপড় লন্ড্রিতে পাঠাস কেন? বাড়িতে কাচতে পারিস না?'

তাপস খেঁকিয়ে উঠলো, 'যাঃ যাঃ ফৌপোর দালালি করতে হবে না।'

'তা বলে ঐ পাঁচটা সেফটিপিন লাগানো প্যান্ট পরে ইন্টারভিউ দিতে যাবি!'

'তা হলে কি করবো?'

'যাবার দরকার কি ইন্টারভিউ দিতে? ও চাকরি তো পাবিই না। আজ ইন্টারভিউ, আজই সকালে যদি চিঠি আসে তার মানে বুঝিস না? ও চাকরি তোর হবে না।'

'হবে না মানে? চালাকি বার করে দেবো। তোরা শালারা প্রফেসারি ট্রফেসারি জুটিয়ে খুব হেরফের দেখাচ্ছিস। এবার দ্যাখ—আমিও রেডিওর চাকরি পাচ্ছি—একবার রেডিওর মাইকটা হাতে আসুক—সারা দেশে বিপ্লব ডেকে আনবো। আমার যা কিছু কথা আছে— রেডিওতে একদিন ঘোষাণা করে দেবো।'

আমার পরনের প্যান্টটা কিছুটা পরিষ্কার ছিল, সেই টাই তাপসকে আমি খুলে দিলাম। তাপসের মোটামুটি লেগে গেল। বাধ্য হয়ে তাপসের বমি মাখানো প্যান্টটাই আমাকে পরতে হলো। গা ঘিন ঘিন করছে আমার—

তাপস ব্যস্ত হয়ে পাগলের মতন ছোটাছুটি করছে ঘরের মধ্যে আর বেশী সময় নেই, ঠিক পৌছতে পারবে কিনা সন্দেহ।

তাপসের খুবই দেরী হয়ে গেছে, ঠিক সময় পৌছুতে গেলে ওর বোধ হয় ট্যাক্সি করে যাওয়া দরকার। কিন্তু সে কথা ওকে বলতে আমার সাহস হলো না। তা হলে নিশ্চয়ই আমার কাছেই ট্যাক্সি ভাড়া চাইবে। একেবারে জাত ভিখিরি তো, টাকা চাইতে একটুও লজ্জা নেই। নেহাৎ বাধ্য হয়েই ওকে আমার জামা—প্যান্টটা খুলে দিতে হলো। ওর বিকট ময়লা, বমির দাগধরা জামা—প্যান্ট পরে এখন আমার মনে হচ্ছে, তাপসের এখানে আজ না এলেই কত ভালো হতো। কেন যে মরতে এখানে এলাম।

তাপসকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোর খাওয়া হয়ে গেছে তো?'

জুতোয় ফিতে বাঁধছিল তাপস, বললো, 'না,—'

'তাহলে এখন আর তো সময় নেই—'

'দুপুরে কিছু খেয়ে নেবো।'

'তা হলে আজ আর কিছু খাওয়া হলো না তোর। এসব ইন্টারভিউ—এর ব্যাপার তো জানিস না। ঘন্টা–চার–পাঁচ বাইরে ঠায় বসিয়ে রাখবে—'

'তা হলে খাবো না। একেবারে চাকরিটা পাবার পর খাবো। তখন দেখিস কী রকম খাই। জানিস শালা, আমারও খুব শখ তোদের মতন সকালে চায়ের সঙ্গে রোজ ডিম আর মাখন টোস্ট খাওয়ার। আমারও ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে ভাতের বদলে স্যান্ডউইচ খেতে। দ্যাখনা, একবার চাকরিটা পাই—'

আমি হাসতে হাসতে বললুম, 'এখন চল্, দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

একটুও কৃতজ্ঞতা বোধ নেই তাপসের। আমার জামা প্যান্ট পরার পর ওর চেহারাটা মোটামুটি ভদ্রই দেখাচ্ছিল। চুল আঁচড়ানো শেষ করার পর অকস্মাৎ ও আমার দিকে তাকিয়ে অসভ্যের মতন হ্যা-হ্যা করে হাসতে লাগলো। বললো, ' তোকে কি বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে, শেখর!'

আমি রেগে গিয়ে বললুম, 'তা তো দেখাবেই-ভিখিরির পোশাক পরলে তাই দেখাবে না?'

'সত্যি মাইরী, তোর মতন সৌখিন ছেলে, সব সময় ফিটফাট থাকিস্—তোকে এ রকম পোশাকে কখনো দেখিনি-একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে।'

আমার আবার নতুন করে গা ঘিন ঘিন করতে লাগলো। বিরক্ত হয়ে বললুম, 'তোদের যা কাণ্ড। তুই তো ইন্টারভিউতে যাচ্ছিস —আমি এখন কী করে বাড়ী যাই?'

'তুই এখানে বসে থাক্ না। আমি ফিরে এলে—'

'তোর এই বিচ্ছিরি ঘরে আমি ততক্ষণ বসে থাকবো?'

'তা হলে ট্যাক্সি করে বাড়ি চলে যা—'

কী অনায়াস ভাবে তাপস বললো। ও যাচ্ছে ইন্টারভিউ দিতে, তার জন্য আমায় ট্যাক্সি ভাড়া খরচ করতে হবে? একটুও ওর লজ্জা নেই পর্যন্ত। তাপসের সঙ্গে আমিও বেরিয়ে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একটু কৈফিয়তের সুরে তাপস বললো, 'জামাটা তো কাল নষ্ট হলো পরীক্ষিতের জন্যে —এমন গায় বমি করে দিলো কাল!'

'কোথায়? রোজ রোজ এত —'

'কে জানে কোথায়? আমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা, তখন লটপট করছে—'

'থাক, ওসব আর আমি শুনতে চাই না।'

'শোনারও কিছু নেই। সেই তো একঘেয়ে ব্যাপার-কত নম্বর বাসে উঠবো বলতো? তিন নম্বর, তিন নম্বরই অনেকটা কাছাকাছি যাবে—'

ওই সময় ট্যাক্সি পাওয়াও অসম্ভব। সুতরাং তাপসকে ট্যাক্সি চড়ে যেতে বললেও কোনো লাভ হতো না, এমন কি আমি ভাড়া দিয়ে দিলেও না। ওর সঙ্গে বাস স্টপে এসে দাঁড়ালুম। মনে হলো রাস্তার সব লোক যেন আমার পোশাকের দিকে তাকাচ্ছে আর অবাক হয়ে যাচ্ছে। বাসে ওঠার আগে তাপস বলে গেল, 'তুই আমার জামা-প্যান্টটা কাচিয়ে রাখিস। আমি তোর এগুলো এখন তিন চার দিন পরবো।'

তাপসের বাস চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা খালি ট্যাক্সি চোখে পড়লো। আমি ট্যাক্সিটা ডাকলুম, একবার মনে হলো, বাসের পরের স্টপে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি ছুটিয়ে গিয়ে তাপসকে ডেকে নামানো যায়, তারপর ওকে রেডিও স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসাই আমার উচিত। কিন্তু সে ইচ্ছেও বদলে গেল। ভাবলুম, এতবেশী বন্ধুত্ব দেখাবার কোনো দরকার নেই। জামা—প্যান্ট খুলে দিয়েছি তাই যথেষ্ট, আর কি চাই? এখন বন্ধু-বান্ধবদের থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতেই আমার মন চাইছে।

BANGLAPDF.NET

ট্যাক্সি নিয়ে সোজা বাড়িতেই চলে এলাম। আমার বাড়ির সামনে একটা সাদা রঙের গাড়ি। গাড়িটা দেখেই বুকটা কেঁপে উঠলো। এ আমার চেনা গাড়ি। বাইরের ঘরে মাধবী বসে আছে। হাল্কা গোলাপী রঙের শাড়ী পরা, মাথার চুল সব খোলা, পিঠ ভর্তি ওর কোঁকড়া চুল। মাধবীকে দেখে হঠাৎ আমার বুক অভিমানে ভরে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি এ কদিন আসো নি কেন?'

আমাকে দেখেই মাধবী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আমার সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে গেল। চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় ও প্রশ্ন, কিন্তু সে সব কিছু বললো না, বললো, 'হ্যাঁ, আসা হয়নি।'

বনেদি ঘরের মেয়ে তো, মনে এলেও সব কথা মুখে বলে না। পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে এ ধরনের প্রশ্ন তো করবেই না। সকালের দিকেই আমার এ ধরনের পোশাক দেখলে— যে কারুরই মনে হবে— আমি সারারাত বাড়ির বাইরে কোথাও বেলেল্লা সেরে এখন ফিরছি। কিন্তু মাধবীর সামনে চায়ের কাপ ও খাবারের প্লেট, অর্থাৎ বাড়ির কেউ নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে দেখা করে বলেছে যে আমি সকালেই বেরিয়েছি। কিন্তু এই রকম পোশাক পরে তো আমি বেরুতে পারি না, এবং এই সাত সকালেই কি আমি বেরিয়ে মদ গিলে বমি-টমি সেরে ফেলেছি? কিংবা অন্য কোনো অসুখে বমি—যে-কারুরই এ সম্পর্কে কৌতূহল হয়, যে— কেউ আমাকে দেখলে বলতো, কি ব্যাপার? জামায় ওকি?— কিন্তু মাধাবী তা বলবে না কিছুতেই, মাধবী বারবার আমার পোশাকের দিকে তাকালো, নির্লিপ্ত গলায় বললো, 'হ্যাঁ, আসা হয়নি।'

আমি ফের বললুম, 'তুমি এ কদিন আসোনি কেন?'

মাধবী বললো, 'আসিনি। আমি আর আসতেও পারবো না।'

শুনে আমার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো। মাধবী আর আসবে না? কেন? ওর বিয়ে হয়ে যাবে? কার সঙ্গে, সেই অবনীভূষণের সঙ্গে? না। তা হতেই পারে না—। কিন্তু মাধবীকে আমি কোনো প্রশ্ন করতে পারলুম না। মাধবীকে তো আমি এ পর্যন্ত অন্য কোনো কথাই বলিনি-যা বলেছি সবই আমার মনে মনে। অবনীভূষণ কে? এ কথাও মাধবীকে এ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতে পারিনি। অধ্যাপক—ছাত্রী ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক তো মাধবীর সঙ্গে আমার হয়নি।

কণ্ঠস্বর যেন বিচলিত না হয়—এই জন্য আমি সিগারেট ধরিয়ে মুখের ভঙ্গি যথাসম্ভব নির্বিকার রেখে বললুম, 'এ কথাই বলতে তুমি এসেছিলে?'

'হ্যাঁ'

'তুমি পড়াশুনো ছেড়ে দিচ্ছ?'

'না'

সংক্ষিপ্ততম এক অক্ষরের উত্তর মাধবী যেন চাইছে আমি ওকে খোলাখুলি প্রশ্ন করি। নইলে ও কিছুই বলবে না। কিন্তু এ কথাও বুঝতে পারলুম, মাধবী পড়াশুনা ছাড়বে না, কিন্তু আমার বাড়ীতে এসে আর পড়বে না—এর একটাই মানে হয়, প্রাইভেট টিউটর হিসাবে আমাকে বরখাস্ত করছে। বরখাস্ত করছে কোনো কারণ না দেখিয়ে, এক কথায়। এরপর আর আমার কোনো কথা বলা চলে না। এরপর, অন্য যে কোনো কথা বলার মানেই হলো—আমি চাকরি হারাবার জন্য দুঃখিত হয়েছি। মাধবী আমাকে আড়াই শো টাকা মাইনে দিতো— সোজা কথা নয়। এখন যদি বলি, মাধবী, তোমাকে না দেখলে আমার খুব কষ্ট হবে-তা হলে, সেকথার সবাই মানে করবে, প্রতিমাসে আড়াই শো টাকা হারাবার কষ্ট। যদি ওকে এখন প্রেম জানাতে চাই-তা হলে সেটারও মানে হবে ও যেন আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত

BANGLAPDF.NET

না করে, সেই চেষ্টা করছি। কেন মাধবীকে আগে থাকতেই ভালোবাসার কথা বলে রাখিনি? এখন আর উপায় নেই। সুতরাং মাধবীকে আমি বিদায় দেবার ভঙ্গি করে বললুম, 'আচ্ছা—মন দিয়ে পড়াশুনো করো, সন তারিখ তোমার প্রায়ই ভুল হয়, ওটা লক্ষ্য রেখো।'

মাধবী তবু না গিয়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর বললো, 'আমি এখানে আসতে পারবো না। আপনি বাড়িতে এসে পড়াতে পারবেন?'

এখানে প্রশ্ন করা উচিত, কাদের বাড়িতে? ওর যদি বিয়ে হয় এবং তখনও পড়তে চায়—তখন কোন্ বাড়িতে? বিয়ের পরও কি ও নিজের বাড়িতেই থাকবে—না, অন্য বাড়িতে? কিন্তু আমি ওকে কোনো প্রশ্ন করবো না ঠিক করেছি, কিছু জানাবো না, তা হলেই তার অন্য মানে হবে। সুতরাং, আমি বললুম, 'না, অন্য কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

আমাদের বাড়িতে আসতে পারবেন না? সপ্তাহে অন্ততঃ দু'দিন।'

'না।'

'কেন?'

'এমনিই। আমার ভালো লাগবে কিনা বুঝতে পারছি না।'

'হ্যা, আপনার ভালো লাগবে। আসবেন?'

এবার মাধবী ওর নির্লিপ্ততার আবরণ একটু সরিয়েছে। একটু যেন জোর দিয়ে কথা বলতে চাইছে। তবু আমি বললুম, 'আচ্ছা, ভেবে দেখি। পরে তোমাকে জানাবো—'

মাধবী দরজার কাছে পৌঁছেছিল, ওকে বিদায় দেবার জন্য আমি এগিয়ে এলাম। এবং একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে, আগের মুহূর্তেও ভাবিনি, মুখ ফসকে আমার মুখ দিয়ে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে গেল, 'মাধবী, অবনীভূষণ কে?'

মাধবী ফিরে দাঁড়ালো। একমুখ হাসিতে ওর মুখটা ঝলমলে হয়ে উঠলো। হাসতে হাসতেই বললো, 'অবনীভূষণের কথা আপনাকে পেয়ে বসেছে দেখছি। এত ভাবছেন কেন?'

'অবনীভূষণ কে?'

'কেউ না, একজন মানুষ অবনীভূষণ সেনগুপ্ত। আপনাকে দেখে তার কথা মনে পড়েছিল আমার। আপনি অনেকটা তার মতো—'

'আজ, এই পোশাকেও কি আমাকে অবনীভূষণের মতো দেখাচ্ছে?'

'হ্যা। আজও আপনাকে প্রথম দেখেই তার কথা মনে পড়েছিল।'

'মনে পড়েছিল মানে? সে এখন কোথায়?'

'সে—কথা আজ বলবো না।'

'আজ নয়, তবে আর কবে বলবে?'

'আবার যখন দেখা হবে। আবার কবে দেখা হবে তা তো আপনার ওপরেই নির্ভর করছে। আজ যাই।'

'মাধবী আর একটু বসো। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলবো।'

'আজ নয়। আজ বাড়ি থেকে অনেকক্ষণ বেরিয়েছি। মাকে বলে এসেছি তাড়াতাড়ি ফিরবো। এখন যাই।'

BANGLAPDF.NET

'তুমি আমার বাড়িতে আর আসবে না কেন?'

'সে কথাও আজ বলবো না। যদি আমার বাড়িতে আসেন—আজ হঠাৎ এত প্রশ্ন করছেন কেন?'

'না, আর প্রশ্ন করবো না। তুমি যাও।'

মাধবী গিয়ে গাড়িতে উঠলো। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার বুক থেকে পাষাণভার নেমে গেছে। এ—কথা তো অবধারিত যে মাধবীর সঙ্গে আবার আমার দেখা হবেই। হবেই, কেন না আমি মন থেকে তাই—ই চেয়েছি। দেখা হলে মাধবীকে আর কোন প্রশ্ন করবো না, কোনো কথা জানাবোনা।

মাধবী আমাকে যে—দিন বলেছে, আমাকে অবনীভূষণের মত দেখতে সেদিন থেকেই আমি বদলাতে শুরু করেছি। আমি অন্য রকম হয়ে যাচ্ছি–সত্যি সত্যি অবনীভূষণের মতন কি না তা অবশ্য জানিনা। তাকে তো আমি চিনিই না। কিন্তু একথাও ঠিক, আমি এখন শেখরও ঠিক নই। কে তবে আমি!

ফিরে এসে চট্‌পট স্নান সেরে, আমার সবচেয়ে শৌখিন পোশাক পরে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালুম। মাধুবী এতক্ষণ বাড়ি পৌঁছে গেছে। স্নান সেরে মাধবীও কি আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে? অবনীভূষণ কি বেঁচে আছে? যদি বেঁচে থাকে, তবে ও কি এখন মাধবীদের বাড়িতে? ছোক্‌রা কি রকম, খুব চালিয়াৎ কিনা কে জানে। ব্যাকব্রাশ–করা চুল, পরিচ্ছন্ন চেহারার অবনীভূষণ মাধবীদের বাড়ির দোতলার ব্যালকনিতে বসে ইয়ার্কি দিচ্ছে—এই ছবিটা মনে এলো। কি ধরনের রসিকতা ও করে ঠিক ভেবে পেলাম না। আকাশ থেকে এক ঝলক আলাদা রোদ মাধবীর জন্য এসে ওর পায়ে লুটোচ্ছে। মাধবীর পায়ে হরিণের চামড়ার চটি। অবনীভূষণ নিশ্চিত সিল্কের পাঞ্জাবী ও পায়জামা পরে আছে। মুখে সিগারেট না পাইপ—এমনও হতে পারে, অবনীভূষণ সত্যিই বেঁচে নেই। ও বেঁচে আছে না মরে গেছে, কিছুতে বুঝতে পারিনা। যদি বেঁচে থাকে তবে, 'আপনাকে অবনীভূষণের মতো দেখতে,' একথা বলেই মাধবী চুপ করে যায় কেন? আমার কাছে সম্পূর্ণ অজানা একটি লোকের নাম বলে তার পরিচয় না বলার কি কারণ থাকতে পারে—দুঃখের স্মৃতি ছাড়া। যদি বেঁচে থাকে, তবে সে কোথায়? একদিন মাধবীর গা শুঁকে দেখতে হবে—ওর গায়ে অবনভূষণের গন্ধ আছে কিনা। না না, বেঁচে থাক্‌, তুমি বেঁচে থাকো অবনীভূষণ, আমি চাই তুমি বেঁচে থাকো, জীবিত লোককে পরাজিত করা সোজা। যদি মরে গিয়ে থাকে—তবে মাধবীর বুক থেকে ওর দাগ কোনোদিন উঠবে না।

সারা শরীর আবার ব্যথা—ব্যথা করছে। সারাদিন ঘর থেকে আর বেরোলুম না। বিকেলেও তিনজন বন্ধু এলো, প্রত্যেকের নিজস্ব ধরনের অনেক কথা বলে গেল। যাবার সময় আমাকে ডেকে নিয়ে গেল না। বাড়িতে একা পড়ে রইলুম। নিজে থেকে কোথায় যেতেও ইচ্ছে হলো না। ক্রমশঃ একা হয়ে যাচ্ছি। ভালোই, যত আমি একা হবো–তত আমি মাধবীর কাছাকাছি যাবো। অনেক হল্লোড় করেছি, এখন স্নেহছায়া চাই। ইচ্ছে করে মাধবীর চোখের সামনে পা ছড়িয়ে বসে থাকি। মাধবীর দৃষ্টি ঝর্ণার জলের মতো। মনে পড়ে অনেকদিন আগে সাঁওতাল পরগনায় একটা ছোট্ট ঝিরঝিরে জর্ণার সামনে অনেকক্ষণ একা বসেছিলাম। বসেছিলাম রাখাল বালকের মতো। হাতে বাঁশি ছিল না, পরনে কর্ডের প্যান্ড ও মুখে চুরুট ছিল, তবু রাখাল বালকের মতো, এ কথায় কোনো ভুল নেই। প্রায় তিনঘন্টা বসে ছিলাম, চুপ করে, নিজের সঙ্গেও কথা বলিনি, এক লাইন গান গাইনি। আমার স্মরণকালে সেই একমাত্র চুপ করে বসে থাকা। মাধবীর সামনে ঐ রকম চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে হয়। চুপ করে বসে থাকলে, একদিন না একদিন আমাকে ঠিক আমারই মতন দেখাবে।

BANGLADARPAN